রাশা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

রাশা সারা শরীর পানিতে ডুবিয়ে কচুরিপানার মাঝে তার মাথাটা একটুখানি বের করে শুয়েছিল, মতি আর জিতুর গলার স্বর শুনে সে সোজা হয়ে বসল। গলার স্বরটা যখন আরো একটু স্পষ্ট হলো তখন সে পানি থেকে বের হয়ে এলো, তার সমস্ত শরীরে কাদা, পানিতে ডুবে থেকে তার চোখ লাল, মুখ রক্তশূন্য। মতি আর জিতু রাশাকে ডাকতে ডাকতে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ করে রাশাকে দেখতে পায়, তখন তারা চিৎকার করে নদীর তীরে নেমে এসে তাকে জাপটে ধরে ফেলল! মতি রাশাকে শক্ত করে ধরে বলল, 'রাশা আপু! রাশা আপু তুমি বেঁচে আছ? তুমি বেঁচে আছ রাশা আপু?"

উৎসর্গ

নাইরাহ্ অনোরা সাইফ
তুমি কি জানো তুমি কত
আনন্দ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ?

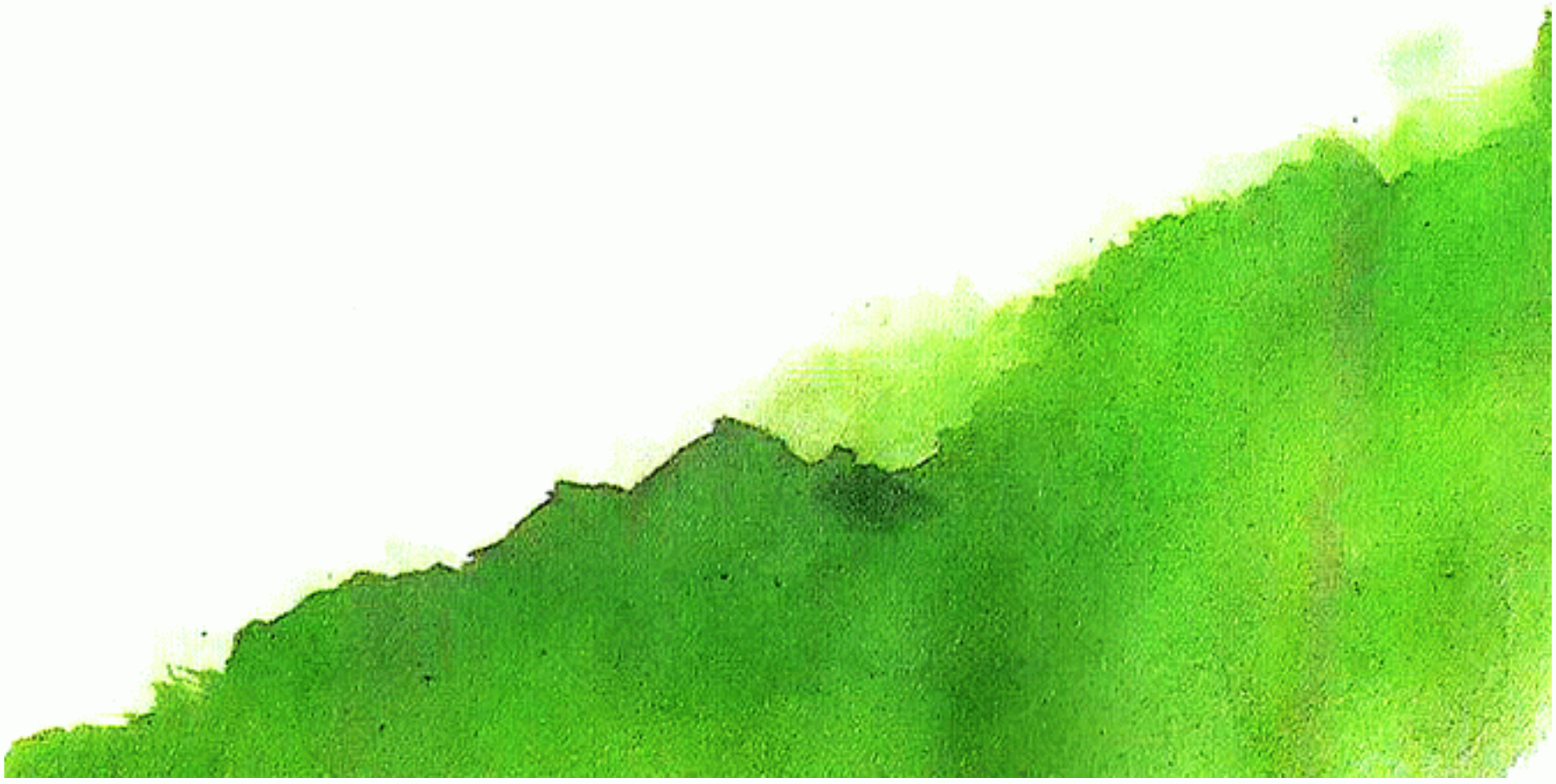

আব্বু-আম্মু যখন অন্যরকম

রাইসার বয়স যখন দশ তখন তার ক্লাসের একটা ফাজিল ছেলে তাকে নিয়ে একটা কবিতা বানিয়েছিল। কবিতাটা শুরু হয়েছিল এভাবে :

রাইসা
মাছের কাঁটা খায় বাইছা বাইছা।

এটা মোটেও কোনো ভালো কবিতা হয়নি, ক্লাসের কোনো ছেলেমেয়ে এই ফাজিল কবি কিংবা তার কবিতাকে কোনোই পাত্তা দেয়নি– কিন্তু রাইসা কেঁদেকেটে একাকার করল। বাসায় এসে ঘোষণা করল সে তার নামটাই বদলে ফেলবে। রাইসার আম্মু চোখ কপালে তুলে বললেন, "নাম বদলে ফেলবি মানে? নাম কি টেবিল ক্লথ, নাকি বিছানার চাদর যে পছন্দ না হলেই পাল্টে ফেলবি?"

রাইসা তার আম্মুর সাথে তর্ক করল না, খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করল তার নূতন নামটি কী হতে পারে। আনুস্কা নামটা তার খুব পছন্দ কিন্তু রাইসা থেকে হঠাৎ করে এক লাফে আনুস্কা করে ফেলা যাবে না, তাই সে রাইসার কাছাকাছি একটা নাম বেছে নিল। রাইসার 'ই' ফেলে দিয়ে প্রথমে সে তার নামটাকে বানাল রাসা কিন্তু উচ্চারণ করল রাশা। প্রথমে সবাই ভেবে নিল এটা একধরনের ঠাট্টা কিন্তু রাইসা হাল ছেড়ে দিল না। একদিন নয় দুইদিন নয়, তিন বছর পর তার বয়স যখন তেরো তখন সত্যি সত্যি তার নাম হয়ে গেল রাশা। একসময় যে তার নাম ছিল রাইসা সেটা সবাই প্রায় ভুলেই গেল।

দশ বছরের রাইসা যখন তেরো বছরের রাশাতে পাল্টে গেল সে তখন আবিষ্কার করেছে নামের সাথে সাথে তার চারপাশের পৃথিবীটাও কেমন যেন পাল্টে গেছে। যখন তার বয়স ছিল দশ বছর তখন তার ধারণা ছিল তার আব্বু-আম্মুর মতো ভালো মানুষ বুঝি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তেরো বছর বয়সে রাশা আবিষ্কার করল তার ধারণাটা পুরোপুরি ভুল-তার আব্বু-আম্মু মোটেও ভালো মানুষ নন, তাদের নানা রকম সমস্যা। তার আব্বু বদমেজাজী আর স্বার্থপর ধরনের মানুষ। নিজের ভালো ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। শুধু তাই না দরকার না থাকলেও অবলীলায় মিথ্যে কথা বলে ফেলেন। রাশা আস্তে আস্তে আবিষ্কার করল তার আম্মুর মনটা খুব ছোট, কেমন যেন হিংসুক ধরনের মহিলা। অল্পতেই বেশ রেগে উঠে বাসায় যে কাজের মেয়েটা আছে তাকে মারধর শুরু করেন। সেটা দেখে রাশা লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে যেত। দেখতে দেখতে অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকল, খুব ধীরে ধীরে তার আব্বু-আম্মু খুবই খারাপভাবে ঝগড়া করতে শুরু করলেন। প্রথম প্রথম রাশা থেকে লুকিয়ে একটু গলা নামিয়ে ঝগড়া করতেন, আস্তে আস্তে তাদের লজ্জা ভেঙে গেল, তখন গলা উঁচিয়ে হাত-পা ছুড়ে রাশার সামনেই ঝগড়া করতে শুরু করলেন। কী খারাপ তাদের ঝগড়া কার ভঙ্গি, কী জঘন্য তাদের ভাষা, রাশার একেবারে মরে যেতে ইচ্ছে করত।

তারপর একদিন তার আব্বু-আম্মুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, রাশা আগেই টের পেয়েছিল এরকম একটা জিনিষ ঘটেবে, তাই দুঃখে তার বুকটা ভেঙে গেল সত্যি কিন্তু সে মোটেও অবাক হলো না। সে ভাবল তার আব্বু একন অন্য জায়গায় চলে যাবেন, ঝগড়াকাটি করার জন্যে কোনো মানুষ নেই তাই বাসায় তখন একটু শান্তি ফিরে আসবে। আব্বু নুতন একটা বাসা ভাড়া করে চলে গেলেন, ঝগড়াঝাটি কমে এলো কিন্তু বাসায় মোটেও শান্তি ফিরে এলো না। আম্মু একটা ব্যাংকে চাকরি করেন, যতক্ষণ অফিসে থাকেন ততক্ষণ ভালো, বাসায় ফিরে এসেই আব্বুকে গালাগাল করতে শুরু করেন, যখন রাত হয়ে আসে তখন ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদতে থাকেন। রাশা কী করবে বুঝতে পারে না; এক-দুইবার আম্মুকে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু তার ফল হলো একেবারে উল্টো, আম্মু রাশাকেই দোষী ধরে মুখ খারাপ করে তাকেই গালাগাল দিতে লাগলেন।

তার আব্বু আম্মু খুবই খারাপভাবে
ঝগড়া করতে শুরু করলেন।

এই ভাবে এক বছর কেটে গেল, রাশার বয়স হলো চৌদ্দ। কিন্তু তার মনে হতো তার বয়স বুঝি হয়েছে চল্লিশ। এই এক বছরে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তার আব্বু কোথা থেকে একজন মাঝবয়সী মহিলাকে খুঁজে বের করে বিয়ে করে কানাডা চলে গেলেন। রাশা ভাবল আব্বু যেহেতু দেশ ছেড়েই চলে গেছেন এখন আম্মু হয়তো একটু শান্ত হয়ে অন্য কিছুতে মন দেবেন।

কিন্তু সেটা মোটেও ঘটল না, আম্মু কেমন যেন আরো খেপে উঠলেন, তার কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগল পুরো দোষটাই বুঝি রাশার। একদিন রাশা স্কুল থেকে এসেছে, বাসায় এসে দেখে আম্মু বসার ঘরে গুম হয়ে বসে আছেন। রাশা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আম্মু?"

আম্মু তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, রাশা আবার জিজ্ঞেস করল, "আম্মু, কী হয়েছে?"

এবারে আম্মু রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন, হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে বললেন, "সব দায়-দায়িত্ব আমার? তোর বাপের কোনো দায়-দায়িত্ব নাই?"

রাশা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কিসের দায়-দায়িত্ব?"

আম্মু মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "কিসের আবার? তোর দায়-দায়িত্ব।"

রাশার বুকটা কেন যেন ছাঁৎ করে উঠে, সে শুকনো মুখে বলল, "আমার দায়-দায়িত্ব?"

"হ্যাঁ। তুই কি আমার একার মেয়ে– নাকি তোর বাপেরও একটু দায়িত্ব আছে? আমার ওপর তোর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সে একটা ঘাগী বুড়িকে বিয়ে করে কানাডা ভেগে গেল?"

রাশার কেমন যেন ভয় ভয় লাগতে থাকে। কেন যেন তার মনে হতে থাকে তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে– আম্মু কিছুই বলেননি, কিন্তু রাশা পরিষ্কার বুঝতে পারল আম্মু কী বলতে চাইছেন। তার আব্বু একজনকে বিয়ে করে নূতন করে ঘর-সংসার শুরু করেছেন। তার আম্মু রাশার জন্যে সেটা করতে পারছেন না।

যতই দিন যেতে থাকে রাশার সন্দেহটা ততই পাকা হতে থাকে। আম্মু অফিসে যাবার সময় একটু বেশি সাজগোজ করে যেতে লাগলেন, অফিস থেকে ফিরে আসতে লাগলেন একটু দেরি করে। প্রায়সময়েই রাশাকে খাবার টেবিলে বসে একা একা একটা গল্পের বই পড়ে খেতে হয়। সে পড়াশোনায় ভালো ছিল কিন্তু এখন পড়াশোনায় মন দিতে পারে না। তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হচ্ছে গণিত, সেই গণিতের একটা পরীক্ষায় সোজা সোজা দুইটা অঙ্ক ভুল করে ফেলল। ক্লাশে খাতা দেবার সময় তাদের গণিতের জাহানারা ম্যাডাম বললেন, "রাশা, ক্লাসের শেষে তুমি আমার সাথে দেখা করবে।"

রাশা ক্লাসের শেষে ম্যাডামের সাথে দেখা করতে গেল, সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাডাম বললেন, "রাশা, তোমার কী হয়েছে?"

রাশা বলল, "কিছু হয় নাই ম্যাডাম।"

"নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি লক্ষ করছি তোমার লেখাপড়ায় মন নাই। তুমি গণিতে এত ভালো ছিলে আর পরীক্ষায় সোজা সোজা দুইটা অঙ্ক ভুল করলে?"

রাশা কথা বলল না। ম্যাডাম বললেন, "শুধু গণিতে না, বাংলা পরীক্ষাতেও নাকি খারাপ করেছ। ক্লাসে কথাবার্তা বলো না, চুপ করে বসে থাকো। কী হয়েছে?"

রাশা এবারেও কথা বলল না, শুধু তার চোখে পানি চলে এলো। পানিটা লুকানোর জন্যে সে মাথা আরো নিচু করল। ম্যাডাম তখন নরম গলায় বললেন, "রাশা, আমি জানি তোমার আব্বু-আম্মুর মাঝে ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমি জানি তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়ের বাবা-মায়ের যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তখন তোমরা সেটা মেনে নিতে পারো না। ক্রাইসিস তৈরি হয়– পুরো ফ্যামিলির ওপর খুব চাপ সৃষ্টি করে। তোমারও নিশ্চয়ই করেছে। তোমার এই চাপ সহ্য করা শিখতে হবে। আজকাল এটা খুবই কমন ব্যাপার। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে সিক্সটি পার্সেন্ট ডিভোর্স, আমাদের দেশে স্ট্যাটিস্টিক্স নাই, নিলে দেখবে অনেক– হয়তো ফরটি বা ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি। কাজেই তোমাকে ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে।"

রাশা এবারে কথা বলল, "ম্যাডাম আমি সেটা মেনে নিয়েছিলাম।"

"তাহলে?"

"অন্য কিছু হচ্ছে ম্যাডাম।"

জাহানারা ম্যাডাম এবারে একটু শঙ্কিত গলায় বললেন, "অন্য কী হচ্ছে?"

রাশা বলবে কিনা বুঝতে পারছিল না, অনেক দিন সে কারো সাথে মন খুলে কিছু বলতে পারে না, আজকে তার ম্যাডামের নরম গলায় কথা শুনে সে একটু ভেঙে পড়ল। কোনোমতে চোখের পানি আটকিয়ে বলল, "ম্যাডাম, আমার আম্মু আমাকে আর সহ্য করতে পারছে না।"

ম্যাডাম চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী বলছ! তোমার আম্মু তোমাকে আর সহ্য করতে পারছেন না! তোমাকে সহ্য করতে পারবেন না কেন? তুমি কী করেছ?"

"আম্মুর মনে হয় কাউকে পছন্দ হয়েছে। মনে হয় আবার বিয়ে করতে চান।"

এবারে কথা বলার আগে ম্যাডাম খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "দেখো রাশা, এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তোমার মায়ের এত কম বয়স, বাকি জীবনটা কি একা একা থাকবেন? কাজেই তোমার এটাও মেনে নিতে হবে। আসলে দেখবে ব্যাপারটা তোমার জন্যে ভালোই হবে। তুমি তোমার বাবার জায়গায় একজনকে পাবে, বাবা-মা মেয়ে সবাই মিলে পুরো একটা পরিবার হবে– অনেক মজা হবে তখন।"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "না ম্যাডাম। আমি সেটা বলছি না।"

"তুমি কী বলছ?"

"আমার জন্যে আম্মু বিয়ে করতে পারছে না। আমি হচ্ছি ঝামেলা। আমাকে আম্মু কেমন করে সরিয়ে দিতে পারে সেটা চিন্তা করছে।"

জাহানারা ম্যাডাম থতমত খেয়ে গেলেন, একটু ইতস্তত করে বললেন, "ছিঃ ছিঃ রাশা, এটা তুমি কী বলছ! একজন মা কখনো তার বাচ্চাকে সরিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারে না।"

রাশা কোনো কথা বলল না, শুধু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

ম্যাডাম বললেন, "পৃথিবীটা টিকে আছে মায়েদের জন্যে। একটা মা তার বাচ্চাদের কখনো ছেড়ে যায় না। বুঝেছ?"

রাশা এবারেও কোনো কথা বলল না। ম্যাডাম বললেন, "আমারও দুইটা বাচ্চা আছে– আমিও একজন মা। আমি জানি।"

রাশা কোনো উত্তর দিল না। ম্যাডাম বললেন, "তুমি এসব নিয়ে চিন্তা করো না। দেখবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার নূতন করে একটা ফ্যামিলি হবে– কমপ্লিট ফ্যামিলি। বুঝেছ?"

রাশা মাথা নেড়ে জানাল যে সে বুঝেছে। যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন জাহানারা ম্যাডাম ডেকে বললেন, "শোনো রাশা। তোমার যখন কিছু দরকার হয়, কোনো কিছু নিয়ে কথা বলতে হয় তখনই তুমি আমার কাছে চলে আসবে। ঠিক আছে?"

রাশা আবার মাথা নাড়ল।

যদিও জাহানারা ম্যাডাম রাশাকে বলেছিলেন যে একজন মা কখনোই তার বাচ্চাকে ফেলে দিয়ে চলে যায় না, কিন্তু দেখা গেল রাশার সন্দেহটাই ঠিক। একদিন রাত্রিবেলা রাশা যখন তার কম্পিউটারে কাজ করছে, তখন আম্মু এসে বললেন, "রাশা, কী করছিস মা?"

আজকাল আম্মু কখনোই এই সুরে নরম গলায় কথা বলেন না, তাই রাশা ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও বাইরে সেটা বুঝতে দিল না। বলল, "ইন্টারনেটে একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করছিলাম। নেটটা এত স্লো–"

"কয়দিন থেকেই ভাবছি তোর সাথে একটা জিনিস নিয়ে কথা বলি–"

রাশার বুকটা ছাৎ করে উঠল, সে অনেক কষ্ট করে মুখটা শান্ত রেখে বলল, "বলো আম্মু।"

আম্মু বললেন, "তুই তো এখন আর ছোট মেয়ে না। তুই তো বড় হয়েছিস। ঠিক কিনা?"

রাশা কী বলবে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল। আম্মু বললেন, "তোর বাপ যে আমার ওপর তোর পুরো দায়িত্ব দিয়ে চলে গেল, সেটা ঠিক হয়েছে?"

রাশা দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করল যে কাজটা ঠিক হয়নি। আম্মু মুখটা কঠিন করে বললেন, "আমি তো অনেক দিন তোর দায়িত্ব নেবার চেষ্টা করলাম, এখন তোর বাপ কিছুদিন তোর দায়িত্ব নিক।"

রাশা শুকনো মুখে তার আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আম্মু রাশার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে নেল পালিশ দিয়ে রং করা নিজের হাতের নখগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "তুই তোর বাপরে ফোন করবি। ফোন করে বলবি তোকে যেন নিয়ে যায়।"

রাশা কী বলবে বুঝতে পারল না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "আব্বু আমাকে নিয়ে যাবে?"

আম্মু কঠিন গলায় বললেন, "কেন নিবে না? তুই কি আমার একার বাচ্চা?"

রাশা ঢোঁক গিলে বলল, "যদি নিতে না চায়?"

আম্মুর চোখগুলো ছোট হয়ে গেল, সেই ভাবে রাশার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "যদি নিতে না চায় তাহলে তার অন্যব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

"অ-অন্য ব্যবস্থা? অন্য কী ব্যবস্থা?"

আম্মু হিংস্র গলায় বললেন, "আমি সেটা জানি না। তোর বাপকে বলিস বের করতে সে কী ব্যবস্থা নিতে চায়।"

আম্মু আরও কিছুক্ষণ বসে থাকলেন, বিড়বিড় করে আরো নানা রকম কথা বললেন, রাশা কিছু শুনতে পেল কিছু শুনতে পেল না। তার মনে হতে লাগল, চারপাশের সবকিছু যেন ভেঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল, ঘরের সব বাতি নিভে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল, সে বুঝি বিশাল একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর আকাশ কালো করে ঝড় উঠেছে, হু হু করে বাতাস বইছে, আর কালো মেঘ এসে চারদিক ঢেকে ফেলছে।

রাশা সারারাত ঘুমাতে পারল না, বিছানায় ছটফট ছটফট করে কাটিয়ে দিল।

দুইদিন পর আবার রাত্রিবেলা আম্মু হাজির হলেন। হাতে একটা টেলিফোন। টেলিফোনটা রাশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নে টেলিফোন কর।"

কাকে টেলিফোন করার কথা বলছেন সেটা বুঝতে রাশার একটুও দেরি হলো না। তবু সে জিজ্ঞেস করল, "কাকে?"

"তোর বাপকে।"

"আব্বুকে? এখন?"

"হ্যাঁ।"

রাশা কেমন যেন অসহায় বোধ করে। সে দুর্বল গলায় বলে, "আম্মু, প্লিজ আম্মু–"

"ঘ্যান ঘ্যান করবি না। টেলিফোন করো।"

"করে কী বলব?"

আম্মু মুখ শক্ত করে বললেন, "বলবি আমাকে নিয়ে যাও। না হলে আমার একটা ব্যবস্থা করো।"

"আম্মু–" রাশা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "তুমি তো জানো আম্মু–"

"আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানতেও চাই না।" আম্মু টেলিফোনটা রাশার মুখের কাছে ধরলেন। বললেন, "টেলিফোন করো।"

রাশা কিছুক্ষণ আম্মুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি সত্যিই আমাকে বিদায় করে দিতে চাও আম্মু?"

আম্মু হঠাৎ কেমন যেন খেপে উঠলেন, বললেন, "ঢং করবি না। টেলিফোন করো।"

"টেলিফোন নাম্বার?"

আম্মু নিজেই ডায়াল করলেন তারপর কানে লাগিয়ে কিছু একটা শুনলেন তারপর টেলিফোনটা রাশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "রিং হচ্ছে।"

রাশা টেলিফোনটা হাতে নিল। কানে লাগিয়ে শুনল একটু পরপর রিং হচ্ছে। বেশ কয়েকটা রিং হবার পর খুট করে একটা শব্দ হলো তারপর একটা ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল, "হ্যালো।"

অনেক দিন পর শুনছে তারপরেও রাশা তার আব্বুর গলার স্বরটা চিনতে পারল। রাশা বলল, "আব্বু আমি রাশা।"

ও পাশ থেকে আব্বু বললেন, "এক্সকিউজ-মি?"

রাশা আবার বলল, "আব্বু, আমি রাশা। বাংলাদেশ থেকে।"

আব্বু এবারে চিনতে পারলেন এবং মনে হলো একটু থিতিয়ে গেলেন, আমতা আমতা করে বললেন, "রাশা, কী খবর?"

"আম্মু বলেছেন তোমাকে ফোন করতে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

রাশা ঠিক কিভাবে বলবে বুঝতে পারছিল না। একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত এক নিশ্বাসে বলেই ফেলল, "আম্মু বলেছেন আমাকে নিয়ে যেতে।"

"নিয়ে যেতে?" আব্বু শব্দ করে একটু হাসলেন, তারপর বললেন, "নিয়ে যাওয়া এতো সোজা নাকি? ইমিগ্রেশান লাগে, ভিসা লাগে, প্লেনের টিকিট লাগে! এগুলো কি গাছে ধরে নাকি?"

অপমানে রাশার কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে গেল, তারপরেও দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আম্মু বলেছেন যে, আমার দায়িত্ব আম্মু আর নিতে পারবেন না। এখন তোমাকে নিতে হবে।"

"আমাকে?" আব্বু আবার শব্দ করে হাসলেন, যেন খুব মজার কথা বলেছে। "আমি কেমন করে তোর দায়িত্ব নিব? আমার নিজেরই ঠিক নাই। ইমিগ্রেশন হয়েছে তাই কোনোভাবে ওয়েলফেয়ারে আছি। ভদ্রলোকের দেশ তাই রক্ষা।" তা না হলে তো না খেয়ে থাকতে হতো।"

আম্মু শীতল চোখে তাকিয়ে ছিলেন, রাশা আম্মুর দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আব্বু তোমার কিছু একটা করতে হবে। প্লিজ।"

"আমি কী করব? দুনিয়ার আরেক মাথা থেকে আমার কিছু করার আছে নাকি? বললেই হবে দায়িত্ব নিতে পারবে না? তোর আম্মুকে বল পাগলামি না করতে।"

রাশা কিছু বলল না। আব্বু বললেন, "তোর আম্মু সবসময়ই এরকম। দায়িত্বজ্ঞান বলে কিছু নাই। যত্তোসব।"

রাশা এবারেও কিছু বলল না। আব্বু হঠাৎ সুর পাল্টে বললেন, "কয়দিন আগে তোকে একটা ভিউকার্ড পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছিস? নায়েগ্রা ফলসের ভিউকার্ড। নায়েগ্রা ফলসটা খুবই ইন্টারেস্টিং– অর্ধেকটা আমেরিকাতে অন্য অর্ধেক কানাডাতে। আমরা কানাডার সাইডে গিয়েছিলাম। না দেখলে বিশ্বাস করবি না–"

আব্বু কথা বলে যেতে থাকলেন, কানাডা যে কত ভালো একটা দেশ আর বাংলাদেশ যে কত খারাপ একটা দেশ আব্বু সেটা ঘুরে-ফিরে অনেকবার বললেন। রাশা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, একসময় লক্ষ করল অন্য পাশে আব্বু টেলিফোন রেখে দিয়েছেন।

রাশা কান থেকে টেলিফোনটা সরিয়ে আম্মুর দিকে তাকাল। আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলেছে?" রাশা মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "বলেছেন পারবেন না।"

"পারবে না? বদমাইশটা পারবে না? বাচ্চা জন্ম দেবার সময় মনে ছিল না?"

রাশা কোনো কথা বলল না। আম্মু হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মতো চিৎকার করে উঠলেন, "শুধু তোর বদমাইশ বাপ ফূর্তি করবে? কানাডা ইউরোপ আমেরিকা করবে? আর আমি বাংলাদেশের চিপা গলিতে বসে বসে আঙুল চুষব? আমার মেয়েকে পালব? আমার জীবনে কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকবে না?"

রাশা কী বলবে বুঝতে পারল না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি কী চাও আম্মু? কী করতে চাও?"

"আমি নূতন করে লাইফ শুরু করতে চাই।"

"করো আম্মু। তুমি করো।"

"করব?" আম্মু চিৎকার করে বললেন, "কিভাবে করব? তুই আমার গলার মাঝে ঝুলে থাকলে কিভাবে শুরু করব? এই রকম ধাড়ি একটা মেয়ে নিয়ে লাইফ শুরু করা যায়? যায় শুরু করা?"

রাশা আস্তে আস্তে প্রায় শোনা যায় না এভাবে বলল, "যাবে আম্মু। শুরু করা যাবে। আমি বলছি শুরু করা যাবে।"

সেদিন রাতে রাশা ঘুমাতে গেল অনেক দেরি করে। ঘুমানোর আগে পৃথিবীতে মানুষেরা কেমন করে আত্মহত্যা করে সেটা সে ইন্টারনেট থেকে খুঁজে বের করল। তারপর অনেক দিন পর সে শান্তিতে ঘুমাতে গেল।

পরের দুই সপ্তাহ আম্মু তাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু রাশা বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটছে। কী ঘটছে সে জানে না কিন্তু সেটাও অনুমান করতে পারে। দুই সপ্তাহ পর গভীর রাতে আম্মু তার ঘরে এলেন, তার বিছানায় বসে নরম গলায় বললেন, "রাশা, মা। তোর সাথে একটু কথা আছে।"

আম্মুর গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যেটা শুনে রাশা হঠাৎ করে বুঝে গেল খুব বড় একটা কিছু ঘটে গেছে। সে কম্পিউটারের কি-বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে বলল, "বলো আম্মু।"

"আমি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছি।"

রাশা কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কোথায় চলে যাচ্ছ?"

"অস্ট্রেলিয়া।" আম্মু রাশার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি জানি তুই আমার ওপর নিশ্চয়ই খুব রাগ হবি, হওয়ারই কথা। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।"

রাশা আবার বিড়বিড় করে বলল, "অস্ট্রেলিয়া?"

"হ্যাঁ। বুঝতেই পারছিস, আমাকে অস্ট্রেলিয়া কে নিবে? সেই জন্যে আমার একজন অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনকে বিয়ে করতে হয়েছে। মানুষটা ভালো, কিন্তু–"

রাশা আবার বিড়বিড় করে কী বলছে না বুঝেই বলল, "অস্ট্রেলিয়া!"

"মানুষটা ভালো। আমাকে খুব লাইক করে কিন্তু কোনো বাড়তি ঝামেলা চায় না। আগের পক্ষের বাচ্চা নিতে রাজি না।"

রাশা অবাক হয়ে তার আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আম্মু অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমার বয়স হয়েছে। আমাকে কে বিয়ে করবে বল? এই মানুষটা রাজি হয়েছে, কিন্তু শর্ত একটা। তোকে রেখে যেতে হবে।"

রাশার পৃথিবীটা চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে গেল। তার খুব ইচ্ছে হলো বলে, "প্লিজ আম্মু তুমি আমাকে রেখে চলে যেয়ো না।" কিন্তু সে বলল না। জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কোথায় রেখে যাবে?"

"তোর বড় খালাকে বলেছিলাম, রাজি হলো না। এখন টেলিফোন করলে লাইন কেটে দেয়।"

রাশা তার আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আম্মু বিড়বিড় করে বললেন, "মেয়েদের হোস্টেল আছে শুনেছিলাম। এত এক্সপেনসিভ যে আমার পক্ষে কুলানো সম্ভব না। তোর বাপ সাহায্য করলে একটা কথা ছিল। সে তো কিছু করবে না।"

রাশা নিজের ভেতরে কেমন যেন আতঙ্ক অনুভব করে। আম্মু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "অনেক চিন্তা করে দেখলাম তোকে তোর নানির কাছে রেখে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। নানি দেখে শুনে রাখবে। আদর-যত্ন করবে।"

রাশা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, মুখ হাঁ করে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। আম্মু বললেন, "তোর নানি ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না।"

রাশা খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু আম্মু, নানি তো পাগল।"

আম্মু জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "একটু মাথার দোষ আছে, সেটা কার নাই? এত কম বয়সে এত বড় ধাক্কা খেলে সবারই মাথা খারাপ হয়ে যেত।"

"তুমি কোনোদিন নানি বাড়ি যাও নাই। কোনোদিন আমাকে যেতে দাও নাই। তুমি বলেছ নানি বদ্ধ উন্মাদ, বেঁধে রাখা দরকার। তুমি বলেছ–"

আম্মু বললেন, "কিন্তু আর কোথায় রেখে যাব? শুনেছি তোর নানি এখন অনেক ভালো। সম্পত্তি দেখেশুনে রাখছে না? পাগল হলে কি পারত?"

"আমার স্কুল?"

আম্মুকে দেখে মনে হলো, কথাটা শুনে যেন খুব অবাক হয়ে গেছেন। খানিকক্ষণ আমতা আমতা করে বললেন, "ওখানে নিশ্চয়ই স্কুল আছে। সেই স্কুলে পড়বি। লেখাপড়া কি আর স্কুল দিয়ে হয়? লেখাপড়া তো নিজের কাছে!"

রাশা দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। আম্মু ফিসফিস করে বললেন, "আমাকে একটু সময় দে মা। আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়ে গুছিয়ে নিই, তারপর তোকে নিয়ে যাব। আই প্রমিজ।"

রাশা কোনো কথা বলল না। আম্মু বললেন, "তুই আমার ওপর রাগ করে থাকিস না মা। আমার কোনো উপায় ছিল না। বিশ্বাস করো, আমার কোনো উপায় ছিল না। একটা মা কি কখনো তার বাচ্চাকে ফেলে রেখে যেতে পারে? পারে না?"

তারপর আম্মু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাশা তার আম্মুর দিকে তাকিয়ে থাকলেও তাকে দেখছিল না। সে ইন্টারনেটে দেখা আত্মহত্যার উপায়গুলোর কথা ভাবছিল। অনেকগুলো উপায়ের কথা সেখানে লেখা ছিল কিন্তু সে একটাও মনে করতে পারছিল না।

একটাও না। তাতে অবশ্যি কিছু আসে যায় না, যখন সময় হবে তখন মনে করতে পারলেই হবে। তখন নিশ্চয়ই মনে হয়ে যাবে।

একটি গহীন গ্রাম

রাস্তার পাশে রিকশা-ভ্যানটা থামিয়ে রিকশাওয়ালা নেমে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বলল, "আর সামনে যাবে না। বাকিটা হেঁটে যেতে হবে।"

আম্মু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "হেঁটে যেতে হবে?"

"জে।" মাঝবয়সী রিকশাওয়ালা সামনের কাঁচা রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, "বর্ষার সময় সব পানিতে ডুবে যায় তখন নৌকা করে যাওয়া যায়।"

আম্মু বললেন, "ও।" বহুদিন পর আম্মু এখানে এসেছেন। আজকাল যেখানেই কিছুদিন পরে যান গিয়ে জায়গাটা চিনতে পারেন না। ফাঁকা একটা জায়গা বাড়িঘরে ঘিঞ্জি হয়ে যায়। এই এলাকাটার কোনো পরিবর্তন হয়নি, সেই ছোট থাকতে যে রকম দেখেছিলেন এখনো সে রকমই আছে।

রাশা রিকশা-ভ্যানে পা তুলে বসেছিল, এবারে নেমে পড়ে। গতরাতে তারা রওনা দিয়েছে, সারারাত ট্রেনে কেটেছে, সকালে নেমে বাস ধরেছে। বাসের পর স্কুটার তারপর রিকশা-ভ্যান। বাকিটা হেঁটে যেতে হবে। রাশা অন্যমনস্কভাবে চারপাশে তাকাল কিন্তু খুব ভালো করে কিছু দেখল বলে মনে হয় না। একটু আগে জলার ধারে একটা গাছের ওপর একটা মাছরাঙা পাখি বসেছিল, এত সুন্দর রঙিন পাখি সে জীবনে কখনোই দেখেনি, কিন্তু তারপরেও পাখিটা দেখে তার ভেতরে কোনো আনন্দ হলো না। আসলে তার ভেতরটা এখন মনে হয় মরে গেছে, আনন্দ বা দুঃখ কোনো অনুভূতিই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে চারপাশে যেটা ঘটছে তার পুরোটাই একটা দুঃস্বপ্ন।

মনে হচ্ছে এক্ষুণি তার ঘুম ভেঙে যাবে আর ঘুম থেকে উঠে দেখবে সে তার ঘরে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। রাশা জানে এটা দুঃস্বপ্ন নয় এটা সত্যি, তাই সম্পূর্ণ অপরিচিত একধরনের দুঃখ, হতাশা আর আতঙ্কে বুকের ভেতরটা অসাড় হয়ে আছে।

আম্মু রিকশা-ভ্যান থেকে নেমে রাশাকে বললেন, "নেমে আয় মা। হেঁটে যেতে হবে। পারবি না?"

রাশা কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে জানাল যে সে পারবে। রিকশাওয়ালা ভ্যান থেকে আম্মুর ছোট ব্যাগ আর রাশার বড় স্যুটকেসটা নামাল। এই স্যুটকেসের মাঝে তার বাকি জীবনটা কাটানোর জন্যে যা যা লাগবে সেটা আঁটানো হয়েছে। আম্মু বারবার বলেছেন, "যা যা লাগবে সব নিয়ে নে মা। আর তো নিতে পারবি না।" রাশা তখন খুব চিন্তা ভাবনা করেনি। অনেকটা অন্যমনস্কভাবে হাতের কাছে যা পেয়েছে স্যুটকেসে ভরেছে। সে তখনো বিশ্বাস করেনি যে সত্যি সত্যি এটা ঘটছে। স্যুটকেসের মাঝে তার কিছু জামা-কাপড় আছে, কিছু বই। তার কম্পিউটারটা আনতে পারলে হতো, কিন্তু আম্মু বলেছেন তারা যেখানে যাচ্ছে তার আশেপাশে কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই। তা ছাড়া এত বড় একটা কম্পিউটার, সেটা আনবে কেমন করে? এই স্যুটকেসটা আনতেই কত ঝামেলা হয়েছে।

রাশা রিকশা-ভ্যান থেকে টেনে স্যুটকেসটা নামাল। নিচে চাকা লাগানো আছে, রাস্তা ভালো হলে টেনে নেয়া যেত। কাদামাটির এই কাঁচা রাস্তায় কেমন করে নেবে সে জানে না।

আম্মু রিকশাওয়ালাকে বললেন, "আমি কিন্তু আজকেই ফিরে যাব। মনে আছে তো?"

মানুষটা মাথা নাড়ল, বলল, "জে মনে আছে।"

আম্মু রাশার স্যুটকেসটা দেখিয়ে বললেন, "এই স্যুটকেসটা পৌঁছে দিতে হবে। কাউকে পাওয়া যাবে?"

মানুষটা বলল, "আমি পৌঁছে দেব।"

"রিকশা-ভ্যান? কেউ নিয়ে যাবে না তো?

"এইখানে কারো বাড়িতে রেখে যাব। কেউ নিবে না। এই গাঁও-গেরামে সবাই সবাইরে চিনে।"

কিছুক্ষণের মাঝেই তিনজনের এই ছোট দলটা এগিয়ে যেতে থাকে, সামনে রাশার স্যুটকেস মাথায় রিকশাওয়ালা, তার পিছনে আম্মু সবার পিছনে রাশা। আম্মু মাঝে মাঝে থেমে রাশার সাথে একটা-দুইটা কথা বদলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু রাশা হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া আর কিছু বলেনি, তাই আলাপ বেশি দূর এগুতে পারেনি।

গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রাশা দুই পাশে তাকাচ্ছিল। যদি স্কুলের সব ছেলেমেয়েকে নিয়ে এখানে পিকনিক করতে আসত তাহলে এতক্ষণে চারপাশের ক্ষেত, মাঠ, খাল, গাছপালা, গরু, ছাগল, পাখি এসব দেখে সবাই উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠত। সবাই মিলে মাঠে দৌগাদৌড়ি করত, খালের পানিতে লাফঝাঁপ দিত, গরুর বাছুরকে ধরে ছবি তুলত। এখন সবকিছুকে মনে হচ্ছে পুরোপুরি অর্থহীন। মেঠোপথে মানুষজন খুব বেশি নেই, হঠাৎ হঠাৎ এক-দুইজনকে দেখা যায়। তারা তখন কৌতুহলী হয়ে তাদের দিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকায়। রাশাও একবার ঘুরে একটা মেয়ের দিকে তাকাল, আট-নয় বছরের শুকনো লিকলিকে একটা মেয়ে, কুচকুচে কালো গায়ের রং মাথায় লাল চুল রুক্ষ- বাতাসে উড়ছে, খালি গা, শুধু একটা বেঢড় প্যান্ট পরে আছে। হাতে একটা চিকন বাঁশেল কঞ্চি, সেটা হাতে নিয়ে উদাস মুখে সে একটা ক্রুদ্ধ চোখে দেখে রাশার ভয়ে বুক কেঁপে উঠে, কিন্তু এই লিকলিকে ছোট মেয়েটির বুকে কোনো ভয়ডর নেই, রাশা আবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা বড় বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আম্মু বললেন, ঐ যে তালগাছটা দেখছিস সেটা হচ্ছে তোর নানু বাড়ি। রাশা কোনো কথা বলল না। আম্মু বললেন, আগে দুইটা তাল গাছ ছিল, একটা বাজ পড়ে পুড়ে গেছে।

রাশা এবারেও কোনো কথা বলল না, তাকিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করল, দুটো তালগাছ হলে সেটা কেমন দেখাত। ধীরে ধীরে রাস্তাটা আরো সরু হয়ে গেলে, একেবারে শেষে একটা

বাঁশের সাঁকো পার হতে হলো। আম্মু তার স্যান্ডেল দুটো খুলে হাতে নিয়ে নিলেন, রাশা জুতো পরেই পার হয়ে গেল। কিছু ঝোপঝাড় পার হয়ে একটা বিবর্ণ টিনের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আম্মু বললেন, "এইটা তোর নানু বাড়ি।"

রাশা চোখ তুলে তাকাল। টেলিভিশনে মাঝে মাঝে যখন কোনো গ্রাম-গঞ্জের খবর দেখায় তখন সে খবরের মাঝে এরকম বাড়ির ছবি দেখেছে, এই প্রথমবার সত্যি সত্যি দেখল। বাইরের টিনের ঘরের পাশ দিয়ে আম্মু ভেতরে ঢুকলেন, মাঝখানে খালি একটা উঠান, তার দুই পাশে দুইটা ঘর। একটা ঘরের টিনের ছাদ অন্যটার খড়ের ছাউনি। মাঝখানের উঠানটুকু বড় আর তকতকে পরিষ্কার। কোথাও কোনো জনমানুষ নেই, শুধু একটা মুরগি তার ছানাদের নিয়ে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। তাদের দেখে মুরগিটা কঁক কঁক করে একটা সতর্ক শব্দ করল, অমনি সবগুলো ছানা ছুটে এসে মুরগির তলায় আশ্রয় নিল। তাদের দেখে যখন বুঝতে পারল কোনো বিপদ নেই তখন আবার সবগুলো আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেতে থাকে।

রিকশাওয়ালা মানুষটি তার মাথা থেকে স্যুটকেসটা উঠানে নামিয়ে রেখে গামছা দিয়ে তার মুখ-গলা মুছতে থাকে। আম্মু এদিক-সেদিক তাকিয়ে ডাকলেন, "মা।"

কেউ উত্তর দিল না। আম্মু তখন টিনের ঘরের সামনে গিয়ে দরজাটি ধাক্কা দিলেন, দরজাটি সাথে সাথে খুলে গেল। আম্মু ভেতরে ঢুকে একটু পরে বের হয়ে বললেন, "ভিতরে কেউ নাই।"

রাশা কোনো কথা বলল না। আম্মু বললেন, "আয় বাড়ির পিছনে যাই। বাড়ির পিছনে পুকুর ঘাটে আছে কিনা দেখি।"

আম্মু টিনের ঘরের পাশ দিয়ে বাড়ির পিছনের দিকে রওনা দিলেন। রাশা অপেক্ষা করবে নাকি পিছনে পিছনে যাবে ঠিক বুঝতে পারছিল না, শেষে আম্মুর পিছনে পিছনেই গেল। বাড়ির পিছনে অনেক গাছপালা, বড় বড় বাঁশঝাড়। তার নিচে শুকনো পাতা মাড়িয়ে রাশা আম্মুর পিছনে পিছনে যেতে থাকে। সামনে একটা বড় পুকুর, পুকুরের কালো পানি টলটল করছে। পুকুরের পাশে ছায়াঢাকা একটা পুকুর ঘাট। রাশা দেখল সেই

পুকুরঘাটে হেলান দিয়ে গুটিশুটি মেরে একজন মহিলা বসে আছেন, মহিলা পুকুরের পানির দিকে তাকিয়ে আছেন তাই তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না।

আম্মু ডাকলেন, "মা।"

মহিলাটি পিছনে ঘুরে না তাকিয়ে বললেন, "কে?"

"আমি মা। আমি নীলু।"

রাশার মায়ের নাম নীলু, বহুদিন তাকে এই নামে কেউ ডাকে না। পুকুর ঘাটে বসে থাকা মহিলাটা একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সাথে কে?"

"আমার মেয়ে। রাশা।"

কথা বলতে বলতে আম্মু তার মায়ের পাশে দাঁড়ালেন কিন্তু তার মা একবারও মাথা ঘুরিয়ে মেয়েকে দেখার চেষ্টা করলেন না। শীতল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পাগলি, মাথা খারাপ মায়ের কাছে কেন এসেছিস?"

আম্মু থতমত খেয়ে গেলেন, আমতা আমতা করে বললেন, "না, মানে ইয়ে আসলে–"

"এত বছর পার হয়ে গেল কখনো একবারও খবর নিলি না। এখন হঠাৎ করে একেবারে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিস। ব্যাপারটা কী?"

আম্মু ইতস্তত করে বললেন, "আমি আসলে একটু দেশের বাইরে যাব– অস্ট্রেলিয়াতে। রাশাকে– মানে আমার মেয়েকে কোথায় রেখে যাব ঠিক করতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম তোমার কাছে রেখে যাই।"

"কত দিনের জন্যে যাচ্ছিস?"

"মানে, আসলে বেশ কিছুদিন, মানে হয়েছে কী–"

"আরেকজনকে বিয়ে করেছিস?"

আম্মুর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল, মাথা নিচু করে বললেন, "হ্যাঁ।"

"জামাই তোর মেয়েকে নিবে না?"

আম্মু কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলেন।

"তাই মেয়েটাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছিস? এর চাইতে মেয়েটার গলাটা কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিলি না কেন? তোর মেয়ে এই গাঁও-গেরামে কিভাবে থাকবে?"

আম্মু বললেন, "আসলে মা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। আমার কোনো উপায় ছিল না–"

"আমার মাথাটা আউলাঝাউলা সেই কথা সত্যি। আমি পাগল মানুষ সেইটাও সত্যি কিন্তু আমি তো বেকুব না নীলু! তুই তোর মেয়ের এত বড় সর্বনাশ কেন করতে যাচ্ছিস?"

"আমি সর্বনাশ করতে যাচ্ছি না মা– আমি একটু গুছিয়ে নিয়ে–"

রাশা দেখল তার নানি হঠাৎ করে হাত তুলে তার আম্মুকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, "আমার নাতনি কই? আমি কপাল পোড়া মেয়েটাকে একবার দেখি।"

তার নানি তখন ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন, এই প্রথম রাশা তার মাথা খারাপ পাগলি নানিকে দেখতে পেল। তার নানি দেখতে কেমন হবেন সেটা সে গত কয়েক দিনে অনেকবার কল্পনা করেছে। সাদা শণের মতো রুক্ষ চুল, তোবড়ানো গাল, মুখে বয়সের বলিরেখা, কোটরাগত লাল ক্রুদ্ধ চোখ– কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল তার নানির চেহারায় বয়সের কোনো ছাপ নেই, দেখে মনে হয় তার মায়ের বড় বোন। চুলে অল্প একটু পাক ধরেছে, রোদে পোড়া চেহারা, তার মাঝে শুধু জ্বলজ্বলে তীব্র এক জোড়া চোখ। রাশার মনে হলো সেই চোখ দিয়ে তার নানি তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেললেন।

নানি কিছুক্ষণ রাশার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হাত নেড়ে ডাকলেন, বললেন, "আয়। কাছে আয়।"

রাশা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল, নানি হাত দিয়ে তাকে ধরলেন, তারপর কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আমি জানতাম তুই আসবি। তাই আমি সেজেগুজে তোর জন্যে অপেক্ষা করছি।"

রাশা অবাক হয়ে তার নানির দিকে তাকাল, বলল, "কী বললে?"

"বলেছি যে আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করছি। আমি জানতাম তুই আজকে আসবি।"

"কেমন করে জানতে?"

"আমি তো পাগল মানুষ, মাথার ঠিক নাই। উল্টাপাল্টা জিনিস মাথায় আসে। আজকে সকালবেলা মাথায় এসেছে তুই আসবি। সেই জন্যে ট্রাঙ্ক থেকে এই শাড়িটা বের করে পরেছি।"

রাশা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার এই মাথা খারাপ নানির দিকে তাকিয়ে রইল। নানি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না? ঠিক আছে তোর হাতটা খোল–"

রাশা তার হাতটা খুলল। নানি তার মুঠি খুলে কিছু একটা বের করে তার হাতে দিয়ে তার মুঠি বন্ধ করে বললেন, "এই যে– তোকে দেয়ার জন্যে এইটা আমি হাতে নিয়ে বসে আছি। এখন তোকে দিলাম।"

"এইটা কী?"

"আমার মা আমাকে দিয়েছিল। আমার মা পেয়েছিল তার মায়ের কাছে। তার মা পেয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে–"

রাশা আবার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এইটা কী?"

"একটা মাদুলি।"

"কী হয় এইটা দিয়ে?"

"কাছে আয় তোকে কানাকানি বলি।" রাশা তার মাথাটা এগিয়ে দেয়, তার নানি রাশার থুতনিটা ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "পাক সাফ পবিত্র হয়ে এই মাদুলিটা হাতে নিয়ে তুই যেটা চাইবি সেটাই পাবি।"

"সেটাই পাব?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সবকিছু চাইতে হয় না। যেটা পাওয়া যায় না সেটা চাইতে হয় না। সেইটা চাইলে মাদুলির গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আমার হাতে গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি চাইলে আর পাই না। তুই পাবি।"

"তুমি কিভাবে গুণ নষ্ট করেছ?"

"নীলুর বাপের জানটা ফেরত চেয়েছিলাম সেই জন্যে গুণ নষ্ট হয়েছে। মওত হয়ে গেলে জান ফেরত চাইতে হয় না–"

আম্মু বললেন, "মা, তুমি এখন এইসব কথা রাশাকে কেন বলছ?"

নানি বললেন, "ইচ্ছে হয়েছে বলেছি। তাতে তোর কী? তুই তোর

মেয়েকে আমার কাছে ফেলে যাচ্ছিস কেন? আমি কি বলেছিলাম তোকে ফেলে যেতে?"

"না, মানে, রাশা ছোট মানুষ, তোমার এইসব কথা যদি বিশ্বাস করে ফেলে--"

"বিশ্বাস করবে না কেন? আমি কি মিথ্যা কথা বলেছি?"

আম্মু চুপ করে গেলেন। নানি রাশার মাথাটা আবার নিজের কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে বললেন, "আমি এই মাদুলিটা তোর মাকে দিই নাই। তোর জন্য রেখেছি।"

"কেন?"

আম্মু যেন শুনতে না পান সেভাবে গলা নামিয়ে বললেন, "তোর আম্মু এইটার যোগ্য না। এটা রাখতে হলে যোগ্যতা থাকতে হয়।"

"আমার যোগ্যতা আছে?"

"আছে।"

রাশা তার নানির চোখের দিকে তাকাল তখন নানি একটু হাসলেন, তার কঠিন মুখটা হঠাৎ কেমন যেন নরম হয়ে উঠল।

রাশা শক্ত করে মাদুলিটা ধরে চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলল, "খোদা তুমি আমাকে বাঁচাও, প্লিজ খোদা– আমি খুব বিপদে আছি!"

উঠানের একপাশে আম্মু রাশার হাত ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, বললেন, "রাশা মা তুই আমাকে মাফ করে দিস।"

রাশা কোনো কথা বলল না। আম্মু বললেন, "মা-ই মনে হয় ঠিক বলেছেন। তোর গলাটা কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিলেই মনে হয় বেশি ভালো হতো।"

রাশা এবারেও কোনো কথা বলল না। আম্মু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমি একটু গুছিয়ে নিয়ে তোকে নিতে আসব। খোদার কসম।"

রাশা চোখের পানি আটকে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

আম্মু তখন তার ব্যাগ থেকে একটা মোটা খাম বের করে রাশার হাতে দিয়ে বললেন, "নে। এটা রাখ।"

"এটা কী?"

"কিছু টাকা। বেশি দিতে পারি নাই। দশ হাজার টাকা আছে। তোর কাছে রাখ। লুকিয়ে রাখিস, কাউকে জানতে দিস না।"

রাশা বলল, "আমি টাকা দিয়ে কী করব?"

"তোর লাগবে। সাথে রাখ। নে মা।"

রাশা প্যাকেটটা হাতে নিল। আম্মু তখন চোখ মুছে বললেন, "আর শোন।"

"কী?"

"তোর নানির উল্টাপাল্টা কথা বিশ্বাস করিস না। মাথা খারাপ মানুষ, অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলে।"

রাশা কোনো কথা বলল না। আম্মু বললেন, "সেভেন্টি ওয়ানে যখন বাবাকে মেরে ফেলল তখন থেকে আস্তে আস্তে মাথা খারাপ হয়ে গেল।"

রাশা বলল, "ও।"

"মাথা খারাপ মানুষ তো, একটু মানিয়ে চলিস।"

"চলব।"

আম্মু তখন রাশাকে জড়িয়ে ধরলেন, খানিকক্ষণ ধরে রাখলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি যাই?"

"যাও।"

"কিছু একটা বল।"

"কী বলব?"

"কিছু বলবি না তোর মাকে?"

"আমার জন্য চিন্তা করো না। আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব আম্মু।"

রাশা চাইছিল না তবুও তার মুখে কেমন যেন একটা হাসি ফুটে উঠল। সেই হাসিতে কোনো আনন্দ নেই, সেই হাসিতে গভীর বিষাদ। আম্মু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে লাগলেন।

আম্মু তখন রাশাকে জড়িয়ে ধরলেন।

রাশা টিনের ঘরের বারান্দায় বসে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মুরগি তার ছানাগুলোকে নিয়ে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছানাগুলো তার মায়ের আশেপাশে থাকে, ছানাগুলো জানে তাদের মা সবসময় তাদের দেখেশুনে রাখবে, বিপদ থেকে রক্ষা করবে। রাশা তাকিয়ে দেখল, তার মা তাকে একটা গহীন গ্রামে তার মাথা খারাপ নানির কাছে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

সে দুই হাতে তার মুখ ঢেকে ফেলে। বিড়বিড় করে বলল, "কাঁদব না। আমি কাঁদব না। কিছুতেই কাঁদব না।"

তারপরেও সে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

মাথা খারাপ নানি

রাশা বারান্দায় পা তুলে বসে আছে, তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড়। বেশ কিছু পেট মোটা শিশু একধরনের কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের গায়ে কোনো কাপড় নেই, পোশাক বলতে কোমরে একটা কালো সুতো, সেখান থেকে নানা আকারের তাবিজ ঝুলছে। কিছু কম বয়সী মেয়েও আছে, তাদের এক-দুইজন শাড়ি পরে আছে, তাই তাদের দেখে রীতিমতো বড় মানুষের মতো মনে হচ্ছে। কয়েকজন রুগ্‌ণ মহিলা, তাদের কোলে ন্যাঁদা ন্যাঁদা বাচ্চা, বাচ্চাদের গলায় বড় বড় তাবিজ।

রাশা কী করবে ঠিক বুঝতে পারছিল না, যারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা কোনো কথা বলছে না, নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছু একটা জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছিল তখন, রুগ্‌ণ একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, "তুমি নীলু বুবুর মেয়ে না?"

রাশা মাথা নাড়ল। মহিলা এবারে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাপ তোমার মায়েরে ছেড়ে দিয়েছে না?"

রাশা একটু অবাক হয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল। যখন তার আব্বু-আম্মুর মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে তখন ওর ক্লাসের সবাই সেটা জেনে গিয়েছিল কিন্তু একদিনও কেউ তাকে এটা নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অথচ চেনা নেই জানা নেই মহিলাটি কী সহজে তাকে এটা জিজ্ঞেস করে ফেলল। রাশা একটু অবাক হয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে

রইল, সে কিছু বলার আগেই আরেকজন মহিলা মাথা নেড়ে বলল, "ছেড়ে চলে গেছে, আমরা জানি।"

প্রথম মহিলা জিজ্ঞেস করল, "এখন তোমাদের চলে কেমন করে?"

রাশার নিজের কানকে বিশ্বাস হতে চায় না যে কেউ এরকম একটা প্রশ্ন করতে পারে। সে একটু অবাক হয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল, তখন আবার আরেকজন গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়ে দিল, বলল, "টাকা-পয়সার টানাটানি তো হয়েছেই, তা না হলে নীলু বুবু মেয়েটারে এইখানে ফেলে যায়?"

কমবয়সী একজন গম্ভীর গলায় বলল, "স্বামী ছেড়ে গেলে অনেক কষ্ট।"

বয়স্কা একজন মহিলা বলল, "মনে নাই জমিলার কথা? দুইটা বাচ্চা নিয়া সোজা বাপের বাড়ি। বাপের নিজের পেটে ভাত নাই তখন তার সাথে মেয়ে আর দুই বাচ্চা।"

রাশা নিশ্বাস বন্ধ করে আলাপ-আলোচনা শুনছিল, তখন সাত-আট বছরের একটা মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"রাশা"।

"রাশা? এইটা আবার কী রকম নাম?"

"কেন? রাশা নামে সমস্যা কী?"

"আমরা কোনোদিন এই রকম নাম শুনি নাই।"

মধ্যবয়স্ক একজন মহিলা বলল, "শহরের মানুষের নাম এই রকমই হয়। আমার ননদের ছেলেমেয়ের নাম এই রকম। তুরকা মুরকা–"

শহরের মানুষের বাচ্চাদের নাম তুরকা মুরকা হয় শুনে ছোট বাচ্চাগুলো আনন্দে হেসে ওঠে। নাক থেকে সর্দি বের হচ্ছে এরকম একজন ছেলে তখন সাহস করে এগিয়ে এসে রাশার কনুইটা ছুঁয়ে দেখল। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার বিয়ে হয়েছে?"

রাশা চোখ কপালে তুলে বলল, "বিয়ে? আমার?"

"হ্যাঁ।"

"আমার এখনই বিয়ে হবে কেন? আমি এখন মাত্র ক্লাস এইটে পড়ি।"

যে মহিলাটির ননদের ছেলেমেয়ের নাম তুরকা মুরকা সে গম্ভীর হয়ে বলল, "শহরের মেয়েছেলেদের বিয়েশাদি অনেক দেরি করে হয়।"

কমবয়সী একটা মেয়ে কিন্তু শাড়ি পরে থাকার কারণে যাকে বড় লাগছে, সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কতদিন থাকবে?"

রাশা কষ্ট করে মুখের চেহারা স্বাভাবিক রেখে বলল, "আমি জানি না। মনে হয় কিছুদিন থাকব।"

আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলত কিন্তু এরকম সময় কোথা থেকে জানি নানি এসে হাজির হলেন, তাকে দেখেই ন্যাংটা ছোট বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, যারা একটু বড় তারাও পিছিয়ে এলো। নানি এগিয়ে এসে চোখ সরু করে সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখতে এসেছ, সার্কাস?"

মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা বলল, "না খালা। শুনতে পেলাম নীলু বুবুর মেয়ে এসেছে তাই–"

"যদি সার্কাস না হয়ে থাকে তাহলে এই রকম ভিড় করে আছ কেন? বাড়ি যাও সবাই।"

কোনো কথা না বলে সবাই তখন সরে পড়ল। রাশা বারান্দা থেকে নিচে নেমে বলল, "থ্যাংকু নানি।"

নানি বললেন, "একটু সহ্য করো। এই গাঁও-গেরামে কারো কিছু করার নাই। একটা ছাগলের বাচ্চা হলে সেইটাই হয় একটা ঘটনা। দশ গ্রামের মানুষ সেটা দেখতে আসে। তুই তো আস্ত মানুষ। তোকে দেখতে আসবে না?"

রাশা কোনো কথা বলল না। নানি নিজের মনে কথা বলতে বলতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। রাশা উঠানের মাঝখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, নানি মনে হয় ঠিকই বলেছেন। যেখানে কোনো কিছু ঘটে না সেখানে শহর থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া বাবা-মায়ের একটা মেয়ের চলে আসাটা নিশ্চয়ই অনেক বড় ঘটনা। গ্রামের মানুষ সেই মেয়েটাকে দেখতে আসতেই পারে। রাশার ইচ্ছে করল কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকে। তার এই নানি বাড়িতে সে কোথায় থাকবে কিছু জানে না। তার নিজের খানিকটা জায়গা হবে কিনা সেটাও সে জানে না, কোথায় গিয়ে সে লুকাবে কে জানে?

পুকুরের ঘাটটা নিরিবিলি, হয়তো চট করে সেখানে কেউ চলে আসবে না। রাশা তাই সেদিকেই এগিয়ে গেল। ঘাটের পাশে বসার জন্যে যে জায়গাটা আছে সেখানে বসে থাকলে কেউ দেখে ফেলবে, তাই সে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় বসে যেন কেউ তাকে সহজে দেখতে না পায়।

রাশা কালো পানির দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারে জায়গাটা আসলে খুব সুন্দর। তার মন ভালো নেই তাই তার চোখে পড়ছে না পুকুরটার চারপাশে গাছ, সেই গাছে পাখি কিচমিচ করে ডাকছে। জনমানবহীন নির্জন এলাকা, কেমন জানি একটু গা ছমছম করা ভাব আছে।

রাশা পুকুর ঘাটে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে, সে এখনো পরিষ্কার করে কিছু বুঝতে পারছে না। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এখানে হয়তো তার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। সে এখনো জানে না সে আর লেখাপড়া করতে পারবে কিনা। রাশার মনে হয় তার বুঝি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

ঠিক এরকম সময় সে একজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেল, কেউ একজন পুকুর ঘাটের দিকে আসছে। একটু পরেই সে মানুষটিকে দেখতে পেল, সাত-আট বছরের একটা শুকনো ছেলে, মাথায় এলোমেলো চুল, কাদামাখা শরীর। ছেলেটি আপন মনে কোনো একটা গান গাইছে, গলায় কোনো সুর নেই কিন্তু তাতে তার কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলো না। রাশা এমনভাবে বসেছিল যেন তাকে সহজে দেখা না যায়, তাই ছেলেটি তাকে দেখল না। পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে সে তার শার্ট খুলে ঘাটে ছুড়ে ফেলল, তারপর তার প্যান্ট খুলে ফেলতে শুরু করল।

না জেনে অপরিচিত একটা মেয়ের সামনে প্যান্ট খুলে ফেলে ছেলেটি লজ্জা না পেয়ে যায়, তাই রাশা একটু কাশি দেয়ার মতো শব্দ করল। কিন্তু তার ফল হলো ভয়ানক। শুকনো ছেলেটি চমকে উঠে মাথা ঘুরে তাকাল এবং রাশাকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে এবং কিছু বোঝার আগেই সে তাল হারিয়ে ঝপাং করে পানির মাঝে পড়ে গেল।

রাশা অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, ছেলেটা ততক্ষণে সাঁতরে পুকুরের মাঝামাঝি চলে গেছে, সেখান থেকে সে চিৎকার করতে থাকে। রাশা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?"

ছেলেটা সাঁতরে পুকুরের অন্য পাশে চলে যেতে যেতে বলল, "ভূত!"

"ভূত!" রাশা অবাক হয়ে বলল, "কোথায় ভূত?"

"তুমি!"

রাশা চোখ কপালে তুলে বলল, "আমি? আমি ভূত?"

"হ্যাঁ"

"না-" রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি ভূত না।"

"খোদার কসম?"

"খোদার কসম।"

"তুমি তাহলে কে?"

"এইটা আমার নানি বাড়ি। আমি আমার নানির কাছে এসেছি। আমার নাম রাশা।"

"লাশা?"

"না। লাশা না। রাশা।"

ছেলেটা নিশ্চয়ই পানির পোকা, মাঝ পুকুরে ভাসতে ভাসতে বলল, "সত্যি কথা বলছ?"

"হ্যাঁ সত্যি কথা বলছি।"

ছেলেটা তখন সাঁতরে সাঁতরে পুকুর ঘাটের দিকে আসে। শ্যাওলা ঢাকা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাশার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল, তার মাথা থেকে চুল থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। রাশা একটু এগিয়ে যেতেই সে চিৎকার করে বলল, "কাছে আসবা না।"

রাশা দাঁড়িয়ে গেল, বলল, "ঠিক আছে আসব না।"

ছেলেটি বলল, "এইটা তোমার নানি বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"মিছা কথা।"

"কেন? মিথ্যা কথা কেন হবে?"

"আমি তোমারে আগে কোনোদিন দেখি নাই।"

"আমি আগে কোনোদিন আসি নাই, সেই জন্যে দেখো নাই।"

"খোদার কসম?"

রাশা বলল, "খোদার কসম।"

মনে হয় এইবার ছেলেটার একটু বিশ্বাস হলো, সে ঘাটে উঠে এসে বলল, "তোমারে দেখে যা ভয় পাইছিলাম।"

"ভয় পাওয়ার কী আছে?"

"মঙ্গলবার দুপুর খারাপ সময়। ভূত-পেত্নি বের হয়।"

রাশা এইবারে একটু হেসে ফেলল, সত্যি কথা বলতে কি অনেক দিন পর সে প্রথমবার একটু হাসল। রাশাকে হাসতে দেখে ছেলেটা কেমন যেন চটে উঠে, গরম হয়ে বলল, "হাসো কেন তুমি? হাসো কেন?"

"তোমার কথা শুনে।"

"আমার কোন কথাটা হাসির?'

"ভূত-পেত্নির কথাটা।"

"তুমি বলতে চাও শনিবার আর মঙ্গলবার ভূত-পেত্নি বের হয় না?"

"ভূত-পেত্নি থাকলে শনি, মঙ্গল কেন অন্যবারেও বের হতো। ভূত-পেত্নি বলে এই দুনিয়াতে কিছু নাই।"

ছেলেটা একধরনের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রাশার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, রাশার কথায় সে বুঝি রীতিমতো অপমানিত বোধ করছে। ক্রুদ্ধ মুখে বলল, "যেই জিনিসটা জানো না সেইটা নিয়ে কথা বলা ঠিক না।"

"আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি।"

"তুমি জিন ভূত-পেত্নি বিশ্বাস করো না?"

"না।"

"যখন দেখবা তখন মজাটা টের পাবা।"

রাশা হাসি হাসি মুখ করে বলল, "তুমি আমাকে একটা ভূত দেখাতে পারবে?"

"সেইটা আর কঠিন কী? অমাবস্যার রাতে শ্মশানঘাটে গেলেই দেখবা ভূত-প্রেত আর পিশাচ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

রাশা তার মুখের হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত করে বলল, "তুমি আমাকে একটা ভূত ধরে এনে দিতে পারবে?"

"ভূত ধরে আনব?"

"হ্যাঁ যদি ভূত ধরে আনতে পারো তাহলে তোমাকে আমি একশ টাকা দিব। আর যদি একটা শিশিতে ভরে এনে দিতে পারো তাহলে তোমাকে দিব একশ তিরিশ টাকা।"

ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড রাশার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তুমি আমার সাথে মশকরা করছ?"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

ছেলেটার আরো রেগে উঠার কথা ছিল কিন্তু সে রেগে না উঠে হঠাৎ করে দাঁত বের করে হেসে ফেলল, বলল, "তুমি অনেক আজিব মানুষ।"

"আজিব কোনো শব্দ নাই। শব্দটা আজব।"

ছেলেটা আরো জোরে জোরে হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে বলল, "আজিব! আজিব! একদম আজিব।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"জিতু। জিতু মিয়া।"

"ভেরি গুড জিতু মিয়া। তোমার সাথে আমার পরিচয় হলো।"

জিতু মিয়া আবার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে থেমে গেল, বলল, "তোমারে আমি কী ডাকব? রাশা খালা?"

"খবরদার। আমাকে খালা ডাকলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

"কিন্তু তুমি তো সম্পর্কে আমার খালা। তোমার মা হচ্ছে আমার নানির ফুপাতো বোন--"

"আমি এতো কিছু বুঝি না, কিন্তু আমাকে খালা ডাকতে পারবে না। আমাকে খালা ডাকলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

রাশার কথা শুনে জিতু মিয়ার খুব আনন্দ হলো, সে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "আজিব! আজিব! তুমি এক্কেবারে আজিব!"

"আজিব হলে আজিব।"

"তাহলে তোমাকে কী বলে ডাকব?"

"আমার নাম রাশা। রাশা বলে ডাকো।"

জিতু মিয়া জিবে কামড় দিল, বলল, "সর্বনাশ! তুমি আমার বড়, তোমারে নাম ধরে ডাকলে গুনাহ হবে।"

"তাহলে রাশা আপু বলে ডাকো। শর্টকাট করে বলতে পারো রাশাপু।"

এই নামটা জিতু মিয়ার খুব পছন্দ হলো, হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "রাশাপু! রা-শা-পু! এইটা ঠিক আছে। খালারে আপু ডাকলে লোকজন মনে হয় পাগল বলবে। বললে বলুক!"

জিতু মিয়া এবারে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেখানে থেকেই একটা লাফ দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকে দেখা গেল না, একটু পরে পুকুরের মাঝামাঝি ভুস করে সে ভেসে উঠল, চিৎকার করে কিছু একটা বলে সে আবার পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখে রাশার রীতিমতো হিংসা হয়, বাচ্চা ছেলেটা পানিতে কী সুন্দর দাপাদাপি করছে, দেখে মনে হয় শুকনো মাটি থেকে পানিটাই বুঝি তার জন্যে সহজ! এই বাচ্চাটার মতো সেও যদি সাঁতার জানত তাহলে সেও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত!

নানি বাড়িতে সন্ধে হলো খুব বিচিত্রভাবে। আশেপাশে যা কিছু ছিল সবাই যেন বুঝে গেল, সন্ধে হচ্ছে, তাই বাড়ি ফিরতে হবে। গরুরা লাইন ধরে তাদের বাড়ি ফিরে এলো। পুকুর থেকে হাঁসগুলো থপ থপ করে উঠে এলো, মোরগ-মুরগিরাও ব্যস্ত হয়ে তাদের ঘরে ঢুকে পড়তে লাগল। আশেপাশের গাছে পাখির কিচিমিচি ডাক একশ গুণ বেড়ে গেল, আকাশে বড় বড় বাদুড় উড়তে লাগল। দূর থেকে উলুধ্বনি শোনা গেল, তারপর আরো দূর থেকে আজান। তারপর আস্তে আস্তে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটি নেই, তাই কোনো বাতি জ্বলে উঠল না। নানি একটা হ্যারিকেন আর দুটি কুপি বাতি জ্বালালেন। কুপি বাতির আলোটা একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো দপদপ করে জ্বলতে থাকে, রাশা অবাক হয়ে দেখে আগুনের শিখার সাথে সাথে তার বড় একটা ছায়া টিনের দেয়ালে ছটফট

করে নড়ছে। এর আগে রাশা মনে হয় কখনোই ঠিক করে অন্ধকার দেখেনি, ঘর কখনো অন্ধকার হলেই টুক করে লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে, সাথে সাথে অন্ধকার ছুটে পালিয়েছে। এই প্রথমবার চারিদিক থেকে অন্ধকার তাকে চেপে ধরছে, কুপি বাতির আলো সেই অন্ধকারকে কোনোভাবেই দূর করতে পারছে না। বরং মনে হচ্ছে এই আলোর কারণে চারপাশে অন্ধকার বুঝি আরো জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

রাশা বারান্দায় চুপচাপ বসে রইল। শুনতে পেল আস্তে আস্তে পাখির কিচিমিচি ডাক কমে আসছে, বাতাসে শুধু গাছের পাতার শিরশির এক ধরনের শব্দ। কী অদ্ভুত সেই শব্দ, শুনলেই বুকের ভেতর কেমন যেন ফাঁকা লাগতে থাকে।

হঠাৎ খুব কাছে থেকে ঠিক মানুষের গলায় কে জানি হোয়া হোয়া হোয়া করে শব্দ করে উঠল, রাশা চমকে ওঠে, ভয়ে তার বুক ধক ধক করতে থাকে। লাফিয়ে উঠে সে ঘরের ভেতর ছুটে গেল। কোনার রান্নাঘরে মাটির চুলোতে নানি রান্না করছেন, রাশাকে ছুটে আসতে দেখে বললেন, "কী হয়েছে?"

"ওটা কীসের শব্দ?"

নানি বললেন, "কোনটা?"

"ঐ যে ডাকছে।"

নানি কান পেতে শুনলেন, তারপর ফিক করে হেসে বললেন, "ও মা! তুই কখনো শেয়ালের ডাক শুনিসনি!"

"এটা শেয়ালের ডাক?"

"হ্যাঁ।"

"কী আশ্চর্য, ঠিক মানুষের মতো গলা!"

"কে জানে হয়তো মানুষই ডাকছে। শেয়ালেরা মাঝে মাঝে মানুষের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যায়। নিজের বাচ্চার মতো করে পালে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি যখন ছোট তখন এই গ্রামে শেয়ালের খুব উৎপাত। সবাই মিলে তখন শেয়ালের গর্তে ধোঁয়া দিয়ে শেয়ালগুলোকে বের করে পিটিয়ে

পিটিয়ে মারল! মরা শেয়ালগুলো যখন ফেলে দিচ্ছিল তখন দেখে একটা শেয়াল অন্যরকম, লেজ নাই, গায়ে লোম নাই। ভালো করে তাকিয়ে দেখে মানুষের বাচ্চা!"

রাশা একটু শিউরে উঠে বলল, "ইশ!"

"গাঁও-গেরামে যখন বাচ্চা হয় তখন খুব সাবধানে থাকতে হয়।"

নানি আবার চুলোতে কিছু শুকনো পাতা গুঁজে দিয়ে আগুনটা আরেকটু বাড়িয়ে নিলেন। চুলোর কাছে এত গরমে নানি রান্না করছেন তার কোনো কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না। রাশা কিছুক্ষণ রান্নাঘরে নানিকে রান্না করতে দেখে, তারপর আবার বের হয়ে এসে বারান্দায় বসল।

বাইরে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে আসার পর সবকিছু আবছা আবছাভাবে দেখা যেতে থাকে। রাশা আকাশের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল, সারা আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ঝকঝক করছে। সে কোনোদিন টের পায়নি যে আকাশে এতো তারা আছে, সত্যি কথা বলতে কী, সে আগে কখনো আকাশের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি। আকাশে যখন তারাগুলো জ্বলজ্বল করতে থাকে তখন সেটা যে এত সুন্দর হতে পারে সে কল্পনাও করেনি। ঠিক তখন সে দেখল একটা তারা আকাশ থেকে খসে পড়ল। কী আশ্চর্য! সে বইয়ে পড়েছে রাতের আকাশে যখন উল্কা ছুটে যায় তখন সেটা জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়। সে এই প্রথমবার একটা উল্কাকে এভাবে ছুটে যেতে দেখল। রাশা অনেকটা সম্মোহিতের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাতের খাবারের আয়োজন হলো খুব সাদামাটা। ঘরের মেঝেতে একটা পাটি বিছানো হলো, সামনে রান্নার ডেকচি আর থালা। নানি একটা পিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসলেন, প্লেটটা নিলেন নিজের কোলে। রাশার প্লেটে খাবার তুলে দিয়ে বললেন, "তোর মনে হয় এখানে খাবার কষ্টে হবে। আমি একা মানুষ, এতদিন ঘাস-লতাপাতা খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। তুই তো পারবি না।"

রাশা বলল, "তুমি যদি ঘাস-লতাপাতা খেতে পারো, আমিও পারব।" নানি মাথা নাড়লেন, বললেন, "না। তোদের বাড়ন্ত শরীর। ভালো করে খেতে হবে।"

ঠিক তখন সে দেখল একটা তারা
আকাশ থেকে খসে পড়ল।

নানি রাশার প্লেটে খাবার তুলে দিতে লাগলেন। ভাত, সবজি, মুরগির মাংস। রাশার কেমন জানি রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছিল, সে বুভুক্ষের মতো খেল। খাবারে ঝাল একটু বেশি কিন্তু খুব চমৎকার রান্না, বাসায় ফ্রিজের বাসি খাবার গরম করে খাওয়া থেকে একবারে অন্যরকম। সবকিছুতে কেমন যেন একটা তাজা তাজা ঘ্রাণ।

রাশা বলল, "নানি তুমি খুব সুন্দর রান্না করতে পারো!"

নানি হাসলেন, বললেন, "একসময় পারতাম। এখন অভ্যাস চলে গেছে। নিজের জন্য নিজে রান্না করা যায় না। রান্না করে সবসময় কাউকে খাওয়াতে হয়। তোর নানা খুব ভালো খেতে পছন্দ করত–"

হঠাৎ করে নানি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কোলের মাঝে প্লেটটা রেখে চুপচাপ বসে রইলেন। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক– মনে হয় কিছুই দেখছেন না। রাশা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, নানিকে দেখে তার কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে।

ঘরে একটা মাত্র ছোট খাট, তাই রাতে কেমন করে ঘুমানো হবে সেটা নিয়ে রাশার ভেতরে খানিকটা দুশ্চিন্তা ছিল। খাবার পরেই নানি বিছানায় একটা পরিষ্কার কাঁথা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, "নে ঘুমা।"

রাশা বলল, "তুমি?"

"আমি মাটিতে একটা মাদুর বিছিয়ে নেব।"

"না না– সেটা কেমন করে হয়। তুমি বিছানায় ঘুমাও নানি, আমি নিচে ঘুমাব।"

"তুই নিচে ঘুমাবি?"

"হ্যাঁ।"

"রাত্রিবেলা যখন শরীরের ওপর দিয়ে ইঁদুর দৌড়ে যাবে তখন ভয় পাবি না তো?"

"ইঁদুর?" রাশা চোখ কপালে তুলে বলল, "শরীরের ওপর?"

নানি হাসলেন, বললেন, "ধুর বোকা মেয়ে, ঠাট্টা করলাম। ইঁদুর তো আছেই। তারা এত বোকা না যে মানুষের শরীরের ওপর দিয়ে দৌড়াবে!"

'স-সত্যি? ইঁদুর আছে?"

"গাঁও-গেরামে ইঁদুর থাকবে না তো কী থাকবে? ইঁদুর ইঁদুরের মতো থাকে আমরা আমাদের মতো থাকি। কেউ কাউকে ঘাঁটাই না।"

"তাই বলে ইঁদুর?"

"ইঁদুরের কথা শুনেই এত ভয় পাচ্ছিস, সাপ দেখলে তোর কী অবস্থা হবে?"

"সাপও আছে?" রাশা ফ্যাকাসে মুখে বলল, "ঘরের ভেতরে?"

"এখন নাই। বর্ষাকালে যখন পানি হবে তখন ঘরের ভেতরেও সাপ চলে আসে। সাপদের থাকতে হবে না কোথাও?"

"কামড় দেয় না?"

"শুধু শুধু কামড় দেবে কেন? আমরা ওদের ঘাঁটাই না ওরাও আমাদের ঘাঁটায় না।"

রাশা একটু ইতস্তত করে বলল, "নানি।"

"কী হলো?"

"একটা কাজ করা যাক।"

"কী কাজ?"

"তুমিও বিছানার ওপর চলে এসো। দুইজনের জায়গা হয়ে যাবে।"

নানি হাসলেন, বললেন, "তাহলে তুই ঘুমাতে পারবি না। আমার সারারাত ঘুম হয় না। আমি শুধু ছটফট করি। পাগল মানুষ তো, মাথার ভিতরে আউলাঝাউলা হয়ে আছে, উল্টাপাল্টা জিনিস দেখি। হাহুতাশ করি। বেশির ভাগ রাত্রে আমি বারান্দায় বসে থাকি।"

"বসে কী করো?"

"কিছু করি না। মাথাটা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করি।"

রাশা কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "ও।" একটু পরে বলল, "আমিও বারান্দায় বসে ছিলাম, বসে বসে আকাশের তারা দেখেছি।"

নানি মাথা নাড়লেন, বললেন, "আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা।"

"আমি যখন তারা দেখছিলাম তখন একটা তারা শাঁই করে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হলো যেন পড়ে গেল।"

"তখন কী চাইলি?"

"চাইলাম? কার কাছে?"

"ও! তুই জানিস না? যখন আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে তখন সেই তারার দিকে তাকিয়ে যেটা চাওয়া যায় সেটাই পাওয়া যায়।"

"সত্যি?"

"লোকেরা তো বলে! চেষ্টা করে দেখিস পরেরবার।"

রাত গভীর হলে রাশা বিছানায় শুতে গেল। বিছানায় শুয়ে সে তার ঘড়িটা দেখে অবাক হয়ে যায়, মাত্র সাড়ে নয়টা বাজে। এর মাঝে চারপাশে নিশুতি রাত।

বিছানায় শুয়ে রাশা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। সারাটা দিন কিভাবে কিভাবে যেন কেটে গেছে, এখন রাতে অন্ধকার একটা ঘরে ছোট একটা বিছানায় নরম কাঁথার উপর শুয়ে শুয়ে রাশার সবকিছু মনে পড়ে যায়। রাশার মনে হতে থাকে তার বুকের ভেতরটা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কী চমৎকার একটা স্কুলে সে পড়ত, তার কত চমৎকার বন্ধুরা ছিল সেখানে, তার স্কুলের ম্যাডামরা তাকে কত আদর করতেন। বাবা চলে গেছেন, মায়ের সাথে বিশাল একটা দূরত্ব হয়ে ছিল, তারপরেও তো তার নিজের একটা ঘর ছিল, সেই ঘরে তার প্রিয় বইগুলো ছিল। তার ঘরে একটা জানালা ছিল সেটা দিয়ে আকাশটা দেখা যেত না সত্যি কিন্তু রাস্তাটা দেখা যেত, মানুষজন হাঁটছে-বাস-গাড়ি-টেম্পো চলছে। তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার কম্পিউটার, সেটাও ছিল একটা জানালার মতো, সেটা দিয়ে সে পুরো পৃথিবীটার দিকে উঁকি দিতে পারত। এখন এই ছোট টিনের ঘরে সে তার মাথা খারাপ নানির সাথে আটকা পড়েছে। তার লেখাপড়া বন্ধ, স্কুল নেই, গ্রামের মানুষেরা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কেমন করে থাকবে সে এখানে? এর চাইতে তার কি মরে যাওয়া ভালো ছিল না?

রাশা হঠাৎ নিজেকে সামলাতে পারল না, হাউমাউ করে সে কেঁদে দিল। প্রাণপণে সে নিজেকে থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে দমকে দমকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ করে রাশা তার কপালে একটা হাতের স্পর্শ পেল। তার নানি মাথার কাছে এসে বসে তার কপালে হাত রেখেছেন। রাশা শুনল তার নানি ফিসফিস করে বলছেন, "কাঁদিস না সোনা। কেউ কাঁদলে কী করতে হয় আমি জানি না।"

রাশা ঘুরে অসহায়ের মতো নানির কোলে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার কী হবে নানি? আমার এখন কী হবে?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখিস সোনা আমার। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কেমন করে ঠিক হবে নানি? আমি তো লেখাপড়া করতে চেয়েছিলাম। আমার কী সুন্দর একটা স্কুল ছিল, বন্ধুরা ছিল, স্যার-ম্যাডাম ছিল! এখন আমি এখানে একা একা কী করব? কেমন করে করব?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে সোনা।"

রাশা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হবে না নানি হবে না। আমি জানি। আমি মরে যাব নানি। আমি মরে যাব।"

নানি রাশার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ছিঃ! এভাবে বলে না। আমি তো পাগল মানুষ, এত কিছু বুঝি না। আমি শুধু একটা জিনিস বুঝি। সেটা হচ্ছে বেঁচে থাকতে হয়। মরে গেলে সব শেষ তখন আর কিছু করা যায় না। কিন্তু বেঁচে থাকলে একটা উপায় হয়। তুই দেখিস তোর সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

"তুমি সত্যি বলছ নানি?"

"হ্যাঁ সোনা। আমি সত্যি বলছি।"

রাশা তার নানিকে শক্ত করে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। এই মানুষটিকে সে চব্বিশ ঘণ্টা আগেও চিনত না, কখনো দেখেনি। এখন তার এই মাথা খারাপ নানিটিই হচ্ছে সারা পৃথিবীর মাঝে একমাত্র ভরসাস্থল।

নানি রাশার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, তার মাথার মাঝে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল, তারপরও তিনি রাশাকে ধরে রাখলেন।

সবার সাথে পরিচয়

রাশার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে, বাইরে তখনো ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি। শুয়ে থেকেই সে শুনতে পেল নানি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছেন। এত সকালে কেন উঠান ঝাঁট দিতে হবে রাশা বুঝতে পারে না। সে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, নানি তাকে দেখে ঝাঁট দেয়া বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, "তুই এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিস কেন?"

"ঘুম ভেঙে গেল। তুমি এত সকালে উঠান ঝাঁট দিচ্ছ কেন?"

"জানি না।"

"জানো না?"

"নাহ। কিছু একটা না করলে সময় কাটে না, তাই কাজকর্ম করি।"

"আমাকে দাও ঝাঁটাটা, আমি উঠানটা ঝাড়ু দিই।"

নানি হাসলেন, বললেন, "তোকে উঠান ঝাঁট দিতে হবে না।"

"আমি পারব নানি।"

"আমি জানি তুই পারবি। না পারার কী আছে?"

"তাহলে?"

"আমার মাথা আউলাঝাউলা, তাই আমি এরকম উল্টাপাল্টা কাজ করি। তুই কেন করবি?"

রাশা বারান্দা থেকে নেমে বলল, "তাহলে কী করব বলো।"

"কিছু একটা যদি করতেই চাস, তাহলে মোরগ আর হাঁসের ঘরের দরজাগুলো খুলে দে।"

রাশা তখন উঠানের এক কোনায় হাঁস-মোরগের ঘরের দরজাটা খুলে দিল, সাথে সাথে কঁক কঁক শব্দ করে প্রথমে মোরগ-মুরগি তাদের পিছু পিছু থপথপ করে হাঁসগুলো বের হয়ে এলো। মুরগিটা বারকয়েক ডানা ঝাঁপটিয়ে শব্দ করতে থাকে তখন বাচ্চাগুলো কিচিমিচি শব্দ করে তার মাকে ঘিরে ধরে। কী মজার একটা দৃশ্য!

নানি বললেন, "ভিতরে ডিম আছে না দেখ দেখি।"

রাশা মাথা নিচু করে তাকিয়ে দেখে সত্যি সত্যি সেখানে দুটি ডিম। সে হাত দিয়ে ডিম দুটি বের করে এনে বলে, "কী আশ্চর্য!"

"কোন জিনিসটা আশ্চর্য?"

"এই যে ডিম! আমি ধরেই নিয়েছিলাম ডিম ফ্রিজের ভিতরে পাওয়া যায়! ভুলেই গিয়েছিলাম যে আসলে হাঁস-মুরগি ডিম পাড়ে।"

"হাত-মুখ ধুয়ে আয় তোকে ডিম ভাজি করে দিই। নাস্তা করবি।"

একটু বেলা হতেই গ্রামের বউ-ঝিরা আসতে শুরু করল, সবাই রাশাকে একনজর দেখতে চায়। যে মেয়েটির বাবা-মায়ের ছাড়াছড়ি হয়ে গেছে এবং যার মা তাকে গ্রামের বাড়িতে পাগলি নানির কাছে ফেলে রেখে চলে গেছে সেই মেয়েটি দেখতে কেমন সেটা জানার জন্য সবার মাঝেই কৌতূহল। রাশা প্রথমে কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই তার কাছে পুরো ব্যাপারটা অসহ্য মনে হতে থাকে। খুব মাথা ধরেছে বলে সে একসময় বাড়ির ভেতরে ঢুকে বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল।

বউ-ঝিরা হতাশ হয়ে চলে যাবার পর নানি এসে রাশার মাথার কাছে বসলেন, কপালে হাত রেখে বললেন, "শরীরটা কি বেশি খারাপ লাগছে?"

রাশা উঠে বসল, বলল, "না, নানি। আমার শরীর ঠিকই আছে কিন্তু এই যে মানুষজন আমাকে দেখতে আসছে, আমি সেটা সহ্য করতে পারছি না।"

নানি বললেন, "ও।"

"আমি কী আজগুবি একটা জন্তু যে মানুষ আমাকে দেখতে আসবে?"

নানি একটু হাসলেন, বললেন, "এই গ্রামের মানুষের কাছে তুই আসলেই আজগুবি একটা জন্তু।"

"থ্যাংক ইউ নানি!"

"আমি বলি কী– তুই নিজেই গ্রামটা ঘুরে আয়। সবার সাথে পরিচয় করে আয়। তাহলে কেউ তোকে আর বিরক্ত করবে না।"

"আমি? আমি নিজে?"

নানি মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ।"

"তুমি আমার সাথে যাবে?"

"নাহ্!" নানি মাথা নাড়লেন, "আমি পাগলছাগল মানুষ, আমার ঘর থেকে বের হতে ভালো লাগে না।"

"তাহলে? আমি তো কিছুই চিনি না।"

এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্যেই মনে হলো ঠিক এই সময় জিতু ঘরের ভেতর উঁকি দিল, উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "রাশাপুর নাকি শরীর খারাপ। কলেরা?"

রাশা চোখ কপালে তুলে বলল, "কলেরা? আমার?"

জিতু ঘরে ঢুকে বলল, "হ্যাঁ। জোবেদা ফুপু তোমাকে দেখতে আসছিলেন, তোমার শরীর খারাপ সেই জন্যে দেখতে পারেন নাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে। ফুপু বললেন, জানি না, মনে হয় কলেরা। শহরের মানুষ গ্রামে আসলেই পেটে অসুখ হয়। কলেরা হয়।"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমার কলেরা হয় নাই।"

"তাহলে কী হয়েছে?"

"কিছুই হয় নাই।"

"কিন্তু–"

রাশা জিতুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "জিতু মিয়া তুমি একটা কাজ করতে পারবে?"

"পারব না কেন? একশবার পারব।"

রাশা ভুরু কুঁচকে বলল, "কাজটা কী না শুনেই যে বলে দিলে পারব? আমি যদি এখন বলি আমাকে ঘাড়ে করে বাজারে নিয়ে যেতে হবে?"

জিতু দাঁত বের করে হেসে বলল, "আজিব! তুমি আজিব!"

রাশা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমি এখন এই গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখব। সবার বাড়িতে বেড়াতে যাব। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?"

জিতুর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হাতে কিল মেরে বলল, "সবার আগে আমাদের বাড়ি!"

রাশা বলল, "সেটা দেখা যাবে!"

জিতুকে নিয়ে বের হওয়ার পর রাশা বুঝতে পারল এ কাজের জন্যে জিতু থেকে ভালো আর কেউ হতে পারে না। সে যে শুধু এই গ্রামের সব মানুষকে চিনে তা নয়, গরু-ছাগল-ভেড়া এমন কি গাছগুলোকেও চিনে। সে যে শুধু কোন মানুষ কী রকম সেটা বলতে পারে তা নয়, কোন গরু-ছাগলের কী রকম মেজাজ সেটাও বলতে পারে। বাড়ি থেকে বের হয়েই সে দূরে একটা গরুকে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে কালো গাইটা দেখছ, খবরদার ঐটার ধারেকাছে যাবা না।"

রাশা জানতে চাইল "কেন?"

"এই গাইটা পাগল। কাছে গেলেই টুঁস দিবে।"

"পাগল কেমন করে হলো?"

"সেইটা জানি না। অমাবস্যার রাত্রে ছাড়া পেয়ে একবার শ্মশানঘাটে ঢুকে গিয়েছিল, মনে হয় সেই থেকে পাগল।"

রাশা এই ব্যাখ্যাটার কোনো ব্যাখ্যা চাইল না। জিতু হাঁটতে হাঁটতে একটা ঝাপড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলল, "রাত্রিবেলা কখনো এই গাছের নিচ দিয়ে হাঁটবা না।"

"কেন?"

"এইটা শ্যাওড়াগাছ। এই গাছে ভূত আছে।"

"কী করে ভূতে?"

"রাত্রিবেলা কেউ নিচে দিয়ে গেলে তার শরীরে পেশাব করে দেয়।"

ভূতদের নিশ্চয়ই কাজকর্ম থাকে, তারপরেও শুধু মানুষের ওপর পেশাব করার জন্যে শ্যাওড়াগাছে কেন বসে থাকতে হয় রাশা সেটা বুঝতে পারল না। কিন্তু রাশা সেটা নিয়ে জিতুর সাথে তর্ক করল না, এতক্ষণে সে বুঝে গিয়েছে জিতুর সব কথাতেই ভূত-প্রেত জিন-পরীর গন্ধ থাকে।

প্রথমে তারা যে বাড়িটাতে গেল তার সামনে একটা বড় উঠোন, আর সেখানে ধান বিছিয়ে শুকানো হচ্ছে। ধান খাবার জন্য কিছু পাখি ওড়াউড়ি করছে; কমবয়সী একটা মেয়ে একটা বাঁশের কঞ্চি হাতে নিয়ে সেগুলোকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। জিতু মেয়েটাকে বলল, "শিউলী দেখ তোদের বাড়িতে কোন অতিথকে নিয়ে এসেছি।"

রাশা গলা নামিয়ে বলল, "শব্দটা অতিথ না, অতিথি।" জিতু শুদ্ধ শব্দ বলায় কোনো উৎসাহ দেখাল না, গলা উঁচিয়ে বলল, "সফুরা খালা, আপনার বাড়িতে বিদেশি অতিথ নিয়ে আসছি।"

রাশা কেমন করে বিদেশি অতিথি হলো সে বুঝতে পারল না। দেখা গেল বাড়ির চারপাশ থেকে পিলপিল করে নানা আকারের মানুষজন বের হয়ে এলো। বিদেশি অতিথিটা কে সবাই জানে এবং সবারই তাকে দেখার একটা কৌতূহল আছে। কেউ কিছু বলার আগেই রাশা বলল, "আমি তো আগে কখনো এই গ্রামে আসি নাই, কারো সাথে পরিচয় নাই। তাই জিতু মিয়াকে নিয়ে বের হয়েছি সবার সাথে পরিচয় করতে।"

বয়স্কা একজন মহিলা রাশার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "খুব ভালো করেছ মা। আমরা খালি তোমাদের কথা শুনি। কোনোদিন দেখি নাই। আজকে দেখলাম, দেখে আমাদের বুকটা ভরে গেল।"

রাশা একটু অবাক হয়ে বয়স্কা মহিলাটার মুখের দিকে তাকাল, তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কথাটা শুধু বলার জন্যে বলেনি, সত্যি সত্যি বলেছে। সত্যি রাশাকে দেখে তার বুকটা ভরে গেছে। তাকে চেনে না, জানে না, কোনোদিন দেখেনি কিন্তু তার পরেও তাকে দেখে এই সাদাসিধে বয়স্কা মহিলার বুকটা ভরে গেছে। কী আশ্চর্য! ঠিক কী কারণ জানা নেই, রাশার চোখের কোনায় হঠাৎ একটু পানি চিকচিক করে ওঠে। সেটা গোপন করে সে সহজ গলায় বলল, "আমি তো এখন নতুন এসেছি, আপনাদের কাউকেই চিনি না! আস্তে আস্তে পরিচয় হবে।"

আরেকজন এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "তুমি কি আসলেই এখানে থাকবে নাকি আমাদের ভেতর মায়া জাগিয়ে চলে যাবে?"

রাশা বলল, "আসলেই থাকব।"

ছোট একটা মেয়ে হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা!"

মধ্যবয়স্কা মহিলাটা বলল, "এই, জলচৌকিটা এনে দে। মেয়েটা বসুক।"

রাশা বলল, "আজকে বসব না। গ্রামের সব বাড়িতে যাব তো– তাই দেরি করব না। আরেক দিন এসে বসব।"

"তাই বলে তুমি খালি মুখে চলে যাবে নাকি? কিছু একটা খেতে হবে।"

রাশা বলল, "না-না-না, কিছু খাব না।"

মহিলা মাথা নাড়লেন, "কিছু একটা খেতে হবে।"

রাশা মহিলার হাত স্পর্শ করল, বলল, 'বিশ্বাস করেন, আমি খেয়ে বের হয়েছি। আরেক দিন খাব।"

"ঠিক আছে তাহলে একটা ডাব খেয়ে যাও। ডাবের পানি খেতে তো আর পেটে জায়গা থাকতে হয় না।"

মহিলাটি একটা শুকনো কালো ছেলেকে ডেকে বললেন, "এই মতি। তাড়াতাড়ি কয়টা ডাব পাড় দেখি।"

মতি নামের শুকনো টিংটিংয়ে ছেলেটা সাথে সাথে তার লুঙ্গি মালকোচা মেরে পরে কোথা থেকে একটা ধারালো দা এনে পিছনে গুঁজে নিল। তারপর উঠানের কয়েকটা নারকেল গাছের দিকে তাকিয়ে একটাকে বেছে নিয়ে সেটা বেয়ে তরতর করে উঠে যেতে লাগল। রাশা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, এরকমভাবে কেউ যে নারকেল গাছে উঠে যেতে পারে সেটা সে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না। দেখে মনে হচ্ছে মতি নামের ছেলেটা বুঝি মানুষ না, যেন সে একটা টিকটিকি!

রাশা নিশ্বাস আটকে বলল, "হায় খোদা! যদি পড়ে যায়?"

ছোট মেয়েটা বলল, "পড়বে না! মতি বান্দরের বাচ্চার মতো গাছে উঠে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফ দিতে পারে!"

রাশা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "সর্বনাশ!"

মতি সত্যি সত্যি একটা বানরের মতো নারকেল গাছের উপরে উঠে যায়, পিছন থেকে দা-টা বের করে দক্ষ হাতে কোপ দিয়ে দুটি ডাব কেটে নেয়.

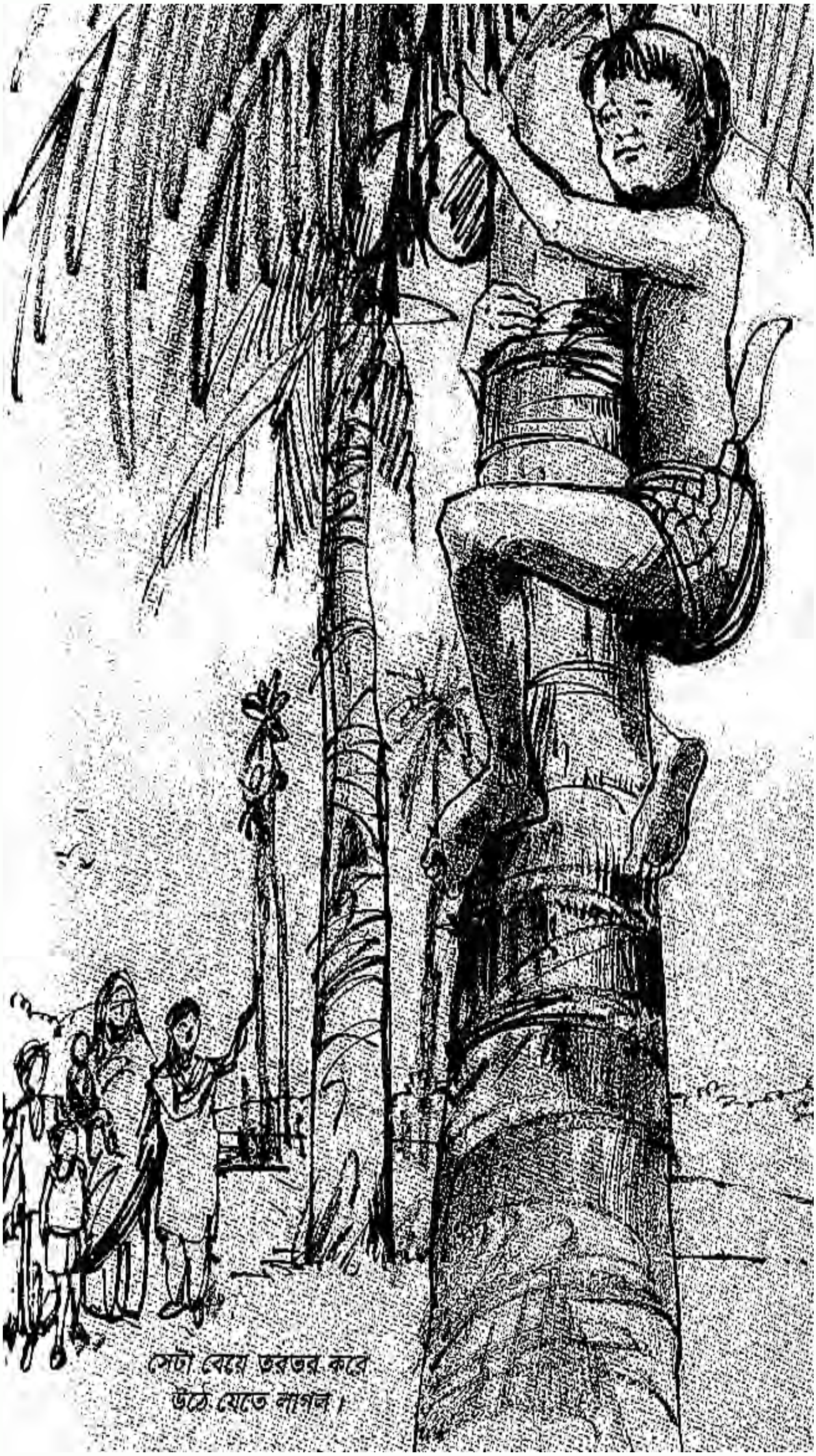

সেটা বেয়ে তরতর করে
উঠে যেতে লাগল।

তারপর যেভাবে উঠেছিল ঠিক সেভাবে তরতর করে নেমে এলো। তাকে দেখে মনে হয় শুকনো মাটিতে হাঁটাহাঁটি করার থেকে গাছ বেয়ে উঠা এবং নামা তার জন্যে সহজ।

মতি ডাবটার পেছন দিকটা কেটে একটা ছোট ফুটো করে সেটা রাশার হাতে তুলে দিল। রাশা জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে খাব?"

"মুখে লাগিয়ে!"

"সত্যি?"

মতি নামের শুকনো কালো ছেলেটা তার ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল, "সত্যি!"

রাশা ডাবটা তার মুখে লাগিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করল, যতটুকু তার মুখের ভেতর গেল তার থেকে অনেক বেশি তার গাল বেয়ে গড়িয়ে গলা-বুক ভিজিয়ে দিল। সেই দৃশ্য দেখে ছোট বাচ্চাগুলো আনন্দে হি হি করে হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকে। এত অল্পে মানুষকে এত আনন্দ দেয়া যায় রাশা আগে কোনোদিন টের পায়নি।

বহুদিন আগে রাশার যখন চিকেন পক্স হয়েছিল তখন তার কিছুদিন জোর করে ডাবের পানি খেতে হয়েছিল, তার কাছে মনে হয়েছিল এটা আঁশটে গন্ধের বিস্বাদ একটা তরল। কিন্তু গাছ থেকে পেড়ে আনা এই ডাবটার পানি মিষ্টি এবং সুস্বাদু। গন্ধটাও সুন্দর। রাশা শখ করে খানিকটা খেয়ে বলল, "আর পারছি না।"

মধ্যবয়সী মহিলাটি বললেন, "জিতু তুই খেয়ে ফেল।"

জিতু কোনো আপত্তি না করে সাথে সাথে রাশার হাত থেকে নিয়ে ডাবটা মুখে লাগিয়ে ঢকঢক করে খেতে শুরু করল।

বিদায় নিয়ে আসার সময় রাশা হঠাৎ থেমে গেল। পাশের মাটির একটা ঘরের বারান্দায় পেট মোটা একটা বাচ্চা পা ছড়িয়ে বসে আছে, তার শরীরে কোনো কাপড় নেই। সামনে মাটিতে কিছু মুড়ি ছড়ানো, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটি থেকে তুলে তুলে একটা একটা করে মুড়ি খাচ্ছে। কাছাকাছি একটা শালিক পাখি মুড়িতে ভাগ বসানোর চেষ্টা করছে। বাচ্চাটা একটু অসতর্ক হলেই শালিক পাখিটা ছুটে এসে একটা-দুইটা মুড়ি খেয়ে নিচ্ছে।

রাশা যখন অবাক হয়ে এই দৃশ্যটি দেখছে তখন জিতু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রাশাপু?"

"এই বাচ্চাটা কার?"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন কমবয়সী মেয়ে বলল, "আমার।"

"মাটি থেকে মুড়ি তুলে খাচ্ছে ওর তো অসুখ করবে।"

মেয়েটা একটু বিব্রতভাবে হেসে বলল, "করবে না। ওর অভ্যাস আছে।"

রাশা বলল, "কিন্তু এইটা তো খুব খারাপ অভ্যাস! মাটিতে কত রোগ-জীবাণু। আমাদের স্কুলে একটা মাইক্রোস্কোপ আছে, আমাদের স্যার দেখিয়েছিলেন, জীবাণুরা গিজগিজ করছে। ওকে একটা বাটিতে না হয় থালায় করে দিন।"

মেয়েটি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "থালা বাটিতে দিলে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে। মাটিতে ছিটিয়ে দিলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খায়।"

রাশা থতমত খেয়ে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু মাটি থেকে তুলে খেলে তো অসুখ হবে।"

"একটু-আধটু অসুখ হলে কী হয়? সবারই হয়।"

রাশা অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল, কী বিচিত্র একটা যুক্তি! সে অবশ্যি এত সহজে মেয়েটার যুক্তি মেনে নিল না, মাটি থেকে মুড়িগুলো সরিয়ে একটা বাটিতে মুড়ি দিতে তাকে বাধ্য করে ছাড়ল। মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা হাজির ছিল তারা সবাই ধরে নিল পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে শহরের একটা মেয়ের ছেলেমানুষি কাজকারবার। তারা হাসি হাসি মুখে ব্যাপারটা দেখল যেন একটা নাটক দেখছে, কিন্তু তার কথাটাকে কেউ কোনো গুরুত্ব দিল বলে মনে হলো না।

গ্রাম ঘুরে দেখার জন্যে বের হয়ে রাশা প্রথম বাড়িটাতে এসেছিল শুধু জিতুকে নিয়ে, এখান থেকে যখন বের হলো তখন তার সাথে যোগ দিল মতি এবং আরো দুটি কমবয়সী বাচ্চা।

পরের বাড়িটাতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে সেখানে কিভাবে কিভাবে যেন খবর চলে গেছে যে সে আসছে, এবং সবাই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখানেও মোটামুটি একই ব্যাপার ঘটল, সবাই রাশাকে এমনভাবে ঘিরে ধরল যেন সে ভিনদেশি রাজকন্যা, ভুল করে একটা গ্রাম ঘরে চলে এসেছে। এ বাড়িতেও তাকে একটা জলচৌকিতে বসানো হলো এবং একটা থালায় করে তার জন্যে নারকেলের নাড়ু আর চিঁড়ে ভাজা আনা হলো। রাশা খাবে না, খাবে না বলে আপত্তি জানালেও তাকে একটা নাড়ু আর খানিকটা চিঁড়া খেতে হলো। সে এর মাঝে টের পেতে শুরু করেছে এখানে খাওয়া ব্যাপারটার সাথে খিদে কিংবা খাওয়ার ইচ্ছের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা সামাজিক ব্যাপার, সে যদি না খায় তাহলে সবাই মন খারাপ করে ফেলে।

রাশা এই গ্রামের মানুষদের আন্তরিক ভালোবাসাটুকু বুঝতে পারে, কিন্তু একই সাথে তাদের নিষ্ঠুরতাটুকু বুঝতে পারে না। যখন সে নারকেলের নাড়ুটাতে কামড় দিয়েছে, তখন একজন জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা তোমার মাকে ছেড়ে দিয়ে নাকি লন্ডন চলে গেছে?"

রাশা বিষম খেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "লন্ডন না, কানাডা।"

"সেইটা কোথায়?"

"আমেরিকার কাছে।"

"তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছে?"

রাশা মাথা নাড়ল।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, "তোমার মা?"

রাশা হতবাক হয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আবিষ্কার করল সে বলছে, "হ্যাঁ। করেছে।"

"তোমার সৎ বাপ কী করে?"

"আমি জানি না। আমি তাকে দেখি নাই।"

মহিলাটি আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল তখন ঠিক তার বয়সী একটা মেয়ে বাধা দিল, বলল, "মা, তুমি রাশাকে শান্তিমতো একটু খেতেও দিবা না? একটু খেতে বসেছে তখন হাজারটা প্রশ্ন।"

মহিলাটি তখন থতমত খেয়ে থেমে গেল। রাশা কৃতজ্ঞ চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল, শুকনো ছিপছিপে তার বয়সী একটা মেয়ে।

যখন সে বিদায় নিয়ে বের হচ্ছে তখন মেয়েটি তার সাথে সাথে বের হয়ে এলো। বাড়ির বাইরে এসে মেয়েটি তার হাত ধরে বলল, "তুমি কিছু মনে করো নাই তো?"

মেয়েটি কী নিয়ে কথা বলছে রাশা বুঝতে পারল, তারপরেও সে না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করল, "কী নিয়ে কিছু মনে করি নাই?"

"এই যে আমার মা-ফুপু তোমাকে তোমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করে।"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "না, কিছু মনে করি নাই।"

মেয়েটা মুখ শক্ত করে বলল, "কারো কোনো আক্কেল নাই। কখন কাকে কী জিজ্ঞেস করা যায় কেউ জানে না। এত বড় হয়েছে কিন্তু কারো বুদ্ধি হয় নাই। সবাই বাচ্চা মানুষের মতো।"

মেয়েটার রাগ রাগ কথাগুলো শুনে রাশা হেসে ফেলল, এই গ্রামে অন্তত একজন মানুষ আছে যার খানিকটা কাণ্ডজ্ঞান আছে। রাশা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"জয়নব।"

"তুমি কী পড়?"

"ক্লাস সেভেনে উঠেছি টেনে টুনে।"

রাশা বলল, "আমি এইটে। তুমি কোন স্কুলে পড়?"

"স্কুলটার নাম আহাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়।"

"কতদূর এখান থেকে?"

"অনেক দূর। তিন মাইলের কম না। এখন তবু যাওয়া যায়। বর্ষার পানি নামলে আর যাওয়া যায় না।"

"স্কুলটা কী রকম?"

জয়নব হাসার চেষ্টা করে বলল, "গ্রামের স্কুল যেরকম হয়। কোনো লেখাপড়া হয় না। ক্লাস হয় না। স্যারের কাছে প্রাইভেট না পড়লে স্যারেরা পরীক্ষায় নম্বর দেয় না।"

"ও।"

"কোনোমতে স্কুল যাই। কতদিন লেখাপড়া করতে পারব জানি না।"

"কেন?"

"এতদূরে স্কুল, বাবা-মা যেতে দিতে চায় না। বলে মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে কী করবে? বিয়ে করার পর তো রান্নাবান্না করেই জীবন কাটাতে হবে।"

প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে গিয়ে রাশা থেমে গেল। বলল, "ও।"

জয়নব রাশার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আমি তোমার সাথে আসি?"

রাশা খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ আসো।"

রাশা সেদিন পুরো গ্রামটা ঘুরে শেষ করতে পারল না, তবে যে কয়টা বাড়িতে গেল জয়নব তাকে সেখানে দুটো জিনিস থেকে রক্ষা করল। কেউ তাকে তার বাবা-মায়ের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারল না, কেউ তাকে কিছু জোর করে খাওয়াতেও পারল না।

সন্ধ্যাবেলা রাশা যখন নানি বাড়ি ফিরে এলো– সে আবিষ্কার করল, এই গ্রামে তার মন খুলে কথা বলার অন্তত একজন মানুষ হয়েছে। মানুষটি জয়নব।

রাশা পরের দিন গ্রামের অন্যান্য বাড়ি ঘুরে এলো। সাথে ছিল জয়নব, মাঝপথে জিতুও এসে যোগ দিল। গ্রাম ঘুরে ঘুরে রাশা কিছু মজার জিনিস জানতে পারল, যেমন প্রত্যেক গ্রামে একটা পাগল থাকে, যে পাগলকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় এবং যে ছাড়া পেলে তুলকালাম কাণ্ড করে ফেলে। এই গ্রামে সেরকম একজন পাগল আছে তার নাম নূরা পাগলা। তারা দূর থেকে নূরা পাগলাকে দেখল, দড়ি দিয়ে একটা খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। গায়ে নোংরা কাপড়, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, সে বিড়বিড় করে কথা বলছে, যখন রাশা আর জয়নবকে দেখল তখন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তাদেরকে একটু ভয় দেখাল।

প্রত্যেক গ্রামে একটা চোরও থাকে, এই গ্রামের চোরের নাম মাকিদ আলী কিন্তু সবাই তাকে ডাকে মাক্কু চোরা। গভীর রাতে সে নাকি সারা গায়ে তেল মেখে চুরি করতে বের হয়। নিজের গ্রামের জন্যে তার মায়া আছে তাই সে এখানে চুরি করে না। দূরে দূরে চুরি করতে যায়। তবে আশেপাশে দশ গ্রামে কোনো চুরি হলেই পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। সেটা তার জন্যে একটা যন্ত্রণা। মাক্কু চোরা দেখতে কেমন জিতুকে একটু জিজ্ঞেস করতেই জিতু তাদের নিয়ে মাক্কু চোরার বাড়িতে ঢুকে গেল। দাওয়ায় বসে খুবই শুকনো একটা মানুষ বিড়ি টানতে টানতে বাঁশের চাছ দিয়ে একটা খলুই বানাচ্ছে, সে-ই নাকি মাক্কু চোরা। তাদের দেখে মাক্কু চোরা সন্দেহের চোখে তাকাল, জিতু বলল, "মাক্কু চাচা, বিদেশি অতিথ আসছে তাই সবার বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।"

মাক্কু চোরা বলল, "ও।"

"এর বাবা লন্ডন থাকে।"

তথ্যে ভুল আছে কিন্তু রাশা শুদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করল না। মাক্কু চোরা বলল, "ও।"

"মাস্টারবাড়ির নাতনি।"

"ও।"

"নাম হচ্ছে রাশা। শহরে থাকে তো সে জন্যে নাম ইটিস মিটিস।"

মাক্কু চোরা বিড়িতে টান দিয়ে বলল, "ও।"

জিতু আলাপ চালিয়ে যাবার জন্যে এর পরে কী বলত কে জানে কিন্তু তখন বাড়ির ভেতর থেকে একেবারে পরীর মতো সুন্দর একটা বউ বের হয়ে এল, রাশা তার জীবনে এত সুন্দর একটা মেয়ে দেখেনি। জিতু বলল, "চাচি বিদেশি অতিথ নিয়ে আসছিলাম।"

পরীর মতো সুন্দর বউটা বলল, "অতিথকে গরিবের বাড়ি আনছ, বসতে দিব কোথায়?"

রাশা বলল, "না, না– বসতে হবে না। আমরা এখন যাই। অনেক জায়গায় যেতে হবে তো।"

রাশা জয়নব আর জিতুকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে যেতে একবার

পিছন ফিরে তাকাল, পরীর মতো সুন্দর বউটি ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রাশা নিশ্বাস আটকে রেখে ফিসফিস করে বলল, "ইশ! কী সুন্দর বউ!"

জয়নব বলল, "হ্যাঁ। খুব সুন্দর।"

"একজন চোর মানুষ কেমন করে এত সুন্দর একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে?"

"জানি না।"

"বউটা তার হাজবেন্ডকে চুরি করতে না করে না?"

জানি না। বউয়ের কথা কেউ কি কোনোদিন শোনে?"

সব গ্রামে যেরকম একটা পাগল আর একটা চোর থাকে ঠিক সেরকম কিছু অপদার্থ মানুষও থাকে। এই অপদার্থ মানুষগুলোর একজনের সাথে ওদের রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তার পরনে চোঙ্গা প্যান্ট, ক্যাট ক্যাটে লাল রঙের টি-শার্ট আর চোখে কালো চশমা। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। রাশা, জয়নব আর জিতুকে দেখে সে ঘুরে তাকাল, জিতু আর জয়নব তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন মানুষটা তাদের থামাল, জিজ্ঞেস করল, "কে জিতু নাকি? সাথে এইটা কে?"

"রাশাপু। মাস্টারবাড়ির নাতনি।"

"ও।"

"ঢাকা থেকে আসছে।"

"ঢাকা থেকে এই গেরামে আসছে? এই গাঁও-গেরামে মানুষ থাকে নাকি? ইলেকট্রিসিটি নাই। টেলিভিশন নাই।"

রাশা কোনো কথা বলল না। মানুষটা বলল, "আর এখানে থাকব না।"

জিতু জানতে চাইল, "কই যাবেন?"

"বিদেশ। পাসপোর্ট হয়ে গেছে।"

"কোনদিন যাবেন?"

"তারিখ ঠিক হয় নাই। দুবাই চলে যাব। বিশাল জায়গা। টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি, খালি ধরব আর পকেটে ভরব।" মানুষটা কেমন করে টাকা ধরে পকেটে ভরবে সেটা অভিনয় করে দেখাল।

জয়নব বলল, "আমরা যাই।"

তারপর রাশার হাত ধরে টেনে হাঁটতে থাকে। মানুষটা পিছন থেকে বলল, "বাবারে সালাম দিও। নতুন ওসি সাহেবকে নিয়ে একদিন তোমাদের বাড়িতে আসব।"

রাশা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে মানুষটা?"

"ফালতু মজিদ। এই গ্রামে দুইজন মজিদ, একজনের বাজারে একটা দোকান আছে। সে হচ্ছে আসল মজিদ। আর এ হচ্ছে ফালতু মজিদ। কোনো কামকাজ করে না, খালি বড় বড় কথা বলে!"

রাশা মুখ টিপে হাসল, বলল, "লোকটার পোশাক দেখছ? একেবারে জোকার!"

"হ্যাঁ। সবসময় পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াচ্ছে।"

গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে তিনজন হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ জয়নব থেমে গেল। রাশা দেখল একটা পুকুরের পাশে একটা বড় গাছ, সেই গাছে হেলান দিয়ে একজন বয়স্ক মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে। মানুষটা নিশ্চয়ই চোখে ভালো দেখতে পায় না। তাই বইটা চোখের খুব কাছে নিয়ে ধরেছে। তিনজন কথা বলতে বলতে আসছে সেটা শুনেও মানুষটা মুখ তুলে তাকাল না। জয়নব আর জিতু তখন কাছাকাছি গিয়ে বলল, "স্লামালেকুম চাচাজি।"

মানুষটা মুখ তুলে তাকাল, মাথায় পাকা চুল, চোখে চশমা, বলল, "ওয়ালাইকুম সালাম জয়নব বেটি। ওয়ালাইকুম সালাম জিতু মিয়া। তোমাদের সাথে এই মেয়েটি কে?"

জয়নব বলল, "মাস্টারবাড়ির নাতনি।"

জিতু যোগ করল, "রাশাপু।"

মানুষটা তখন সোজা হয়ে বসে, বইয়ের পৃষ্ঠা ভাঁজ করে রাখল, বলল, "তুমি আজিজ মাস্টারের নাতনি? একটু কাছে আসো, তোমাকে ভালো করে দেখি।"

রাশা একটু এগিয়ে যায়, মানুষটা তার হাত ধরে সামনে বসিয়ে তাকে ভালো করে দেখল, তার মুখ কেমন একটা নরম হাসিতে ভরে যায়, তোমার চেহারায় আজিজ ভাই সাহেবের ছাড় আছে।

রাশা ঠিক কী করবে বুঝতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, আপনি আমার নাকে চিনতেন?

মানুষটি একটা হাসল, বলল, চিনতাম বললে কম বলা হবে। তোমার নানা আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন! বুঝেছ? দুইজন মানুষের সাথে পৃথিবীর সবচেয়ে খাঁটি বন্ধুত্ব হয় কখন জানো? যখন দুইজন পাশাপাশি যুদ্ধ করে। তোমার নানা আর আমি একসাথে যুদ্ধ করেছি। তোমার নানা চিল আমাদের কামন্ডার।

মানুষটি পুকুরের পানির দিকে তাকিয়ে তার চশমা খুলে শার্টের কোনা দিয়ে মুছে বলল, তোমার নানা ধরা পড়ার পর যখন তাকে ধরে নিয়ে গেল, বুঝলে মেয়ে, আমাদের মনে হলে আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। ইস!

রাশা একটু বিস্ময় নিয়ে এই বয়স্ক মানুটির দিকে তাকিয়ে রাইল, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল সে আসলে তার নানা কেমন মানুষ ছিলেন, কিভাবে মারা গিয়েছিলেন সে তার কিছুই জানে না।

মানুষটি একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বললত, আজিজ ভাই সাহেবকে আমি না করেছিলাম। বলেছিলাম এখন যাবেন না। তোমার মায়ের মাত্র জন্ম হয়েছে, দেখার জন্যে পাগল হয়ে গেল। এসে ধরা পড়ল। ভাবীর ওপর সেটা যে কী একটা ধাক্কা- আহারে! মানুষটা রাতারাতি অ্যাবনরমাল হয়ে গেল।

রাশা কিছুই জানে না, তার খুব জানার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে একটাও প্রশ্ন করল না। চুপ করে মানুষটার সামনে বসে রইল। মানুষটা বলল, সেই দেশের জন্যে তোমর নানা জান দিয়েছিল সেই দেখটাও বেঁচে আছি, চিন্তা করলে মাঝে মাঝে খুব অপরাধী লাগে।

রাশা বলল, "অপরাধী লাগবে কেন?"

"লাগার কথা না। কিন্তু অপরাধী লাগে। কী করব?" মানুষটা গলার স্বর পাল্টে বলল, "যাও মা। কোথায় যাচ্ছিলে যাও। বুড়ো মানুষ তো– তোমাদের বয়সী মানুষ দেখলেই কথা বলতে ইচ্ছা করে। আর তুমি হচ্ছ–"

"রাশা।"

"হ্যাঁ। রাশা। তুমি হচ্ছ আজিজ ভাই সাহেবের নাতনি। তার মানে তুমি আমারও নাতনি। আমি হচ্ছি তোমার সালাম নানা।'

"সালাম নানা?"

"হ্যাঁ। আজিজ নানার বন্ধু সালাম নানা।" মানুষটি রাশার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমি বুড়ো মানুষ নানা ডাকা ঠিক আছে। আজিজ ভাইয়ের সাথে কিন্তু নানা কথাটা যায় না। যখন শহীদ হয়েছে তখন তার বয়স তেইশ না হয় চব্বিশ। হাট্টাকাট্টা জোয়ান। কী সুন্দর রাজপুত্রের মতো চেহারা। কুচকুচে কালো চুল, যুদ্ধের সময় দাড়ি কাটতে পারে নাই বলে চে গুয়েভারার মতো দাড়ি। সে তো আমার মতো বুড়ো হয় নাই। তাকে কিন্তু তুমি নানা ডাকবে না।"

"তাহলে কী ডাকব?"

"ভাই ডাকবে। আজিজ ভাই।"

মানুষটি গাছে হেলান দিয়ে ভারী চশমার ভেতর দিয়ে রাশার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন।

সালাম নানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় রাশা লক্ষ করল, গাছে দুটি ক্রাচ হেলান দিয়ে রাখা আছে। কাঠের ক্রাচ, অনেক ব্যবহারে মসৃণ হয়ে আছে। তার মানে সালাম নানার পা নেই।

জয়নব বলল, "সালাম চাচা, আমাদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের সময় পায়ে গুলি খেয়েছিলেন, তাই পা কেটে ফেলেছে। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন।"

রাশা বলল, "ও।"

"আমাদের গ্রামে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা। একজন তোমার নানা–"

"আমার ভাই।"

জয়নব হাসল, বলল, "হ্যাঁ, তোমার ভাই, শহীদ। আরেকজন আমাদের সালাম চাচা।"

"এই গ্রামে কোনো রাজাকার নাই?"

"না। কোনো রাজাকার নাই। পাশের গ্রামে আছে।"

"কী নাম?"

"আহাদ আলী।"

রাশা নামটা যেন কোথায় শুনেছে কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না।

ভাঙাচোরা স্কুল

জয়নব বলল, "ঐ যে আমাদের স্কুল।"

রাশা তাকিয়ে দেখল তারা যে মেঠোপথ দিয়ে হেঁটে আসছে তার শেষ মাথায় একটা বড় ঝাঁকড়া গাছ, গাছের নিচে কিছু টিনের ঘর। সামনে একটা খোলা মাঠ, সেখানে কিছু ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করে খেলছে।

আজ সকালে রাশা তার গ্রামের ছেলেমেয়েদের সাথে হেঁটে হেঁটে তাদের স্কুলটা দেখতে এসেছে। সে যদি লেখাপড়া করতে চায় তাহলে এখানেই পড়তে হবে। স্কুলটা অনেক দূরে, কমপক্ষে তিন মাইল, হেঁটে আসতে আসতে একঘণ্টা লেগে গেছে।

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে স্কুলের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল, বড় বড় করে স্কুলের নাম লেখা, আহাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়। রাশা জয়নবের দিকে তাকিয়ে বলল, "আহাদ আলী কে?"

"পাশের গ্রামের একজন মাতবর। অনেক টাকা।"

"তুমি বলেছিলে পাশের গ্রামে একজন রাজাকারও ছিল, নাম আহাদ আলী।"

"একই মানুষ।"

"একই মানুষ?" রাশা চমকে উঠল, "একটা রাজাকারের নামে স্কুল?"

জয়নব মুখ কালো করে মাথা নাড়ল। বলল, "এখন সবাই মনে হয় ভুলেই গেছে ব্যাটা রাজাকার ছিল। স্কুল তৈরি করেছে, মাদ্রাসা তৈরি করেছে। অনেক টাকা।"

"কী করে?"

"জানি না। যুদ্ধের সময় হিন্দুদের জমি দখল করেছিল। তখন থেকে বড়লোক।"

রাশা হতভম্ব হয়ে স্কুলের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। তার নানা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, আর সে রাজাকারের নামে দেয়া একটা স্কুলে পড়বে? ছিঃ!

জয়নব তার ক্লাসে বই-খাতা রাখতে গেল। রাশা তখন তার ক্লাসঘরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে। একটা ক্লাসঘর যে এত খারাপ হতে পারে সে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না। সস্তা কাঠ দিয়ে তৈরি বেঞ্চ, দেখে মনে হয় ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে কোনোভাবে দাঁড় করে রাখা হয়েছে। দেয়াল থেকে ইঁট বের হয়ে আছে, সামনে রং ওঠা একটা বিবর্ণ ব্ল্যাকবোর্ড। ক্লাসের মেঝে একসময় পাকা করা হয়েছিল, এখন জায়গায় জায়গায় গর্ত। ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, ধুলাবালিতে পুরো মেঝেটা নোংরা হয়ে আছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসছে, গ্রামের ছেলেমেয়ে– বেশিরভাগেরই পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। স্কুলের পোশাক নেই, তাই যার যেটা ইচ্ছে সেটা পরে এসেছে, দেখে স্কুল বলেই মনে হয় না। ছেলেমেয়েগুলোর শুকনো চেহারা দেখেই বোঝা যায় গরিব ঘর থেকে এসেছে।

জয়নব তার বই-খাতা রেখে রাশাকে তাদের হেডমাস্টারের রুমে নিয়ে গেল। এক কোনায় ছোট একটা রুমে একজন বয়স্ক মানুষ একটা খাতার উপর ঝুঁকে কিছু একটা দেখছিলেন, জয়নব বলল, এই মানুষটাই নাকি হেডমাস্টার। রাশা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "আসতে পারি স্যার?"

হেডমাস্টার খাতা থেকে চোখ না তুলে বললেন, "কে?"

রাশা কী বলবে বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, "আমি স্যার একটা জিনিস নিয়ে একটু কথা বলতে এসেছি।"

এবারে হেডমাস্টার মুখ তুলে তাকালেন, রাশাকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, "আসো। কী বিষয়?"

"আমি স্যার একটু খোঁজ নিতে এসেছিলাম। আপনাদের স্কুলে ভর্তি হতে হলে কী করতে হয় সেটা জানতে চাচ্ছিলাম।"

হেডমাস্টার একটু অবাক হয়ে রাশার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার জীবনে কখনোই হয়নি যে একটা ছাত্র বা ছাত্রী নিজে নিজে স্কুলে এসে ভর্তি

হতে চেয়েছে। সবসময়েই বড় একজন মানুষ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে নিয়ে এসেছে। হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবা-মা কই?"

"দেশের বাইরে।"

"দেশের বাইরে কোনখানে?"

রাশা ভেতরে ভেতরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এখন তাকে তার পুরো ইতিহাসটা বলতে হবে। বলতেই যখন হবে তখন আর ইতিউতি করে লাভ নেই, সোজাসুজি বলে ফেলাই ভালো। রাশা তাই সোজাসুজি বলে ফেলল, "আমার বাবা কানাডায় আছেন। মা আছেন অস্ট্রেলিয়ায়। আমাকে এখানে গ্রামে নানির কাছে রেখে গেছেন। এখন এখানেই থাকতে হবে সে জন্যে ভর্তি হতে এসেছি।"

হেডমাস্টার কিছুক্ষণ রাশার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, "তোমার নানি ছাড়া আর কোনো গার্জিয়ান নাই?"

"না।"

"কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাও?"

"ক্লাস এইট।"

এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সেরকম চাপ নেই, তারপরেও হেডমাস্টার সাহেব একটু ভাব দেখালেন, বললেন, "স্কুলে সিটের খুব সমস্যা। বছরের মাঝখানে ভর্তি করলে অনেক ঝামেলা হয়।"

রাশা বলল, "জানি স্যার, কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না।"

"দেখি কী করা যায়। কিন্তু স্কুলের খরচপাতি আছে, ভর্তি ফি আছে, মাসে মাসে বেতন আছে। টাকা কে দেবে?"

"আমি দেব স্যার। কত টাকা লাগবে বললে আমি নিয়ে আসব।"

হেডমাস্টারের চোখে এবারে হালকা একটা লোভের ছাপ পড়ল। নিচু গলায় বললেন, "আগের মাসের বেতন। ভর্তি ফি। স্পেশাল ফি। কন্টিজেনসি সব মিলিয়ে তিন-চার হাজার পড়বে–"

রাশা ভয়ে ভয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

এরকম সময় আরেকজন মানুষ হেডমাস্টারের রুমে এসে ঢুকল, গালে হালকা দাড়ি, শক্ত-সমর্থ শরীর, বয়স খুব বেশি নয়। হেডমাস্টার বললেন, "রাজ্জাক, ভালোই হয়েছে তুমি আসছ। এই মেয়েটা ক্লাস এইটে ভর্তি হতে চাচ্ছে।"

রাজ্জাক নামের মানুষটা একবার চারিদিকে তাকাল, "কার সাথে আসছে?"

"নিজেই আসছে। পারিবারিক সমস্যা আছে।"

রাজ্জাক নামের মাস্টারটা এবারে রাশাকে ভালো করে দেখল আর রাশা সাথে সাথে বুঝে গেল মানুষটা তাকে অপছন্দ করে ফেলেছে। মানুষটা হেডমাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কী বলেছেন?"

"বলেছি ভর্তির টাকা-পয়সা নিয়ে এসে ভর্তি হতে।"

রাজ্জাক নামের মাস্টারটা মাথা নাড়ল, "না স্যার। এইভাবে ভর্তি করা যাবে না।"

হেডমাস্টার দুর্বল গলায় বললেন, "সিট আছে, সমস্যা কোথায়?"

"সমস্যা অন্য জায়গায়।"

"কোন জায়গায়?"

"বাবা-মা ছাড়া একা একা একটা মেয়ে চলে আসছে, আপনি তার আগে-পিছে কিছু জানেন? হয়তো বাড়ি থেকে পালিয়েছে। আপনি ভর্তি করে পুলিশ কেসে পড়বেন। আজকালকার ছেলেমেয়ে কী ডেঞ্জারাস আপনি জানেন?"

রাশা হতবাক হয়ে মানুষটার কথা শুনতে লাগল! কী বলবে বুঝতে পারল না।

রাজ্জাক নামের মানুষটা বলল, "দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে। শহরের সব ছেলেমেয়ে এখন ড্রাগের ওপরে আছে। আপনি না জেনেশুনে ভর্তি করবেন, দেখবেন পরের দিন এই গ্রামের স্কুলের অর্ধেক ছেলেমেয়ে ড্রাগ অ্যাডিক্ট! দিনকাল খুব খারাপ স্যার।"

রাশা বলার চেষ্টা করল, "আমি মোটেও ড্রাগ অ্যাডিক্ট না।"

রাজ্জাক নামের মানুষটা রাশার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আর হেড স্যার কথা বলছি, তুমি তার মাঝে কথা বলার চেষ্টা করছ কেন?"

"আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তো তাই–"

রাজ্জাক নামের মানুষটা চোখ পাকিয়ে একবার রাশার দিকে তাকাল তারপর হেড স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছেন কেমন বেয়াদপ? মুখে মুখে কথা বলে! এই রকম মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করবেন? আপনার স্কুলের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে।"

না স্যার। এইভাবে ভর্তি করা যাবে না।

হেডমাস্টার বললেন, "যাই হোক, স্কুলে যখন সিট আছে ভর্তি করে নিই। এখন কোন নিয়মে ভর্তি করবে বলো।"

"আগের স্কুল থেকে টিসি, পরীক্ষার রেজাল্ট, হেডমাস্টারের টেস্টিমনিয়াল আর ফটো আই. ডি. ছাড়া ভর্তি করা ঠিক হবে না। আপনি পরে বিপদে পড়ে যাবেন স্যার।"

"এই মেয়ের বাবা-মা থাকে দেশের বাইরে। কোনো গার্জিয়ান নাই, বুড়ি নানির সাথে থাকে। সে কোথা থেকে এই সব কাগজপত্র আনবে?"

"সেইটা তো আমাদের চিন্তা না স্যার। সেইটা এই মেয়ের চিন্তা। কাগজপত্র আনবে ভর্তি হবে। কাগজপত্র নাই, ভর্তি নাই।"

হেডমাস্টার রাশার দিকে তাকালেন, দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "শুনেছ তো? তুমি তোমার আগের স্কুল থেকে টিসি, পরীক্ষার মার্কশিট, টেস্টিমনিয়াল আর ফটো আই. ডি. না আনলে ভর্তি করা যাবে না।"

রাশা মুখ কাঁচুমাচু করে কিছু একটা অনুরোধ করতে যাচ্ছিল কিন্তু রাজ্জাক নামের মানুষটার সামনে তার সেটা করার ইচ্ছে করল না। নিচু গলায় বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

বাইরে উদ্বিগ্ন মুখে জয়নব দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞেস করল, "হয়েছে?"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "না, হয় নাই?"

"কেন?"

"হেডমাস্টার রাজি ছিলেন। কিন্তু রাজ্জাক নামে একজন স্যার এসে সব গোলমাল করে দিলেন। অনেক রকম কাগজপত্রের কথা বললেন।"

"আছে কাগজপত্র?"

"কোথা থেকে থাকবে?"

"তাহলে?"

রাশা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দেখি। আমার আগের স্কুলের ম্যাডামের সাথে কথা বলতে হবে।"

"কিভাবে বলবে?"

"চিঠি লিখতে হবে মনে হয়।"

"ফোন নাম্বার নাই?"

"আছে।" রাশাকে জাহানারা ম্যাডাম তার ফোন নাম্বারটা দিয়ে বলেছিলেন দরকার হলে ফোন করতে। নাম্বারটা তার মুখস্থ আছে। অনেকবার সে ভেবেছে ফোন করবে কিন্তু কেন যেন করা হয়নি।

জয়নব বলল, "তাহলে এখনই ফোন করো।"

"কোথা থেকে করব?"

"বাজারে ফোন-ফ্যাক্সের দোকান আছে। চলো তোমাকে নিয়ে যাই।"

"এক্ষুণি তোমার স্কুল শুরু হবে না?"

"হোক, একদিন ক্লাস না করলে কিছু হবে না।"

জয়নব যখন রাশাকে নিয়ে রওনা দিয়েছে তখন জিতুও তাদের-সাথে তার ক্লাস থেকে বের হয়ে এলো। তার ক্লাস করতে ভালোই লাগে না– যে কোনো সুযোগে সে স্কুল থেকে বের হয়ে আসে।

জাহানারা ম্যাডামের ফোনে ডায়াল করে রাশা শুনতে পেল অন্যপাশে ফোন রিং হচ্ছে, খুট করে একটা শব্দ হলো, তারপর জাহানারা ম্যাডামের গলার স্বর শুনতে পেল, "হ্যালো।"

রাশা বলল, "ম্যাডাম, আমি রাশা।"

অন্যপাশে জাহানারা ম্যাডাম হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের জন্যে চুপ করে গেলেন, তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রাশা, তুমি কোথায়?"

"আমি আমার নানি বাড়িতে।"

"তোমার নানি বাড়ি কোথায়?"

"আপনি চিনবেন না ম্যাডাম– একটা গভীর গ্রামে।"

"কেন গিয়েছ? কত দিন থাকবে?"

"আমার মা আমাকে এখানে রেখে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন।"

অন্যপাশে জাহানারা ম্যাডাম অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "তুমি আমাকে কিছু বললে না রাশা?"

রাশা চোখের পানি আটকে বলল, "বলে কী হবে ম্যাডাম। যার মা তার মেয়েকে এভাবে ফেলে রাখে তাকে অন্যেরা কী করবে?"

জাহানারা ম্যাডাম বললেন, "এখন কেমন আছ? কী করছ?"

"ভালোই আছি। একটা স্কুলে ভর্তি হব তাই কাগজপত্র লাগবে সেই জন্যে ফোন করেছি।"

"কী কাগজপত্র?"

"টিসি, টেস্টিমনিয়াল, মার্কশিট আর ফটো আই. ডি.। ফটো আই. ডি. আমার কাছে আছে। অন্যগুলি লাগবে।"

"ঠিক আছে। আশেপাশে ফ্যাক্স-এর দোকান আছে?"

"আমি একটা ফোন-ফ্যাক্স-এর দোকান থেকেই ফোন করছি।"

"গুড। তুমি ফ্যাক্স নাম্বারটা দাও। আমি আধাঘণ্টার ভিতরে সবকিছু এখানে ফ্যাক্স করে পাঠাব। দুই কপি অরিজিনাল তৈরি করে এক কপি কুরিয়ার করব তোমার স্কুলে, আরেক কপি পাঠাব তোমার নানি বাড়িতে।"

"ঠিক আছে ম্যাডাম।"

"দাও, ফ্যাক্স নাম্বার দাও। ঠিকানাগুলি দাও।"

"দিচ্ছি ম্যাডাম। থ্যাংকু ম্যাডাম।"

"রাশা শোনো।"

"বলেন ম্যাডাম।"

"তুমি আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে। বুঝেছ?"

"রাখব ম্যাডাম। আমার জন্যে দোয়া করবেন ম্যাডাম।"

জাহানারা ম্যাডাম কোনো কথা বললেন না।

আধা ঘণ্টা পরে আহাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার অবাক হয়ে দেখলেন তার স্কুলে ভর্তি হতে চাইছে মেয়েটি হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে চলে এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"আপনি যে কাগজ চেয়েছিলেন। আমার স্কুল থেকে ফ্যাক্স করে দিয়েছে। অরিজিনালগুলো কুরিয়ার করেছে, কাল-পরশু পৌঁছে যাবে।"

হেডমাস্টার কাগজগুলো দেখে জানতে পারলেন এই মেয়েটি অত্যন্ত মেধাবী একটি ছাত্রী। গণিত অলিম্পিয়াডে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। খুব ভালো ডিবেট এবং আবৃত্তি করতে পারে। পারিবারিক একটা সমস্যার কারণে এই স্কুল থেকে টিসি নিচ্ছে এবং তাকে সবরকম সাহায্য করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস আলাদা একটা চিঠি দিয়ে লিখেছেন এই মেয়ে সম্পর্কে অন্য যে কোনো তথ্যের দরকার হলে যেন

তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। হেডমিস্ট্রেস লিখেছেন মেয়েটি সোনার টুকরো মেয়ে। বিখ্যাত একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, হেডমাস্টার তার নাম শুনেছেন, সবাই তাকে চিনে।

হেডমাস্টার নিজেই এবার উঠে দাঁড়ালেন, রাশার কাগজপত্র আর রাশাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। একটা কেরানি অনেকগুলো ফাইলের মাঝখানে বসে পান চিবুচ্ছে, হেডমাস্টারকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হেডমাস্টার ফ্যাক্সে আসা কাগজগুলো তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "হরিপদ, তুমি এই মেয়েটাকে ক্লাস এইটে ভর্তি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

"ভর্তির ফি?"

"পরে দিবে। কাল-পরশু নিয়ে আসবে। শুধু যেটা দরকার সেটা দিবে, এক পয়সাও যেন বাড়তি চার্জ না হয়।"

ঠিক এরকম সময় রাজ্জাক মাস্টার সেখানে হাজির হলো। সে কেরানির হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে বলল। "স্যার, এইগুলি তো ফ্যাক্স। ফ্যাক্স এর কোনো ভ্যালু নাই। অরিজিনাল কাগজ ছাড়া তো ভর্তি করা যাবে না। তাছাড়া ভর্তি ফিয়ের একটা ব্যাপার আছে না।"

হেডমাস্টার এই প্রথমবার কঠিন হলেন, মুখ শক্ত করে বললেন, "রাজ্জাক সাহেব আমি কুড়ি বছর থেকে হেডমাস্টারি করি। কোথায় অরিজিনাল কাগজ লাগে আর কোথায় ফ্যাক্স দিয়ে কাজ চলে যায় আমি সেটা জানি। আর এই মেয়ে যদি ভর্তি ফি না দেয় আমি সেটা দিব। বুঝেছেন?"

রাশা দেখল রাজ্জাক মাস্টারের মুখটা অপমানে কালো হয়ে গেল। রাশা ইতস্তত করে বলল, "আমি ভর্তি ফি দিব, আমি কালকেই ফি নিয়ে আসব।"

হেডমাস্টার বললেন, "আমি জানি মা তুমি আনবে। তুমি কাল থেকে ক্লাস শুরু করো। আমাদের গ্রামের স্কুলের অবস্থা খারাপ। স্কুল ভাঙাচোরা মাস্টাররাও ভাঙাচোরা। লেখাপড়া ভালো হয় না, তোমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু লেখাপড়া নিজের ওপর। বিদ্যাসাগর ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসে পড়তেন। বুঝেছ?"

"জি স্যার বুঝেছি।"

রাশা চলে না গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আর কিছু বলবে?"

"জি স্যার।"

"বলো।"

"আসলে আমরা বেশ কয়েকজন মিলে একসাথে অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছি, আবার একসাথে হেঁটে হেঁটে ফিরে যাব। আমাকে তো অপেক্ষাই করতে হবে। আমি কি আজকেই ক্লাসে বসতে পারি?"

"পারবে না কেন? অবশ্যই পারবে। আসো আমার সাথে।"

রাশা হেড স্যারের পিছু পিছু যেতে থাকে। স্কুল শুরু হয়ে গেছে, কোনো একটা ক্লাসে কোনো একজন স্যার কোনো একজন ছাত্রকে বেত দিয়ে শপাং শপাং করে মারছেন, তার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এটা মনে হয় এখানকার খুব সাধারণ ঘটনা, কারণ হেডমাস্টার সেটা শুনছেন বলেই মনে হলো না।

কোনার দিকে একটা ক্লাসঘরের সামনে গিয়ে হেডমাস্টার দাঁড়ালেন। ভেতরের ছেলেমেয়েরা হেডমাস্টারকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে গেল, মাথায় টাক কালোমতন একজন বোর্ডে কী যেন লিখছিলেন তিনিও বোর্ডে লেখা বন্ধ করে হেডমাস্টারের দিকে তাকালেন। হেডমাস্টার রাশাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের বসতে বললেন। তারপর কালোমতন মাথায় টাক স্যারকে বললেন, "মাজাহার সাহেব, এই মেয়েটা ক্লাস এইটে ভর্তি হবে। হরিপদ কাগজপত্র ঠিক করছে, আজ থেকেই ক্লাস করতে শুরু করুক।"

"ঠিক আছে স্যার।"

হেডস্যার ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের ক্লাসে নতুন এসেছে। সে খুব ভালো ছাত্রী। তোমরা সবাই তাকে সাহায্য করো। ঠিক আছে?"

ছাত্রছাত্রীরা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। হেডস্যার চলে যাবার পর মাথায় টাক কালোমতন স্যার সরু চোখে রাশার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "নাম কী?"

"আমাকে সবাই রাশা নামে ডাকে।"

"রাশা?"

"জি স্যার।"

"রাশা তো মানুষের নাম না, রাশা তো দেশের নাম। রাশিয়াকে ইংরেজিতে বলে রাশা!"

ক্লাসের কয়েকজন ছেলেমেয়ে একটু হেসে উঠে আবার থেমে যায়, রাশা কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

স্যার বললেন, "রাশা না হয়ে তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল রাইসা। রাইসা নামের একটা অর্থ আছে। রাশার কোনো অর্থ নাই।"

রাশা এবারেও কোনো কথা বলল না, এরকম সময়ে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো।

স্যার বললেন, "যাও। বসো।"

সামনের বেঞ্চের একটা মেয়ে সরে গিয়ে একটু জায়গা করে দিল, রাশা সেখানে গিয়ে বসল। স্যার আবার চক নিয়ে বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। রাশা দেখল স্যার বোর্ডে একটা অঙ্ক করে দিচ্ছেন। মুখে একটি কথা না বলে স্যার পুরো অঙ্কটা করে দিলেন, ছেলেমেয়েরা সেটা তাদের খাতায় টুকে নিল।

অঙ্কটা শেষ করার পর স্যার ক্লাসের দিকে তাকালেন, "সবাই লিখেছিস?"

"জি স্যার।"

স্যার এইবার বোর্ডটা মুছে নূতন একটা অঙ্ক লিখতে শুরু করলেন। রাশা লক্ষ করল, স্যার কিন্তু অঙ্কটা করছেন না, হাতে একটা নোট বই, সেই নোট বই দেখে দেখে অঙ্কটা বোর্ডে তুলছেন। কী আশ্চর্য!

পুরো ক্লাসটা এভাবে কেটে গেল। স্যার একটা একটা অঙ্ক বোর্ডে লিখে দিলেন ছেলেমেয়েরা সেটা তাদের খাতায় টুকে নিচ্ছে! এই তাহলে গণিতের ক্লাস!

এরকম সময় ঘণ্টা পড়ল এবং স্যার তার নোট বই, রেজিস্টার খাতা নিয়ে বের হয়ে গেলেন। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করে। তার বেঞ্চে বসে থাকা মেয়েরা আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু ঠিক কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। রাশা নিজেই কথা শুরু করল, তার পাশে যে মেয়েটা বসে ছিল সে পরীর মতো সুন্দরী। রাশা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?

"সানজিদা ।"

"আমার আগের স্কুলে আমার প্রাণের বন্ধুর নাম ছিল সানজিদা ।"

মেয়েটা কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইল । রাশা বলল, "আচ্ছা তোমার কী মনে হয়, আসলেই কী রাশা কারো নাম হতে পারে না?"

সানজিদা নামের মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "পারে । না হলে তোমার নাম হলো কেমন করে?"

"আমি তোমাকে একটা কথা বলি?"

সানজিদা মাথা নাড়ল, বলল, "বলো ।"

"আগে বলো কাউকে বলবে না ।"

"বলব না ।"

"খোদার কসম?"

সানজিদা একটু অবাক হয়ে বলল, "খোদার কসম ।"

আশেপাশের আরো কয়েকজন এবারে রাশার কাছে এগিয়ে এলো । কাউকে বলা যাবে না সেই গোপন কথাটা শোনার সবারই খুব আগ্রহ । রাশা গলা নামিয়ে বলল, "আসলে আমার নাম ছিল রাইসা । নামটা আমি দুই চোখে দেখতে পারতাম না । সেই জন্যে এটাকে বদলে রাশা করে ফেলেছি ।"

মেয়েগুলো একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল, নাম পছন্দ না হলে যে সেটা বদলে দেয়া যেতে পারে সেটা কোনোদিন তাদের মাথাতেই আসেনি ।

শ্যামলা রঙের একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "যদি এখন এই নামটা তোমার পছন্দ না হয় তাহলে এইটাও বদলে ফেলবে?"

রাশা হাসল, বলল, "না আর বদলাব না ।"

শ্যামলা রঙের মেয়েটা বলল, "রাইসা নামটা তো ভালোই ছিল, এটা বদলালে কেন?"

"তার একটা কারণ আছে ।"

"কী কারণ?"

"আমাদের ক্লাসে একটা পাজি ছেলে ছিল সে আমার নাম নিয়ে একটা কবিতা তৈরি করেছিল।"

"কী কবিতা?"

"আগে বলো সেই কবিতা নিয়ে আমাকে খেপাবে না?"

"খেপাব না।"

"খোদার কসম?"

"খোদার কসম।"

"কবিতাটা ছিল এই রকম :

রাইসা
মাছের কাঁটা খায় বাইছা বাইছা–"

মেয়েগুলো এবারে শব্দ করে হেসে ফেলল, তখন অনেকগুলো ছেলে এবারে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কী নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে। রাশা জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের ক্লাসে এই রকম পাজি ছেলে নাই?"

মেয়েগুলো নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, একজন বলল, "জানি না।"

"জানো না? জানো না কেন?"

"আমরা ছেলেদের সাথে কথা বলি না। ছেলেরা ছেলেদের সাথে থাকে। মেয়েরা মেয়েদের সাথে থাকে।"

রাশা অবাক হয়ে বলল, "কোনোদিন কথা বলো নাই?"

"নাহ্।"

"কেন?"

মেয়েরা কোনো কথা বলল না, ক্লাসের কেউ জানে না কেন ছেলেরা আর মেয়েরা একে-অন্যের সঙ্গে কথা বলে না। এভাবেই চলে আসছে।

এরকম সময় ছেলেদের অংশে একটু হট্টগোল শোনা গেল। দেখা গেল সবাই মিলে একটা ছেলেকে তুলে তাকে সামনের দিকে ঠিলে দিচ্ছে। ছেলেটা সামনে আসতে চাইছে না কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। রাশা মেয়েদের জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"এই ছেলেটা সুন্দর গান গাইতে পারে। মনে হয় তাকে গান গাইতে বলছে।"

"গান গাইবে? এখন ক্লাস হবে না?"

"নাহ্। ইংরেজি স্যার বহুদিন থেকে আসে না।"

"কেন?"

"জানি না। স্যার নাকি লন্ডন চলে গেছে।"

রাশা অবাক হয়ে বলল, "লন্ডন চলে গেছে? তাহলে অন্যেরা ক্লাস নিবে না?"

"অন্য কেউ কি আছে নাকি! কোনো স্যারটার নাই।"

গায়ক ছেলেটি আবার তার সিটে গিয়ে বসে যাচ্ছিল, তখন রাশা গলা উঁচিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, "প্লিজ, তুমি গান শোনাও আমাদের।"

পুরো ক্লাস হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল, একটা মেয়ে একটা ছেলের সাথে কথা বলছে সেটা আগে কখনো এই ক্লাসে ঘটেনি। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না, তারপর একজন বলল, "হ্যাঁ। গাজী, তুই গান শোনা আমাদের।"

অন্যেরাও তখন বলতে থাকে, "হ্যাঁ। শোনা, শোনা।"

ক্লাসে একটা হট্টগোল শুরু হয়ে যাচ্ছিল, তখন একজন বলল, "আস্তে! চেঁচামেচি করবি না তাহলে রাজ্জাক স্যার বেত নিয়ে চলে আসবে।"

হট্টগোলটা একটু কমে এলো তখন গাজী নামের গায়ক ছেলেটা লাজুক মুখে সামনে এগিয়ে এলো। তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি একটু নার্ভাস। সামনে দাঁড়িয়ে সে চোখ বন্ধ করে গান গাইতে শুরু করে। সাথে সাথে পুরো ক্লাস নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কী সুন্দর গলা, কী সুন্দর তাল-লয়ের ওপর দখল, রাশা একেবারে হতবাক হয়ে গেল। ছেলেটা চোখ বন্ধ করে গাইছে,

"সময় গেলে সাধন হবে না
দিন থাকতে দিনের সাধন কেন করলে না–"

দেখে মনে হয় সত্যিই বুঝি এই বাচ্চা ছেলেটার কিছু একটা সাধনা করার কথা ছিল, সে সময় থাকতে সেটা করতে পারেনি, তাই তার বুকটা বুঝি ভেঙে যাচ্ছে দুঃখে!

গান শেষ হবার পর সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। রাশা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "তুমি কি সুন্দর গান গাইতে পারো!"

এর আগে এই ক্লাসে কোনো মেয়ে কোনো ছেলের সাথে কথা বলেনি। যদি কেউ বলে ফেলে তখন কিভাবে তার উত্তর দিতে হয় সেটাও কেউ জানে না। গায়ক ছেলেটা তাই কথা না বলে চুপ করে রইল। রাশা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কারো কাছে গান শেখো?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"তাহলে এত সুন্দর গান কেমন করে শিখেছ?"

"নিজে নিজে।"

"নিজে নিজে! কিভাবে?"

"ঐ তো সুবলের চায়ের দোকানে ক্যাসেট বাজে সেইটা শুনে শুনে শিখেছি।"

"কী আশ্চর্য! তুমি ক্যাসেট শুনে শুনে এত সুন্দর গান গাইতে পারো। তোমার যদি গানের ওস্তাদ থাকত তাহলে না জানি কত সুন্দর গান গাইতে!"

পিছনের দিকে বসে থাকা একজন বলল, "গানের ওস্তাদ! হ্যাহ্!"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "কেন? কী হয়েছে?"

"গাজীর বাপ যদি খালি খবর পায় হে গান গাইছে তাহলে তার শরীরের সবগুলি হাড্ডি গুঁড়া করে ফেলবে।"

"কেন?"

"হের বাপ মুসুল্লি।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "মুসুল্লি মানুষ গান শুনতে পারে না?"

পিছনে বসে থাকা ছেলেটা বলল, "হের বাবা শুনে না।"

অন্যান্য ছেলে গাজীকে আরো গান শোনাতে বলল, গাজীর তখন একটু লজ্জা কেটেছে। সে একটা হাসন রাজার গান আরেকটা পল্লীগীতি গেয়ে শোনাল। গান শেষ করে গাজী যখন তার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে তখন রাশা বলল, "তুমি এত সুন্দর গান গাইতে পারো! আমার যদি অনেক টাকা থাকত তাহলে তোমার গলাটা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতাম।"

কথাটা রাশা ঠাট্টা করে বলেনি, কিন্তু সেটা শুনে সবাই হি হি করে হাসতে থাকে। আনন্দে, ঠিক কিসের জন্য আনন্দ কে জানে!

ঘণ্টা পড়ার পর তাদের ক্লাসে এসে ঢুকলেন রাজ্জাক স্যার, হাতে লম্বা একটা বেত। রাশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আহারে না জানি কোন ছেলে বা মেয়েটাকে এই মানুষটা বেত দিয়ে মারবে। কে জানে, তাকেই মেরে বসবেন কিনা!

রাজ্জাক স্যার বেতটা বাতাসে নাড়াতে নাড়াতে প্রথমে ক্লাসের সামনে একটা চক্কর দিলেন। তারপর জানতে চাইলেন সবাই পড়া শিখে এসেছে কিনা– ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে বসে রইল। রাজ্জাক স্যার তখন একপাশ থেকে পড়া ধরতে শুরু করলেন। স্যার একটা প্রশ্ন করেন উত্তর ঠিক হলে স্যার ছেড়ে দেন উত্তর ভুল হলে স্যার হাতের বেতটা দিতে নির্দয়ভাবে মারতে থাকেন। যখন মারেন তখন নিচের ঠোঁটটা একটু বের হয়ে আসে, মুখ দিয়ে একধরনের শব্দ করেন– মনে হয় বুঝি লোল টেনে নিচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মাঝে রাশা একটা জিনিস আবিষ্কার করল। ঠিক উত্তর দিলে স্যার ছেড়ে দিচ্ছেন আর ভুল উত্তর দিলে নির্দয়ভাবে মারছেন– কিন্তু কোনটা ঠিক উত্তর কোনটা ভুল উত্তর সেটা পুরোপুরি রাজ্জাক স্যারের ওপর নির্ভর করছে। রাশা আবিষ্কার করল পুরোপুরি ভুল উত্তর দিয়ে একটা ছেলে পার পেয়ে গেল কিন্তু তার পাশে বসে থাকা আরেকজন একটা শুদ্ধ উত্তর দিয়েও প্রচণ্ড মার খেল। ক্লাসে বসে কথা বলা বিপজ্জনক জেনেও রাশা পাশে বসে থাকা সানজিদাকে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক উত্তর দিলেও স্যার মারছেন। আবার ভুল উত্তর দিয়েও–"

"ভুল-শুদ্ধ কোনো ব্যাপার নাই।" সানজিদা নিচু গলায় বলল, "যারা স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে না স্যার তাদের মারেন।"

"প্রাইভেট পড়ে না?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি পড়?"

"পড়ি।"

"তাহলে তুমি মার খাবে না?"

"না। কিন্তু শিউলী মার খাবে।"

"শিউলী প্রাইভেট পড়ে না?"

"না।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "আর আমি?"

"প্রথম দিন এই জন্য মনে হয় তোমাকে ছেড়ে দেবেন।"

সানজিদার কথা সত্যি হলো। তাকে স্যার ছেড়ে দিলেন, শিউলী মার খেল। রাশাকে বললেন, প্রথম দিন বলে ছেড়ে দিচ্ছেন পরেরবার কিন্তু ছাড়বেন না।

গায়ক ছেলেটি প্রচণ্ড মার খেল। রাশা বুঝতে পারল স্যারের হিসেব খুব সোজা। যারা তার কাছে প্রাইভেট পড়বে স্যার তাদের দেখেশুনে রাখবেন। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন বলে দেবেন, পরীক্ষায় ভালো নম্বর দেবেন, ক্লাসে পিটাবেন না। যারা প্রাইভেট পড়বে না তাদের পিটিয়ে সোজা করে দেবেন।

রাশা ক্লাসে বসে শীতল চোখে এই দানবটির দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রথম শাস্তি

অনেক দিন পর রাশা তার স্যুটকেসটা খুলল, আসার সময় সে তার দরকারি জিনিসপত্রগুলো এই স্যুটকেসে করে এনেছে। তার মনে ছিল শেষ মুহূর্তে সে তার কিছু পাঠ্যবই স্যুটকেসটাতে ঢুকিয়েছিল। আজ স্যুটকেসটা খুলে সে সেগুলো বের করল। সবগুলো বই নেই, সেগুলো এখান থেকে কিনে নিতে হবে। অনেক খুঁজে দুটো খাতাও সে পেয়ে গেল, কালকে স্কুলে যাওয়ার মতো জোগাড়যন্ত্র আছে।

রাশা বিছানায় তার বইগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে খুলে খুলে দেখছিল, তখন নানি পাশে এসে বসলেন। বললেন, "তোর লেখাপড়ার জন্যে একটা চেয়ার টেবিল লাগবে, তাই না?"

"সেগুলো ধীরে ধীরে করলেই হবে নানি। বিদ্যাসাগর ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসে পড়তেন– আমার তো তবু নিজের কুপি বাতি আছে!"

"তোর অনেক কষ্ট হচ্ছে, তাই না?"

"নানি, আমি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না, আসলেই অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি জীবনেও কখনো এত দূর হেঁটে যাইনি। পা ব্যথা হয়ে গেছে।"

"দেখি তোর পাগুলো বের করো। টিপে দিই–"

রাশা হি হি করে হাসল, বলল, "নানি তুমি যে কী বলো! তুমি আমার পা টিপে দিবে কেন? তার চেয়ে তুমি আমার পিঠ চাপড়ে বলো, সাবাশ মেয়ে সাবাশ!"

নানি পিঠ চাপড়ে বললেন, "সাবাশ মেয়ে সাবাশ!"

তারপর বলো, "তুমি আমার যোগ্য নাতনি! তুমি নিজে নিজে স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছ।"

নানি বললেন, "তুমি আমার যোগ্য নাতনি! তুমি নিজে নিজে স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছ।"

"এখন আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আমার কপালে একটা চুমা দেও।"

নানি তার পিঠ চাপড়ে কপালে মাথায় গালে ঘাড়ে অনেকগুলো চুমো দিলেন।

রাশা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "নানি, তুমি শুধু কোনোদিন আমাকে আমার স্কুলের নাম জিজ্ঞেস করো না। ঠিক আছে?"

"কেন?"

"এই স্কুলটার নাম একটা রাজাকারের নামে দেয়া হয়েছে। আমি আমার মুখে কোনোদিন রাজাকারের নাম উচ্চারণ করব না।"

নানি রাশার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো কথা বললেন না। রাশা বলল, "আমার নানা এত বড় একটা মুক্তিযোদ্ধা আর আমি রাজাকারের নামে দেয়া একটা স্কুলে পড়ব, এটা তো হতে পারে না। এই নামটা বদলাতে হবে।"

"কিভাবে বদলাবি?"

"আমি জানি না।" তারপর নানির দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে নাই তুমি আমাকে একটা মাদুলি দিয়েছ, বলেছ পাকসাফ হয়ে এই মাদুলি হাতে নিয়ে যা চাওয়া যায় সেটাই পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ বলেছি।"

"আমি সেটাই চাইব।"

"ঠিক আছে।"

রাশা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "নানি।"

"কী হলো?"

"আমার আম্মু কোনোদিন নানার কথা কিছু বলে নাই। আমি আসলে কিছুই জানি না। তুমি আমাকে একদিন বলবে?"

নানি রাশার দিকে তাকালেন, রাশা দেখল নানির দৃষ্টিটা দেখতে দেখতে কেমন যেন উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে গেল। তার হাত অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করল, নানি ফিসফিস করে বললেন, "সোনা আমার, আমাকে জিজ্ঞেস করিস না। ওই দিনগুলোর কথা মনে হলেই আমার মাথার ভিতর সব ওলটপালট হয়ে যায়– আমি আর কিছু করতে পারি না।"

রাশা অবাক হয়ে দেখল, নানির সবকিছু সত্যি সত্যি যেন ওলটপালট হয়ে গেল, কেমন যেন দিশেহারা হয়ে বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। রাশা ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সরি নানি, সরি! আমি আসলে বুঝতে পারি নাই! আমি আর কোনোদিন জিজ্ঞেস করব না নানি। কোনোদিন জিজ্ঞেস করব না! খোদার কসম নানি কোনোদিন জিজ্ঞেস করব না।"

রাশা বইয়ের লিস্টটা বের করে বইয়ের দোকানের মানুষটার হাতে দিয়ে বলল, "আপনার কাছে এই বইগুলি আছে?"

মানুষটা লিস্টটা দেখে বলল, "আছে।"

"আমাকে দিবেন।"

মানুষটা তাক থেকে বইগুলি এবং সাথে আরো কিছু বই নামাল তারপর সেগুলো রাশার দিকে ঠেলে দিল। রাশা বোর্ডের বইগুলো আলাদা করে অন্য বইগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো কী?"

"গাইড বই।"

"আমার গাইড বই লাগবে না।"

মানুষটা রাশার হাত থেকে বোর্ডের বইগুলো নিয়ে গাইড বইসহ সবগুলো বই আবার তাকে রেখে দিল। রাশা অবাক হয়ে বলল, "কী হলো?"

"গাইড বই ছাড়া আমরা বোর্ডের বই বিক্রি করি না।"

"সেটা আবার কী রকম কথা? আমার যেটা ইচ্ছা সেটা কিনব।"

মানুষটা বলল, "বোর্ডের বই বেচে আর কয় পয়সা পাওয়া যায়? আমাদের লাভ আসে গাইড বই বেচে। তুমি গাইড বইসহ কিনলে কিনো। ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিব।"

রাশা বলল, "কোনোদিনও আমি গাইড বই কিনব না।"

"তাহলে তোমার পাঠ্যবই কেনা হবে না। গাইড বই ছাড়া এই দেশে কেউ পাঠ্যবই বিক্রি করে না।"

"কে বলেছে?"

জয়নব রাশার কনুই ধরে ফিসফিস করে বলল, "সত্যি কথা।"

"সত্যি কথা?"

"হ্যাঁ। আমাদের সবার গাইড বই কিনতে হয়েছে।"

রাশা কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, "ঠিক আছে দেন।"

মানুষটা আবার বইগুলো নামিয়ে দিল। রাশা জিজ্ঞেস করল, "কত?"

মানুষটা একটা কাগজে হিসেব করে দাম বলল, রাশা তার ব্যাগ থেকে টাকা বের করে মানুষটার হাতে দিয়ে বলল, "আপনার কাছে একটা কাঁচি আছে?"

"কাঁচি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"একটু কাজ আছে।"

মানুষটা ডেস্কের নিচে খুঁজে একটা বড় কাঁচি বের করে দিল। রাশা তখন তার গাইড বইগুলো নিয়ে তার পৃষ্ঠাগুলো কাঁচি দিয়ে কাটতে শুরু করে। মানুষটা হা হা করে উঠল, বলল, "কী করছ? কী করছ?"

"পৃষ্ঠাগুলি কাটছি।"

"কেন?"

"ছোট ছোট টুকরো করব। ঐ যে মোড়ে চানাচুরওয়ালা আছে তাকে দিব। সে এইগুলিতে করে চানাচুর দেবে।"

"তু-তুমি টাকা দিয়ে বই কিনে সেগুলো নষ্ট করছ?"

"আমি মোটেও নষ্ট করছি না। আমি কাজে লাগাচ্ছি। গাইড বই কাজে লাগানোর এটা হচ্ছে উপায়!"

মানুষটা কেমন যেন অস্থির হয়ে যায়, "তুমি যখন নষ্টই করছ আমাকে দিয়ে দাও!"

"আমি মোটেও নষ্ট করছি না। আমি কাজে লাগাচ্ছি। আপনি যদি

কোনো ছাত্র না হয় ছাত্রীর কাছে এই গাইড বই বিক্রি করেন সেটা হচ্ছে নষ্ট করা।"

রাশা যত্ন করে সবগুলো পৃষ্ঠা কেটে ছোট ছোট টুকরো করল। বইয়ের দোকানের মানুষটা হাঁ করে রাশার দিকে তাকিয়ে রইল, আর রাশা কাগজের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে মোড়ের চানাচুরওয়ালাকে দিয়ে দিল। চানাচুরওয়ালা অবাক হয়ে বলল, "এগুলো কী?"

রাশা বলল, "আপনি যখন চানাচুর বিক্রি করবেন তখন এই কাগজে করে দেবেন।"

চানাচুরওয়ালাকে কেমন জানি একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, তার কাগজের একটা মাপ আছে, এই কাগজগুলো মাপমতো হয়নি, একটু বড় হয়েছে। সে এগুলো দিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাশা জয়নবের হাত ধরে তাড়াতাড়ি চলে আসে, চানাচুরওয়ালা যদি কাগজগুলো ফেলেও দেয় তবু মনে হয় সেটা কাজে লাগবে!

স্কুলে গণিত ক্লাসে কালোমতন টাকমাথাওয়ালা স্যার আজকেও কয়েকটা অংক তার নোটবই থেকে বোর্ডে টুকে দিলেন। আজকেও ইংরেজি ক্লাসে কোনো স্যার এলেন না, তখন গাজী দুটি গান শোনাল, তারপর মতিন নামে একটা ছেলে ক্যারিক্যাচার করে দেখাল। ছেলেমানুষি কেরিক্যাচার, রাশা তারপরেও জোর করে হাসার ভান করল। বিজ্ঞান ক্লাসে আবার রাজ্জাক স্যার হাতে বেত নিয়ে ঢুকলেন। বেতটা টেবিলে রেখে স্যার ক্লাসের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কয়েকবার হেঁটে ক্লাসের সামনে এসে থামলেন, তারপর ক্লাসের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "আজকে আমি তোদের কয়েকটা কথা বলব, তোরা মন দিয়ে শুনবি।"

সারা ক্লাস নড়েচড়ে বসে। রাজ্জাক স্যার বললেন, "আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন স্যারদের আমরা আলাদাভাবে সম্মান করতাম। যেখানেই স্যারদের সাথে দেখা হতো আমরা গিয়ে সালাম দিতাম। যদি দেখতাম স্যারেরা বাজারের ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন আমরা স্যারের বাসায় সেই ব্যাগ পৌঁছে দিতাম। আর এখন?"

রাজ্জাক স্যার চোখ পাকিয়ে তাকালেন, "সেইদিন একটা ছাত্র আমাকে দেখে সালাম দেয়া তো দূরের কথা, না দেখার ভান করে সুট করে একটা

গলিতে ঢুকে পড়ল। সে কী ভেবেছে আমি তাকে দেখি নাই? ঠিকই দেখেছি, আমি একদিন চাবুকে তার ছাল তুলে দেব।"

স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, "এই দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই দেশ কোনো ভালো মানুষের জন্ম দেয় না। শুধু চোর-ছ্যাঁচড়ের জন্ম দেয়। এই দেশ শিক্ষকের মর্যাদা দেয় না। শিক্ষকের বেতন এত কম যে সংসার চলে না। তারপরেও আমি শিক্ষক হয়েছি। বুঝেছিস? শত শত চোর-ছ্যাঁচড় বের করার মাঝে যদি একজনও ভালো মানুষ তৈরি করতে পারি তাহলে মনে করব শিক্ষকের জীবন সার্থক হয়েছে। বুঝেছিস?"

ছাত্রছাত্রীরা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। স্যার বললেন, "একটা সাবজেক্ট ভালো করে পড়াতে অনেক সময় লাগে, আমাদের কি কেউ সেই সময় দেয়? দেয় না। সেই জন্যে ক্লাসে পড়া শেষ করতে পারি না। অন্য মাস্টারেরা হাল ছেড়ে দেয়, আমি দিই না। আমি আমার বাসায় পড়াই। যারা আমার বাসায় প্রাইভেট পড়ে তারা সবাই ভালো রেজাল্ট করে। আমি গত তিন-চার বছরের বোর্ডের প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করে সাজেশন দেই, সেই সাজেশন থেকে প্রশ্ন আসে। আমি ইচ্ছা করলে সেই সাজেশন লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারতাম, আমি করি না। খালি আমার ছাত্রছাত্রীদের দিই।"

স্যার ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কাজেই তোরা যারা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে চাস, ঠিকমতন লেখাপড়া করে মানুষ হতে চাস তারা স্কুলের পরে আমার বাসায় পড়তে আসবি। মনে থাকবে?"

ক্লাসের সবাই কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। স্যার বললেন, "আর যারা আসবি না, আমি ধরে নিব তাদের লেখাপড়ায় উৎসাহ নাই। তাদের জন্যে আমার কোনো মায়াদয়া নাই। বুঝলি?" সবাই মাথা নেড়ে জানাল তারা বুঝেছে। রাজ্জাক স্যার তারপর পড়াতে শুরু করলেন, একজন একজন ছাত্রকে রিডিং পড়তে দিলেন। যারা তার কাছে প্রাইভেট পড়ে তাদের রিডিং পড়া শুনে বললেন, ভেরি গুড। যারা পড়ে না তাদের ভুল করে পড়ার জন্যে পেটাতে শুরু করলেন।

রাশা আগে কখনো কোনো স্যারকে পেটাতে দেখেনি, তাই সেই দৃশ্য দেখে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে, এই দৃশ্য তার পক্ষে দেখা সম্ভব না। কোনোভাবেই সম্ভব না।

পরের এক সপ্তাহ সময়টা রাশার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সপ্তাহ বলে ধরে নেয়া যায়। তার প্রথম কারণ তার আগের স্কুলের জাহানারা ম্যাডামের পাঠান্যে একটা প্যাকেট। ম্যাডাম টেলিফোনে বলেছিলেন স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে কাগজপত্রের দুটো অরিজিনাল কপি করে একটা স্কুলে আরেকটা তার নানির বাড়িতে পাঠাবেন। রাশা তাই সাদামাটা পাতলা একটা খামের জন্যে অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু যেটি এলো সেটি রীতিমতো একটা প্যাকেট। রেজিস্ট্রি করে পাঠানো হয়েছে তাই রাশাকে সাইন করে সেটা নিতে হলো আর পিয়নকে তার সাথে একটু বখশিশও দিতে হলো।

প্যাকেটের ভেতরে ভর্তির জন্যে দরকারি অরিজিনাল কাগজপত্র ছাড়াও রয়েছে দুটি বই আর আরেকটা চিঠি। জাহানারা ম্যাডাম চিঠিটা লিখেছেন, চিঠিটা পড়তে পড়তে কয়েকবার রাশার চোখে পানি এসে গেল। ম্যাডাম লিখেছেন :

প্রিয় রাশা,

আমি জীবনে খুব বেশি চিঠি লিখিনি, কিন্তু মনে হলো তোমাকে একটা চিঠি লিখি। চিঠিতে যে কথাগুলো লিখছি সেটা ইচ্ছে করলে টেলিফোনেও তোমাকে বলতে পারতাম, কিন্তু মনে হলো চিঠিতে লেখাটাই ভালো হবে। অনেক কথা আছে যেগুলো মুখে বলা যায় না, চিঠিতে লেখা যায়। আবার অনেক কথা আছে যেগুলো চিঠিতে লেখা যায় না, কিন্তু মুখে বলা যায়।

আমি অনেক দিন থেকে শিক্ষকতা করছি, আমার অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের কেউ কেউ অনেক বড় হয়েছে। তুমি তাদের অনেকের মতোই একজন ছাত্রী ছিলে, আমি আলাদা করে তোমাকে কখনো দেখিনি। এখন দেখছি। তুমি প্রথম যেদিন বলেছিলে তোমার আম্মু তোমাকে ফেলে চলে যাবেন আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের এসব বিষয়ে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। হঠাৎ করে তুমি যখন স্কুলে আসা বন্ধ করে দিলে আর আমি খোঁজ নিয়েও তোমার খোঁজ পেলাম না তখন আমি তীব্র অপরাধবোধে ভুগেছি। আমার মনে হয়েছে তুমি আমার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছিলে, আমি তোমাকে সাহায্য করিনি।

তারপর হঠাৎ করে আমি যখন তোমার টেলিফোন পেলাম আমি ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল তোমার মুখে আমি না জানি কী শুনব। তোমার মা গহীন কোনো এক গ্রামে তোমার নানির কাছে ফেলে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন– তোমার লেখাপড়া শেষ, তোমার জীবন শেষ, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে এটা বলতে পারতে। এটা বললে খুব একটা মিথ্যা কথা বলা হতো না। কিন্তু তুমি আমাকে সেটা বলনি, তুমি আমাকে বলেছ যে তুমি একা– হ্যাঁ পুরোপুরি একা এই ভয়ংকর দুঃসময়ের মুখোমুখি হয়েছ। গহীন এক গ্রামের অখ্যাত একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করার প্রস্তুতি নিচ্ছ। আমি যদি তোমাকে স্যালুট না করি কাকে করব?

আমি যে স্কুলে শিক্ষকতা করি সেটা বাংলাদেশের খুব বিখ্যাত একটা স্কুল। প্রতিবছর ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে, পত্রপত্রিকায় তাদের ছবি ছাপা হয়। কিন্তু আমি জানি আমরা তাদের লেখাপড়া শিখাই না, আমরা তাদের ভালো নম্বর পাওয়া শিখাই। তাই তুমি যে এই খুব ভালো স্কুলে না পড়ে কোনো গহিন গ্রামের অখ্যাত একটা স্কুলে লেখাপড়া করছ সেটা কি আসলেই খুব ক্ষতি হলো? মনে হয় না, আমার ছাত্রছাত্রীরা সারাদিন স্কুল করে। স্কুলের পর বাকি সময়টা প্রাইভেট পড়ে আর কোচিং করে। এর চাইতে নিরানন্দ জীবন আর কী হতে পারে। তোমাকে অন্তত সেটা করতে হচ্ছে না, তুমি মনে হয় গাছ দেখতে পাচ্ছ, আকাশ দেখতে পাচ্ছ, ধানক্ষেত, নদী দেখতে পাচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই পূর্ণিমা দেখবে, জোছনার আলো দেখবে। আমরা বহুদিন সেগুলো দেখি না।

লেখাপড়াটা নিজের ওপর। আমি বিশবছর ধরে শিক্ষকতা করছি কিন্তু আমি জীবনে কখনো কাউকে কিছু শিখাইনি, আমার ছাত্রছাত্রীরা যা শিখেছে সব নিজে নিজে শিখেছে। আমি শুধু তাদের শিখতে উৎসাহ দিয়েছি। আমি তাই তোমাকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে এই চিঠিটা লিখছি। আমি তোমাকে তিনটি বই পাঠাচ্ছি। প্রথম বইটা গণিতের বই– ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতে যাওয়ার আগে যেটুকু গণিত জানা দরকার এখানে তার পুরোটুকু আছে। তুমি এর চ্যাপ্টারগুলো পড়বে, উদাহরণগুলো দেখবে আর চ্যাপ্টারের শেষে অঙ্কগুলো করবে। যেদিন তুমি এই বইটা নিজে নিজে শেষ করবে– সেদিন তুমি নিজে তোমার পিঠ চাপড়ে বলবে, "রাশা! তুমি সত্যিকার জীবনে ঢোকার জন্যে প্রয়োজনীয় গণিত শিখে গেছ।" দুই নম্বর

বইটা ফিজিক্সের। ভূমিকাটা পড়লে বুঝবে এটা আসলে লেখা হয়েছে কলেজের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিন্তু আমি দেখেছি যে এটা আসলে যে কেউ পড়তে পারবে। তুমি যদি এই বইটা শেষ করতে পারো তাহলে আমি নিজে গিয়ে তোমার দুই গালে দুটি চুমো দিয়ে আসব। তোমার নিজের বিশাল একটা লাভ হবে, স্কুলের বিজ্ঞান নিয়ে তোমার জীবনে কোনোদিন কোনো সমস্যা হবে না।

তিন নম্বর বইটা ইংরেজি গল্পের সংকলন। পৃথিবীর সেরা লেখকদের লেখা গল্প এখানে আছে। এটা মোটেও তেরো-চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ের বই না– কিন্তু আমার ধারণা তুমি এখন মোটেও তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ে না। তুমি খুব অল্প সময়ে অনেক বড় হয়ে গেছ। কে জানে হয়তো আমার থেকেও বড়। তোমার ইংরেজির চর্চাটা রাখা দরকার সে জন্যে এটা পাঠালাম।

আমি বহুদিন গ্রামে যাইনি, গ্রাম হয়তো আর আগের মতো নেই। গ্রামে নিশ্চয়ই এখন নোংরামো, কুসংস্কার, ধর্মের বিধি-নিষেধ এসব ঢুকে গেছে, তুমি খুব সাবধানে থাকবে। তোমার যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়– যে কোনোরকম সাহায্য– তাহলে আমাকে জানাবে। আমার টেলিফোন নম্বরটা মুখস্থ করে রেখো, ঠিক আছে?

তোমার
জাহানারা ম্যাডাম

রাশা তার ম্যাডামের চিঠিটা পরপর তিনবার পড়ল তারপর চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে একটু কাঁদল– জ্বালা ধরানো হতাশার কান্না না। অন্য একরকম কান্না। তারপর সে বইগুলো দেখল, নীলক্ষেতের ফটোকপি করা ভুসভুসে বই না, বিদেশি বাঁধাইয়ের ঝকঝকে বই। বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নতুন বইয়ের তাজা গন্ধটা পর্যন্ত আছে। কী সুন্দর পিছলে পিছলে পৃষ্ঠা, ঝকঝকে ছাপা, রঙিন ছবি, দেখলেই মনে হয় বইটা বুকে চেপে ধরে রাখি। রাশা অনেকক্ষণ বইগুলো নাড়াচাড়া করল, তার বই রাখার কোনো টেবিল বা সেলফ নেই, তাই সে বইগুলো রাখল তার বালিশের নিচে, সারাদিন যখনই সে একটু সময় পেল তখনই এসে বইগুলোতে একটু হাত বুলিয়ে গেল।

এই সপ্তাহটা রাশার জন্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ হলো সম্পূর্ণ অন্য কারণে– এই সপ্তাহে সে জীবনের প্রথম মার খেল। সে কখনো কল্পনা করেনি যে কেউ তার গায়ের ওপর হাত তুলবে কিন্তু ঠিক সেটাই ঘটল। ঘটনাটা ঘটল এভাবে :

রাজ্জাক স্যারের ক্লাস, স্যার প্রত্যেকদিনের মতো হাতে বেত নিয়ে ঢুকেছেন। টেবিলের ওপর বেতটা রেখে প্রথমে খানিকক্ষণ বকবক করলেন, তারপরে একটু পড়ানোর ভঙ্গি করলেন। তারপর পড়া ধরার ভান করে ছেলেমেয়েদের পেটাতে শুরু করলেন। কোনো একটা কারণে আজকে স্যারের মেজাজটা বেশি খারাপ ছিল, আজকে পেটাতে লাগলেন অনেক বেশি হিংস্রভাবে। ক্লাসের মাঝামাঝি একটা ছেলে মার খেতে খেতে আর সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল আর তার ফল হলো ভয়ানক। স্যার মনে হয় আরো খেপে গেলেন, ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে বেঞ্চের ওপর ফেলে এমনভাবে মারতে লাগলেন যে দেখে মনে হতে লাগল বুঝি আজকে ছেলেটাকে মেরেই ফেলবেন।

রাশা আর সহ্য করতে পারল না, কী করছে না বুঝেই হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিলের মতো চিৎকার করে বলল, "স্যার।"

মনে হলো ক্লাসের মাঝে বুঝি একটা বোমা পড়েছে, স্যার ছেলেটার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে ঘুরে তাকালেন। তার চোখ দুটি লাল, নাকটা ফুলে উঠেছে, নিচের চোয়ালটা একটু সামনে বের হয়ে এসে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। হিংস্র গলায় বললেন, "কে?"

রাশা বলল, "আমি স্যার।"

"কী হয়েছে?"

"আপনি এভাবে ওকে মারতে পারেন না।"

মনে হলো স্যার নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললি?"

"বলেছি আপনি এভাবে ক্লাসের মাঝে মারতে পারেন না।"

স্যারের চোখ দুটি আরো লাল হয়ে উঠল, মনে হলো তার নিশ্বাসে বুঝি আগুন বের হয়ে আসবে। স্যার তার বেতটাকে শক্ত করে ধরে রাশার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, "তুই আমাকে শেখাতে এসেছিস আমি কী করব? তোর এত বড় সাহস?"

স্যার তার বেতটাকে শক্ত করে ধরে
বাশার দিকে এগিয়ে এলেন।

"স্যার এটা সাহসের ব্যাপার না স্যার–এটা–"

রাশা কথা শেষ করতে পারল না, স্যার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তোর এত বড় সাহস তুই আমার মুখের ওপর কথা বলিস?"

"না স্যার– আসলে–" রাশা কথা শুরু করতে গিয়ে থেমে গেল। স্যার ততক্ষণে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন যে স্যারের শরীরের বোটকা একটা গন্ধ রাশার নাকে এসে লাগল। স্যার হিংস্র চোখে রাশার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেয়াদব মেয়ে। আমি তোর বেয়াদবি আজকে জন্মের মতো শিখিয়ে দেব–"

রাশা কিছু বলল না, হঠাৎ করে বুঝতে পারল, আজকে ভয়ানক একটা কিছু ঘটে যাবে। স্যার বললেন, "হাত পাত–"

রাশা তার হাতটা এগিয়ে দিল। স্যার তার বেতটা ওপরে তুললেন, রাশা দেখল বেতটা ওপর থেকে নিচে তার হাতের ওপরে নেমে আসছে– শপাং করে একটা শব্দ হলো আর সাথে সাথে রাশার মনে হলো তার পুরো হাতটা বুঝি আগুনে ঝলসে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথার একটা অনুভূতি হাত থেকে সারা শরীরের মাঝে ছড়িয়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে হাতটা সরিয়ে নেয়ার অদম্য একটা ইচ্ছা হলো রাশার, কিন্তু সে তার হাতটা সরাল না, দাঁতে দাঁত চেপে রাখল, চিৎকারও করল না। শুনতে পেল সারা ক্লাস এক সাথে একটা চাপা আর্তনাদ করল।

রাশা দাঁতে দাঁত ঘষে নিজেকে বলল, "আমি কাঁদব না। মরে গেলেও কাঁদব না। কাঁদব না, কাঁদব না, কাঁদব না–"

সে তার হাতটা সামনে ধরে রাখল, স্যার বেতটা উপরে তুলে আবার মারলেন, বাতাসে শপাং করে আবার একটা শব্দ হলো, যন্ত্রণার প্রচণ্ড অনুভূতিতে রাশার মনে হলো সারা পৃথিবী বুঝি অন্ধকার হয়ে গেছে।

হঠাৎ করে ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে একে একে দাঁড়িয়ে গেল, সবাই সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে কেউ কিছু বলছে না কিন্তু সবাই তীব্র দৃষ্টিতে স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যার কেমন যেন হকচকিত হয়ে গেলেন, আবার মারার জন্যে বেতটা উপরে তুলেছিলেন, না মেরে আস্তে আস্তে বেতটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, "কী হয়েছে?"

কেউ কিছু বলল না, স্যার আবার চিৎকার দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে?" তার নিজের কাছেই চিৎকারটা কেমন যেন ফাঁপা শোনাল। স্যার একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন। বস।"

এবারে ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে বসে পড়ল, শুধু রাশা দাঁড়িয়ে রইল। সে হাতটা সামনে এগিয়ে পেতে রেখেছে। ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট, তুমি মারতে চাইলে আরো মারতে পারো, আমি ভয় পাই না।

রাজ্জাক স্যার সারা ক্লাসের দিকে একবার তাকালেন তারপর টেবিল থেকে তার চক-ডাস্টার নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

এতক্ষণ রাশা পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, স্যার বের হয়ে যাওয়া মাত্র সে মাথা নিচু করে বসে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

সারা ক্লাসের মাঝে হঠাৎ যেন কী ঘটে গেল, যে যেখানে ছিল সেখান থেকে সবাই রাশার কাছে ছুটে এলো। কয়দিন আগে এই ক্লাসের ছেলেরা মেয়েদের সাথে কথা পর্যন্ত বলত না, হঠাৎ করে সব পাল্টে গেল। কঠিন চেহারার একটা ছেলে রাশার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "কান্দিস না। তুই কান্দিস না। আল্লাহর কসম লাগে।"

একটা ছেলে দৌড়ে বাইরে ছুটে গেল। টিউবওয়েলের পানিতে একটা রুমাল ভিজিয়ে এনে রাশার ডান হাতটা মেলে খুব সাবধানে ভিজে রুমালটা চেপে ধরে রাখল। সেখানে টকটকে লাল হয়ে দুটি দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একজন একটা খাতা দিয়ে তাকে বাতাস করতে থাকে। একজন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রাশা তখন মুখ তুলে তাকাল, তার চোখ থেকে তখনো ঝরঝর করে পানি ঝরছে। সানজিদা তার চোখ মুছে দেয়ার চেষ্টা করল, রাশা তখন নিজেই চোখ মুছে নেয়। যে ছেলেটাকে নির্দয়ভাবে মারার জন্য রাশা লাফিয়ে উঠেছিল সেই ছেলেটা দুই হাত উপরে তুলে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, "তুই এটা কী করলি? আমাদের মার খেয়ে অভ্যাস আছে, তাই বলে তুই? তুই?"

ঠাণ্ডা চেহারার ছোটখাটো একটা ছেলে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আমি খুন করে ফেলব। খুন করে ফেলব এই ব্যাটাকে।"

রাশা চোখ মুছে শান্ত গলায় বলল, "ঠিক আছে। ঠিক আছে সবকিছু। আমি ঠিক আছি। তোরা ব্যস্ত হবি না।"

ছেলেরা এবং মেয়েরা রাশাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তারা ঠিক কী করবে বুঝতে পারছিল না।

বিকেলবেলা স্কুল ছুটির পর যখন সে অন্যদের সাথে বাড়িতে আসছে তখন তাদের ক্লাসের একটা লাজুক ধরনের ছেলে হঠাৎ তার কাছে এসে নিচু গলায় বলল, "রাশা।"

রাশা বলল, "কী?"
"তু-ই মানে তুমি– মানে তুই–"
"আমি?"
"তুই কী এখন আমাদের স্কুল ছেড়ে চলে যাবি?"
"না! স্কুল ছেড়ে কোথায় যাব?"
"যাস না। ঠিক আছে? আমরা সবাই তোর সাথে আছি।"
রাশা বলল, "আমি জানি।"
রাশা সত্যি সত্যি জানে রাজ্জাক স্যারের এই ঘটনায় হঠাৎ করে পুরো ক্লাস তার আপন হয়ে গেছে। তার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ছিল এটা, কিন্তু এই ঘটনার জন্যেই সে সারা ক্লাসের আপনজন হয়ে উঠল।

উচিত থেকেও উচিত শিক্ষা

রাজ্জাক স্যারের মারের দাগটা লাল হয়ে ফুলে গিয়েছিল, নানির চোখ থেকে আড়াল রাখার জন্য রাশাকে কয়েকদিন খুব সাবধান থাকতে হলো। নানি অবশ্যি কোনো কিছুকেই খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেন না, তাই তার চোখে পড়লেও ব্যাপারটা ধরতে পারতেন বলে মনে হয় না। রাশা তবু কোনো ঝুঁকি নিল না। নানি যদি জিজ্ঞেস করতেন তাহলে তাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতেই হতো– রাশা কিছুতেই সেটা করতে চাচ্ছিল না।

রাজ্জাক স্যারের মারের ঘটনার পর তার ক্লাসের সবাই তাকে একটু অন্যচোখে দেখে, কিন্তু একটা ছেলের ব্যবহারের মাঝে একটা বড় পরিবর্তন দেখা গেল। লাজুক ধরনের ছেলে, নাম রতন, প্রথম দিনেই তাকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছে সে স্কুল ছেড়ে চলে যাবে কিনা। রাশা লক্ষ করল, রতন ছেলেটা সবসময়েই তার আশেপাশে থাকছে, মনে হয় তাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে। রাশা একসময় তাকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, "তুই কি আমাকে কিছু বলবি?"

রতন আশেপাশে তাকাল তারপর গলা নামিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"কী বলবি? বল।"

"এখানে তো বলতে পারব না।"

"কেন?"

"অন্যেরা শুনে ফেলবে।"

রাশা অবাক হয়ে বলল, "শুনে ফেললে কী হবে?"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "না অন্যদের শোনানো যাবে না।"

"তাহলে কখন বলবি?"

"তুই যখন বাড়ি যাবি, তখন বলব। রাস্তায়।"

"ঠিক আছে।"

সেদিন বিকেলবেলা রাশা যখন জয়নব, জিতু আর মতি অন্যদের নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছে তখন একটা নিরিবিলি জায়গায় হঠাৎ করে কোথা থেকে জানি রতন এসে হাজির হলো। সে এদিক-সেদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, "এই রাশা শোন।"

রাশা দাঁড়িয়ে গেল, সাথে সাথে জয়নব, জিতু, মতি আর অন্যরাও। রতন রহস্যময় একটা ভঙ্গি করে বলল, "শুধু তুই। অন্যদের চলে যেতে বল।"

রাশা বলল, "চলে গেলে হবে কেমন করে? ওরা অপেক্ষা করুক।"

"ঠিক আছে। কিন্তু অনেক দূরে অপেক্ষা করতে হবে।"

রাশা জয়নবকে বলল, "তোরা হেঁটে ঐ ব্রিজটার ওপর অপেক্ষা করো, আমি রতনের সাথে কথা বলে আসছি।"

জয়নব খুব সন্দেহের চোখে একবার রতনকে আরেকবার রাশাকে দেখল, তারপর হেঁটে হেঁটে সামনে এগিয়ে গেল।

রাশা রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "বল কী বলবি।"

"কাউকে বলবি না তো?"

"না শুনে কেমন করে বলি?" রাশা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আগে বল! শুনি কথাটা কী!"

"আমার এক মামা লন্ডনে থাকে।"

রাশা অবাক হয়ে রতনের দিকে তাকাল, তার মামা লন্ডনে থাকে সেটা বলার জন্যে এত গোপনীয়তা কেন?

"সেই মামা বাড়ি এসেছে। মামার তিন-চারটা মোবাইল ফোন।"

রাশা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে কখন মামার গল্প শেষ হয়ে আসল গল্প শুরু হবে। রতন বলল, "আমি মামাকে বললাম, মামা আমাকে একটা মোবাইল ফোন দিবে? মামা বলল, তুই বাচ্চা ছেলে মোবাইল ফোন দিয়ে কী করবি। আগে বড় হ তখন তোরে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিব।"

রতন এইটুকু বলে রাশার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল, রাশা ঠিক বুঝতে পারল না সে কী বলবে, রাশার সন্দেহ হতে থাকে রতনের মাথায়

হয়তো একটু ছিট আছে, সে তাকে শেষ পর্যন্ত মোবাইল ফোনের গল্পই শোনাতে থাকবে। হলোও তাই, রতন বলল, "আমি তখন বললাম, মামা তোমার যে মোবাইল দিয়ে ছবি তোলা যায় সেইটা দিবা? কয়টা ছবি তুলি। মামা বলল, হারাবি না তো? অনেক দামি মোবাইল। আমি বললাম, না মামা হারাব না।"

রতন আবার থামল, রাশার দিকে তাকাল, মনে হলো সে আশা করছে রাশা এখন কিছু একটা বলবে। রাশা কিছু বলল না, অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন গল্পটা শেষ হবে। রতনের গল্প শেষ করতে কোনো তাড়া নেই, সে বলল, "মামার মোবাইল অনেক দামি, ফটো তুলতে পারে, ভিডিও করতে পারে। আমি অনেক ফটো তুলেছি, ভিডিও তুলেছি।"

রাশা আর পারল না, বলল, "বেশ করেছিস! আরো ফটো তোল, আরো ভিডিও কর। এখন আমি যাই।"

"শোন না কী করেছি। একদিন আমি মামার মোবাইলটা স্কুলে নিয়ে আসছিলাম, কাউকে বলি নাই। পোলাপান যা বদ, নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করবে। বলবে আমার ছবি তোল, আমার ছবি তোল। শেষে হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাবে। সেই জন্যে কাউকে দেখাই নাই।"

রাশা অধৈর্য হয়ে বলল, "রতন! আমার বাড়ি অনেক দূর। যেতে অনেকক্ষণ লাগবে। তোর মোবাইলের গল্প আজকে এইখানে শেষ কর, বাকিটা কালকে শুনব। এখন আমি যাব।"

রতনের মনে হলো একটু মন খারাপ হলো, বলল, "চলে যাবি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি স্কুলে যে ভিডিও করেছি সেটা একটু দেখবি না?"

"কালকে দেখব।"

"একটু দেখ।" বলে রতন তার পকেট থেকে একটা দামি মোবাইল বের করে টেপাটেপি করতে থাকে, হঠাৎ মোবাইলের ভেতর থেকে একজন মানুষের ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসে। রাশা কৌতূহলী হয়ে মোবাইলটার দিকে তাকায়, রাজ্জাক স্যার হাতে বেত নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন, একজনকে পেটাতে পেটাতে শুইয়ে ফেলেছেন। হঠাৎ করে রাশা তার তীক্ষ্ণ গলার চিৎকার শুনতে পেল, "স্যার!"

রাশা চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই পুরোটা ভিডিও করেছিস?"

রতন গম্ভীর মুখে বলল, "পুরোটা। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ভিডিও। কেউ টের পায় নাই!"

"দেখি দেখি–"

রতন তার হাতে মোবাইলটা দেয়, সেখানে দেখা গেল রাজ্জাক স্যার হিংস্র মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন, রাশার সাথে দুই-একটা কথা তারপর শপাং করে হাতের মাঝে বেত এসে পড়ল। রাশা দৃশ্যটি দেখতে পারে না; একধরনের আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলে। মোবাইলের ভেতর থেকে স্যারের হিংস্র গালিগালাজ বের হতে থাকে। রতন বলল, "মামা লন্ডন চলে যাবে।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "এই ফোনটা নিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"এই ভিডিওটার একটা কপি আমাদের রাখতে হবে। এইটা খুবই জরুরি।"

রতন বলল, "সেই জন্যে আমি তোর সাথে নিরিবিলি কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

রাশা বলল, "সেটা তো আগে বলবি। এর পরেরবার যখন কোনো জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলবি তখন ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসবি। বুঝেছিস?"

রতন একটু আহত গলায় বলল, "আমি কখন ধানাই-পানাই করেছি? আমি তো সোজাসুজি কাজের কথাই বলেছি।"

"না বলিস নাই।"

"বলেছি।"

"থাক বাবা এখন এটা নিয়ে আর তর্ক করে লাভ নাই। এখন আমাকে বল এইটা কিভাবে কপি করা যায়।"

"মামাকে জিজ্ঞেস করব?"

"উঁহু। বড় মানুষদের জিজ্ঞেস করলেই ঝামেলা। বাজারে একটা ফোন-ফ্যাক্স-কম্পিউটারের দোকান আছে না?"

"হ্যাঁ আছে।"

"সেইখানে নিয়ে গিয়ে একটা সিডিতে কপি করতে হবে।"

"সিডি কী?"

"সেটা এখন আমি তোকে শিখাতে পারব না। কালকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে আসিস। দুপুরবেলা কপি করাতে নিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে।"

"কাউকে বলবি না।"

"বলব না।"

"গোপন রাখবি।"

রতন মুখভঙ্গি করে বলল, "আমি তো গোপনই রাখতে চাচ্ছি, তুই-ই না সবার সামনে কথা বলতে চাস!"

পরদিন দুপুরে মোবাইল টেলিফোন থেকে ভিডিওটা দুটো সিডিতে কপি করে নেয়া হলো। রাশা সিডি দুটি খুব যত্ন করে রেখে দিল, কোনো একদিন নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। পরেরবার যখন জাহানারা ম্যাডামের সাথে কথা বলবে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে। তাকে এভাবে মেরেছেন শুনলে কষ্ট পাবেন কিন্তু কিছু তো আর করার নেই। স্কুলে ছেলেমেয়েদের পেটানো যাবে না দেশে নিশ্চয়ই এরকম আইন আছে, সেই আইনে রাজ্জাক স্যারের নিশ্চয়ই শাস্তি পাবার কথা। তার একটা উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু সেই শিক্ষাটা তাকে দেবে কে?

কিন্তু হঠাৎ করে সেই সুযোগটা চলে এলো– রাশা নিজেও বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি এরকম চমকপ্রদ একটা সুযোগ আসবে। ঘটনাটা শুরু হলো এভাবে :

সকাল বেলা মাঠে অ্যাসেম্বলিতে সবাই দাঁড়িয়েছে তখন হেডমাস্টার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের জন্যে একটা সুখবর আছে।"

স্যার-ম্যাডামরা যখন বলেন সুখবর আছে প্রায় সবসময়েই দেখা যায় খবরটা আসলে সুখবর না। কয়েকদিন আগে হেড স্যার বলেছিলেন, তোমাদের জন্য একটা সুখবর আছে, এমপি সাহেব আসছেন। সব ছাত্রছাত্রী এমপি সাহেবকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ছোট ছোট পতাকা নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্কুল থেকে সব ছেলেমেয়ে সকাল থেকে রাস্তার দুই পাশে ফ্ল্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে রইল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, তার মাঝে গনগনে রোদ, ঘেমে একেকজন একাকার। শেষ পর্যন্ত এমপি সাহেব এলেন, তার গলায় ফুলের মালা, সামনে-পিছনে শুধু লোক আর

লোক। কালো আর মোটা এমপি সাহেব হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন, স্কুলের এত এত বাচ্চা যে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে একবার ঘুরেও তাকালেন না।

তাই হেডমাস্টার যখন বললেন, তোমাদের জন্যে সুখবর আছে তখন সবাই ভয়ে ভয়ে হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুখবরটা কী শোনার জন্য। হেডমাস্টার বললেন, "তোমরা কারা কারা কম্পিউটারের নাম শুনেছ?"

মোটামুটি সবাই হাত তুলল। হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কারা কারা কম্পিউটার দেখেছ?"

এবারে অনেক হাত নেমে গেল।

"তোমরা কারা কারা কম্পিউটার ব্যবহার করেছ?"

এবারে রাশা ছাড়া অন্য সবার হাত নেমে গেল। আর কারো হাত উঠে নাই বলে রাশাও তাড়াতাড়ি তার হাত নামিয়ে ফেলল। হেডমাস্টার বললেন, "উন্নত দেশে মানুষের ঘরে ঘরে কম্পিউটার। আমাদের খুবই কপাল খারাপ যে আমরা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত কম্পিউটার দেখাতে পারি না। যাই হোক আমাদের সেই দুঃখের দিন শেষ হতে যাচ্ছে। তোমরা শুনে খুবই খুশি হবে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দেশের সব স্কুলে কম্পিউটার দেয়া হচ্ছে। সেই প্রোগ্রামের আওতায় আমরাও আমাদের স্কুলে একটা কম্পিউটার পেতে যাচ্ছি।"

হেড স্যারের কথা শেষ হওয়া মাত্র ছেলেমেয়েরা সবাই আনন্দের একটা শব্দ করল, এটা ভেজাল সুখবর না, এটা সত্যি সুখবর!

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, "তবে একটা জিনিস সবার মনে রাখতে হবে, কম্পিউটার কিন্তু টেলিভিশনের মতো না, যে টিপ দিলেই প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। নাচ-গান চলতে থাকবে। কম্পিউটার অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা যন্ত্র। এটা ঠিক করে চালাতে জানতে হয়। যারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ তারা কম্পিউটার দিয়ে প্রোগ্রামিং করে। কম্পিউটার দিয়ে চিঠি লেখে, ছবি আঁকে, ই-মেইল করে। ইন্টারনেট করে। সবাই বুঝেছ?"

হেডমাস্টার সাহেব কী বলছেন সেটা বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু সবাই মাথা নাড়ল। হেডমাস্টার সাহেব বললেন,

"আমরাও চাই আমাদের আহাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাও একদিন কম্পিউটার চালাতে শিখবে।"

ছেলেমেয়েরা আবার আনন্দের শব্দ করল, হেডমাস্টার ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বাস দেখে খুশি হলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, আমাদের সায়েন্স টিচার রাজ্জাক সাহেব কম্পিউটারের ওপর ট্রেনিং নিতে আগামী সপ্তাহ ঢাকা যাবেন। তারপর ঢাকা থেকে লোকজন এসে আমাদের স্কুলে কম্পিউটার বসিয়ে দিয়ে যাবে। আমরাও তখন সাবইকে বলতে পারব আমাদের স্কুল তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছেয়ে নাই।

হেটমাস্টার বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত উপরে তুলে একটা ঝাকুনি দিলেন, সব ছেলেমেয়ে তখন আবার তাল মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল। শুধু রাখা চিৎকার না করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কয়েকজন ছেলেমেয়ের জন্য কম্পিউটার আর সেই কম্পিউটারের দায়িত্বে থাকবেন রাজ্জাক স্যার। কোনো ছেলেমেয়ে আর সেই কম্পিউটার ব্যবহার করা দূরে থাকুক ছুঁয়েও দেখতে পারবে না। পুরো ব্যাপাটার মাঝে শুধু একটা ভারো দিক, কম্পিউটারের ট্রেনিং নেবার জন্যে রাজ্জাক স্যার এক সপ্তাহের জন্য ঢাকা থাকবেন, সেই একসপ্তাহ ছেলেমেয়েদের আনন্দ, সেই সপ্তাহে তার পিটুনি খেতে হবে না।

পরের সপ্তাহে স্কুলে একটু উত্তেজনা দেখা গেল। বালতিতে পানির মাঝে চুন গুলিয়ে সেই চুনের পানি দিয়ে দেয়াল হোয়াইট ওয়াশ করার চেষ্টা করা হলো। ফলাফল হলো ভয়ঙ্কর, স্কুলের জায়গায় জায়গায় ক্যাটক্যাটে সারা রঙ্গের কারণ স্কুলটাকে কেমন যে অপরিচিত দেখাতে থাকে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়ে মাঠের আগাছা পরিষ্কার করানো হলো, ক্লাসঘর পরিষ্কার করানো হলো। যেদিন স্কুলের জন্য কম্পিউটার

"তোমরা সবাই পরিষ্কার কাপড় পরে আসবে। খবরদার, কেউ খালি পায়ে আসবে না, জুতো না হয় স্যান্ডেল পরে আসবে। মাথায় তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে আসবে। ঢাকা থেকে যারা আসবেন তারা যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করেন তাহলে সুন্দর করে শুদ্ধ ভাষায় উত্তর দিবে। অনুষ্ঠান চলার সময় তোমরা কেউ গোলমাল করবে না, কথা বলবে না। যা যা বলা হবে সবকিছু মন দিয়ে শুনবে। মনে রেখো তোমরা যদি ঢাকার গেস্টদের মাঝে

একটা ভালো ধারণা দিতে পারো তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আরো কম্পিউটার পাবে।"

পরের দিন স্কুলে যাবার সময় কী মনে হলো কে জানে রাশা রতনের ভিডিও থেকে তৈরি করা সিডিটা তার বইয়ের মাঝে করে স্কুলে নিয়ে এলো।

স্কুলে এসে দেখে সেখানে সাজ সাজ রব। সব ক্লাসঘর থেকে বেঞ্চগুলো বের করে মাঝখানে আনা হয়েছে। স্কুলের বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পেতে বসার জায়গা করা হয়েছে। চেয়ারগুলো টাওয়েল দিয়ে সাজানো। টেবিলে সাদা টেবিল ক্লথ। একপাশে মাইক্রোফোন, বারান্দায় দুটি বড় বড় স্পিকার। যে কম্পিউটারটা স্কুলে দেয়া হবে সেটাকে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কম্পিউটারের পাশে অনেকগুলো সিডি সাজানো। টেবিলের ওপর ফুলদানি, সেই ফুলদানিতে চকচকে প্লাস্টিকের ফুল।

বারান্দায় একটু ভেতরের দিকে একটা বড় সাদা স্ক্রিন। সামনে ছোট একটা টেবিলে একটা ভিডিও প্রজেক্টর। হেডমাস্টার গলায় একটা টাই লাগিয়ে খুব ব্যস্তভাবে হাঁটাহাঁটি করছেন। রাজ্জাক স্যার একটা চকচকে সাফারি স্যুট পরে এসেছেন। স্কুলের অন্য শিক্ষকরাও সেজেগুজে চলে এসেছেন।

ক্লাসঘর থেকে সব বেঞ্চ বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে, ক্লাসে বসার জায়গা নেই তাই সব ছাত্রছাত্রী সেই বেঞ্চে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে। কেউ একজন মাইকটা চালু করে সেটা পরীক্ষা করার জন্যে বলল, "হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি ফোর। ওয়ান টু থ্রি ফোর।"

রাশা দেখতে পেল বেশ কয়েকটা ফুলের তোড়া এনে এক কোনায় রাখা হয়েছে। তখন হঠাৎ করে হেডমাস্টারের কী একটা মনে পড়ল, তিনি ব্যস্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিকে ছুটে এলেন, বললেন, "সর্বনাশ! অতিথিদের ফুলের তোড়া কে দেবে ঠিক করা হয় নাই! ক্লাস নাইনের মেয়েরা কোথায়?"

দেখা গেল ক্লাস নাইনে দুজন মেয়ে কম পড়েছে। তখন ক্লাস এইট থেকে দুজন মেয়ে নেয়া হলো। একজন সানজিদা অন্যজন রাশা। রাশা তখন চোখ বন্ধ করে উপরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "থ্যাংক ইউ আল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।"

অতিথিরা আসতে অনেক দেরি করলেন, সবাই একেবারে অধৈর্য হয়ে গিয়েছিল, শুধু রাশা অধৈর্য হলো না। সে শান্ত মুখে বসে রইল, কেউ টের পেল না তার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা চলন্ত ট্রেনের মতো ধক ধক করে শব্দ করছে।

শেষ পর্যন্ত অতিথিরা এলেন, স্কুলের মাঠে দুইটা গাড়ি এসে থামল, পিছনে পুলিশের একটা গাড়ি। অতিথিরা গাড়ি থেকে নামার পর হেডমাস্টার একেবারে বিগলিত ভঙ্গিতে তাদেরকে স্টেজে নিয়ে এসে বসালেন। এই গরমের ভেতর একজন কোট-টাই পরে এসেছেন, তাকে দেখেই রাশার গরম লাগতে থাকে। একজন পুলিশের পোশাক পরা, তিনি স্টেজে বসতে চাচ্ছিলেন না, হেডমাস্টার জোর করে তাকেও স্টেজে তুলে দিলেন। অতিথিদের অনেক তাড়া, এখান থেকে অন্য একটা স্কুলে যাবেন, কাজেই খুব দ্রুত অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন রাজ্জাক স্যার। তিনি গলা কাঁপিয়ে অতিথিদের সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। এস.পি. এবং ডি.সি. সাহেব যে তাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে এরকম তুচ্ছ একটা স্কুলে চলে এসেছেন সে জন্যে কৃতজ্ঞতা জানতে জানাতে মুখে প্রায় ফেনা তুলে ফেললেন। তারপর তাদের ফুল দিয়ে বরণ করার জন্য মেয়েদের স্টেজে ডাকলেন। রাশা তার বইয়ের ভেতর থেকে সিডিটা নিয়ে রওনা দিল, হাতটা একটু পিছনে রাখল যেন কেউ সেটা লক্ষ না করে। মঞ্চের পাশে গিয়ে ফুলের তোড়াটা হাতে নেয়ার পর সে ফুলের তোড়ার পিছনে সিডিটা লুকিয়ে ফেলল। একজন একজন করে ফুলের তোড়া নিয়ে যাচ্ছে, সেও এগিয়ে গেল, টেবিলের পাশে দিয়ে যাবার সময় সে টুক করে সিডিটা অন্য সিডিগুলোর উপরে রেখে দিল। কোট-টাই পরা মানুষটা তার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা নিয়ে কিছু একটা বললেন, উত্তেজনায় রাশার বুক এমন ধুকপুক করছিল যে কী বলেছেন সে ঠিক ভালো করে শুনতেও পেল না।

রাশা আবার তার জায়গায় এসে বসে চোখ বন্ধ করে উপরের দিকে তাকাল, বিড়বিড় করে বলল, "হে খোদা। আমার কাজটা আমি করেছি বাকিটা তোমার দায়িত্ব। তুমি বাকিটা করে দাও, প্লিজ।"

সবাইকে দিয়ে বক্তৃতা দেয়ানোর একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু কোট-টাই পরা মানুষটি তার মাঝে যেতে চাইলেন না, সামনে বসে থাকা কমবয়সী একটা মানুষকে কী যেন ইঙ্গিত করলেন, সেই মানুষটা তখন তড়াক করে লাফ দিয়ে স্টেজে উঠে মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। মানুষটা হাসি-খুশি আর কথা বলে সুন্দর করে, সবাই তাই বেশ আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনতে থাকে। মানুষটা বলল, "এইখানে বেশিরভাগ হচ্ছে বাচ্চা ছেলেমেয়ে! বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বক্তৃতা দুই চোখে দেখতে পারে না, তাই আজকে কোনো বক্তৃতা হবে না! আমরা সরাসরি মজার জায়গায় চলে যাব। মজার জিনিসটা কী কে বলতে পারবে?"

সবাই একসাথে চিৎকার করে বলল, "কম্পিউটার!"

মানুষটা হাসিমুখে বলল, "ভেরি গুড! এবারে বলো দেখি কম্পিউটার দিয়ে কী কী করা যায়?"

ছাত্রছাত্রীরা চুপ করে বসে রইল। একজন ভয়ে ভয়ে বলল, "হিন্দি সিনেমা দেখা যায়!"

মানুষটা হেসে ফেলল, বলল, "যদি বলতে সিনেমা দেখা যায় তাহলেও একটা কথা ছিল, একেবারে হিন্দি সিনেমা! অবশ্যি তোমাকে দোষ দিই কেমন করে– তুমি নিশ্চয়ই কোনো দোকানে দেখেছ কম্পিউটারে হিন্দি সিনেমা দেখাচ্ছে! ঠিক আছে, এবারে বলো আর কী করা যায়?"

একজন বলল, "চিঠি লেখা যায়!"

মানুষটা বলল, "ভেরি গুড! চিঠি লেখা যায়। আর কী করা যায়?"

আরেকজন বলল, "ছবি আঁকা যায়।"

"আর কী করা যায়?"

"গেম খেলা যায়।"

"আর কী করা যায়?"

রাশা ইচ্ছে করলেই কম্পিউটার দিয়ে কী করা যায় সেরকম কয়েক ডজন কাজের কথা বলতে পারত, কিন্তু সে কিছু বলল না।

মানুষটা অনেকগুলো কাজের কথা শুনে শেষ পর্যন্ত বলল, "তোমরা যে কয়টা কাজের কথা বলেছ কম্পিউটার দিয়ে তার সবগুলো করা যায়– শুধু যে সেগুলো করা যায় তা নয়, সেগুলো ছাড়াও আরো অনেক কাজ করা যায়! আমি সেগুলো নিয়ে বকবক না করে তোমাদের দেখাব। ঠিক আছে?"

সবাই চিৎকার করে বলল, "ঠিক আছে।"

মানুষটা কম্পিউটারের পাশে রাখা সিডিগুলো এবারে হাতে তুলে নেয়, সাথে সাথে রাশার বুকটা ধক করে উঠল। মানুষটা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলল, আমি তোমাদের জন্যে অনেকগুলো সিডি নিয়ে এসেছি, এর মাঝে কোনোটা গেম, কোনোটা এনসাইক্লোপিডিয়া, কোনোটা বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট, কোনোটা গান, কোনোটা ছবি আঁকার প্রোগ্রাম! আমি এখন সেগুলো তোমাদের একটু একটু করে দেখাব। বলো তোমরা কোনটা আগে দেখতে চাও?"

বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে চিৎকার করে উঠল, "গেম! গেম !"

মানুষটা সিডিগুলোর উপর চোখ বুলাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল, রাশার রেখে আসা সিডিটা হাতে নিয়ে বলল, "কী ইন্টারেস্টিং, এখানে একটা নতুন সিডি! কেউ একজন রেখে গেছে, উপরে লেখা আমাদের স্কুল! তার মানে তোমাদের স্কুলের ওপরে কেউ একটা কিছু তৈরি করেছে। এটা দিয়েই শুরু করা যাক। কী বলো? দেখি তোমাদের স্কুল কী রকম!"

হেডমাস্টারকে এবারে খানিকটা বিভ্রান্ত দেখা গেল, গলা নামিয়ে রাজ্জাক স্যারকে বিষয়টা গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাজ্জাক স্যার বললেন তিনি এটা সম্পর্কে কিছু জানেন না। তাদের দুজনকেই এবারে খানিকটা দুশ্চিন্তিত দেখাতে থাকে।

কম্পিউটারের মানুষটা তখন সিডিটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিয়ে মাইক্রোফোনে বলল, "কম্পিউটারের মনিটর হয় ছোট। শুধু একজন সেটা দেখতে পারে। আজকে আমরা যেন সবাই দেখতে পারি সে জন্যে একটা ভিডিও প্রজেক্টর এনেছি, একটা বড় স্ক্রিন এনেছি। এখন আমরা সবাই দেখতে পারব। একসাথে দেখতে পারব।"

রাশা নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলল, উত্তেজনায় তার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তক্ষুণি স্পিকার থেকে রাজ্জাক স্যারের বিকট গলায় চিৎকার শোনা গেল, "শুওরের বাচ্চা, হারামজাদা!"

স্টেজে বসে থাকা অতিথিরা, সামনে বসে থাকা স্যার-ম্যাডামরা আর বেঞ্চে বসে থাকা কয়েকশ ছেলেমেয়ে একসাথে চমকে উঠল। সবাই চোখ বড় বড় করে স্ক্রিনের দিকে তাকায়, সেখানে রাজ্জাক স্যারকে দেখা যায়, হাতে একটা বেত নিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "খুন করে ফেলব আমি তোরে। বেতিয়ে শরীরের চামড়া তুলে ফেলব, পিটিয়ে লাশ করে ফেলব।"

সবাই চোখ বড় বড়
করে দিকে তাকায়

সবাই দেখল রাজ্জাক স্যার তার হাতের বেত নিয়ে একটা ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তারপর অমানুষের মতো তাকে মারতে লাগলেন। নিজের চোখে না দেখলে কেউ এটা বিশ্বাস করবে না। স্টেজে বসে থাকা অতিথিরা, সামনে বসে থাকা স্যার, ম্যাডামেরা আর কয়েকশ ছেলেমেয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাশা রাজ্জাক স্যারের দিকে তাকিয়েছিল, সে দেখল স্যার লাফিয়ে উঠলেন, কম্পিউটারের দিকে ছুটে গিয়ে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। চিৎকার করে একবার বললেন, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এখানে?"

কেউ তার কথা শুনল না, কম্পিউটারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল। সবাই দেখল, রাজ্জাক স্যার ছেলেটাকে মারছেন, ছেলেটা হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল, তাতে স্যার যেন আরো খেপে গেলেন, তখন চুলের মুঠি ধরে তাকে বেঞ্চের ওপর প্রায় শুইয়ে ফেলে মারতে লাগলেন। বেতের শপাং শপাং শব্দ তার সাথে ছেলেটার কাতর চিৎকার।

হঠাৎ ভিডিও স্ক্রিনে রাশার তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, "স্যার!"

সকল দর্শক চমকে উঠে চোখ বড় বড় করে তাকাল। স্ক্রিনে দেখা গেল রাজ্জাক স্যার ঘুরে তাকিয়েছেন। তাকে দেখতে অবিকল একটা জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে। হিংস্র গলায় বললেন, "কে?"

রাশাকে দেখা গেল না, শুধু তার কথা শোনা গেল, "আমি স্যার।"

"কী হয়েছে?"

"আপনি এভাবে ওকে মারতে পারেন না।"

সবাই চোখ বড় বড় করে দেখার চেষ্টা করছে কোন মেয়ের এত সাহস, কোন মেয়ে এভাবে কথা বলছে। স্ক্রিনে তাকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু রাজ্জাক স্যারকে দেখা যাচ্ছে। রাজ্জাক স্যার যখন রাশার কাছে হাজির হলেন তখন স্ক্রিনে প্রথমবার রাশাকে দেখা গেল, একটু পিছন থেকে কিন্তু তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এরকম সময় রাজ্জাক স্যার স্টেজে ছুটে এসে আবার কম্পিউটারটা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। কম্পিউটারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা

মানুষটা তাকে এত জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল যে রাজ্জাক স্যার স্টেজ থেকে পড়তে পড়তে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিলেন।

সবাই দেখল রাজ্জাক স্যার কিভাবে শপাং শপাং করে বেত দিয়ে রাশার হাতটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। সবাই দেখল কিভাবে সব ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, কিভাবে রাজ্জাক স্যার হঠাৎ করে থেমে গেলেন, কিভাবে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলেন, কিভাবে রাশা কান্নায় ভেঙে পড়ল, কিভাবে ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে ছুটে এলো তার কাছে। এরকম জায়গায় ভিডিওটা শেষ হয়ে হঠাৎ করে স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে গেল।

কেউ কোনো কথা বলল না, সবাই নিজের জায়গায় পাথরের মতো বসে রইল। রাশা দেখল কোট-টাই পরে থাকা মানুষটা খুব সাবধানে তার টাইটা দিয়ে চোখ মুছলেন। হেডমাস্টার মাথা নিচু করে বসে রইলেন। শুধু রাজ্জাক স্যারকে দেখা গেল কিছু একটা বলতে চাইছেন কিন্তু বলতে পারছেন না, তার মুখ ফ্যাকাসে এবং বিবর্ণ, মনে হচ্ছে বিশাল একটা কুৎসিত পোকা।

কোট-টাই পরা মানুষটা কিছু একটা বললেন, কিন্তু সামনে মাইক্রোফোন নেই বলে তার কথাটা শোনা গেল না। কম্পিউটারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা স্ট্যান্ড থেকে মাইক্রোফোনটা খুলে তার হাতে ধরিয়ে দিল। কোট-টাই পরা মানুষটা বললেন, "আমরা স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি, বড় বড় কথা বলছি– কিন্তু কী লাভ? আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা রাক্ষসের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি! সেই রাক্ষসেরা আমাদের ছেলেমেয়েদের মেরে ফেলছে, খুন করে ফেলছে, আমরা সেটা জানি না! কী লাভ তাহলে? কী লাভ?"

কোট-টাই পরা মানুষটা হেডমাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, "হেডমাস্টার সাহেব। আপনার স্কুলে এই ভাবে ছেলেমেয়েদের মারা হয় আপনি সেটা জানেন না? আপনি কিসের হেডমাস্টার? আপনার হাতে আমরা কিভাবে ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব দিব? কিভাবে?"

হেডমাস্টার বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। কোট-টাই পরা মানুষটা পুলিশের পোশাক পরা মানুষটাকে বলল,

"এস. পি. সাহেব, আপনি এই রাক্ষসটাকে ধরেন, বুক করেন। চৌদ্দ বছরের আগে যদি জেলখানা থেকে ছাড়া পায়–"

রাজ্জাক স্যার তখন পাগলের মতো ছুটে এসে হাউমাউ করে কোট-টাই পরা মানুষটার পা ধরার চেষ্টা করতে থাকেন। কোট-টাই পরা মানুষটা তখন রাজ্জাক স্যারকে এত জোরে একটা ধমক দিলেন যে সারা স্কুল কেঁপে উঠল, "খবরদার! আমাকে তুমি যদি স্পর্শ করো আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে বললেন, "সরিয়ে নিয়ে যাও একে। সরিয়ে নাও। আমি কোনো নাটক দেখতে চাই না।"

তখন বেশ কয়েকজন মানুষ রাজ্জাক স্যারকে ধরে সরিয়ে নিল। কোট-টাই পরা মানুষটা এতক্ষণ বসে বসে কথা বলছিলেন, এবার মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর হেঁটে হেঁটে সামনে এসে থামলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানী মানুষ কারা জানো? সবচেয়ে সম্মানী মানুষ হচ্ছে শিক্ষক, বুঝেছ? একজন শিক্ষককে কোনোভাবে অসম্মান করতে হয় না। যদি সেই শিক্ষক নিজেকে নিজে অসম্মান করেন তখন আমরা কিছু করতে পারি না, আমরা খুব মনে কষ্ট পাই কিন্তু কিছু করতে পারি না। যাই হোক, আমার প্রিয় ছেলেমেয়েরা, আজকে আমি খুব মনে কষ্ট পেয়েছি। এ রকম যদি একটা ঘটনা ঘটে তাহলে দেশে আরো যে আশি হাজার স্কুল আছে, সেখানেও নিশ্চয়ই এরকম ঘটনা ঘটে। হয়তো এখন এই মুহূর্তে কোনো স্কুলে কোনো ছেলেকে কিংবা কোনো মেয়েকে কোনো একজন স্যার মারছেন! চিন্তা করতে পারো? আমরা দেশের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আছি। খোদা কি আমাদের মাফ করবেন? করবেন না। খোদা আমাদের মাপ করবেন না।"

মানুষটা একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "খুব মন খারাপ হয়েছে সত্যি কথা, তারপরেও কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমার বুকটা ভরে গেছে। এইটুকুন একটা মেয়ে, কী তার সাহস, সে কী রকম তাঁর বন্ধুকে রক্ষা করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল, কিভাবে মার খেল তবু সে পিছিয়ে গেল না।

মাই গুডনেস্! তুমি এখানে আছ কি না আমি জানি না, তুমি যদি থাকো মা তোমাকে স্যালুট।" বলে কোট-টাই পরা মানুষটা হাত তুলে স্যালুট করার ভঙ্গি করলেন।

সব ছেলেমেয়ে হাততালি দিতে থাকে, কয়েকজন রাশাকে ঠেলে দাঁড়া করানোর চেষ্টা করে, রাশা উঠল না, মাথা নিচু করে বসে রইল।

কোট-প্যান্ট পরা মানুষটা বললেন, "তোমরা যখন বড় হবে, যখন এই দেশের দায়িত্ব নিবে তখন কোনো ছেলেমেয়ে আর ক্লাসরুমে কষ্ট পাবে না। দুঃখ পাবে না। ঠিক আছে?"

ছেলেমেয়েরা মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

"কথা দাও।"

সবাই মাথা নেড়ে কথা দিল। এরকম সময় কম্পিউটারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি এসে কোট-টাই পরা মানুষটার সাথে কথা বলল, কিছু একটা হিসাব করল, তারপর মাথা নাড়ল, আবার কথা বলল, তারপর আবার মাথা নাড়ল, তারপর মনে হলো দুজনে কোনো একটা বিষয়ে একমত হলো। কমবয়সী মজার মানুষটা তখন কোট-টাই পরা মানুষটার হাত থেকে মাইক্রোফোনটা নিয়ে বলল, "আমার ওপর দায়িত্ব ছিল তোমাদের কম্পিউটার দেখানো। কম্পিউটার দিয়ে কিভাবে তথ্যপ্রযুক্তি করতে হয় সেটা বোঝানো! আমি কী দেখলাম? আমি দেখলাম, তোমরা আমার থেকে কম্পিউটার অনেক ভালো বোঝো! তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তোমরা বিশাল একটা অন্যায়কে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ। কাজেই তোমাদের আমার শেখানোর কিছু নাই, উল্টো আমি তোমাদের কাছ থেকে আজকে অনেক কিছু শিখে গেলাম।"

ছেলেমেয়েরা খুশিতে হাততালি দিতে থাকে। মানুষটা বলল, "আমি স্যারের সাথে কথা বলেছি। স্যারকে বলেছি এই স্কুল যখন কম্পিউটারের এত সুন্দর ব্যবহার করে এদের মাত্র একটা কম্পিউটার দিলে কি হয়? এদের বেশি করে কম্পিউটার দিতে হবে! বলো তোমরা কয়টা কম্পিউটার চাও?"

সামনে বসে থাকা একজন চিৎকার করতে লাগল, "দশটা! দশটা!"

"মাত্র দশটা? আমরা তোমাদের তিরিশটা কম্পিউটার দিব! তিরিশটা!"

ছেলেমেয়েদের চিৎকারে মানুষটার কথা চাপা পড়ে গেল। তারা উঠে দাঁড়িয়ে লাফাতে থাকে। ছেলেমেয়েরা একটু শান্ত হলে মানুষটা বলল, "আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমাদের স্কুলে এতগুলো কম্পিউটার রাখার জায়গা নাই, তাই স্যার বলেছেন, ওই কোনায় একটা ঘর তুলে দেবেন। সেটা হবে তোমাদের কম্পিউটার ল্যাবরেটরি।

ছেলেমেয়েগুলোর সাথে এবারে স্যার আর ম্যাডামরাও আনন্দে লাফাতে লাগলেন। শুধু রাশা চুপ করে বসে রইল। তার মনে হতে লাগল সে বুঝি আর বাচ্চা মেয়ে না। সে বুঝি অনেক বড় হয়ে গেছে। তার বুঝি আর লাফ-ঝাঁপ করা মানায় না।

শুধু তার মুখে একটা হাসি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে।

মটকু মিয়া এবং অন্যেরা

পুকুর ঘাটের একপাশে বুকপানিতে রাশা দাঁড়িয়ে আছে, অন্যপাশে জয়নব। জয়নব রাশাকে সাঁতার শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে, গত কয়েকদিন থেকে তার প্র্যাকটিস চলছে।

জয়নব বলল, "মাথাটা ডুবিয়ে তুই আমার কাছে চলে আয়।"

রাশা বলল, "বলা খুব সোজা। মাথা ডুবিয়ে চলে আসব কিভাবে? মাথা ডোবালে নাকে-মুখে-চোখে পানি ঢুকে যাবে না?"

জয়নব বলল, "না যাবে না। মাথা ডুবিয়ে সাঁতার শেখা সবচেয়ে সোজা। যখন শিখে যাবি তখন আস্তে আস্তে মাথাটা পানি থেকে বের করা শিখবি। আয়, চলে আয়।"

রাশা বলল, "ভয় করে।"

জয়নব বলল, "ভয়ের কী আছে? আমি আছি না? আয়।"

রাশা বলল, "তবু ভয় করে।"

জয়নব বলল, "তুই হচ্ছিস একটা ভীতুর ডিম! ঠিক আছে আমি কাছে আসছি, আমি তোকে ধরে রাখছি, এখন আয়।"

রাশা জয়নবকে ধরে হাত-পা ছুড়ে অনেক পানি ছিটিয়ে সাঁতার দেয়ার চেষ্টা করল, তার ফলে যেটা ঘটল সেটাকে আর যাই হোক সাঁতার দেয়া বলে না।

এ রকম সময় জিতু এসে হাজির, সে খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে রাশার হাত-পা ছুড়ে সাঁতার দেয়ার চেষ্টাটা দেখল, তারপর হি হি করে

সে খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে রাশার
হাত-পা ছুড়ে সাঁতার দেয়ার চেষ্টাটা দেখল।

হাসতে শুরু করল। রাশা তার পানি ছিটানো বন্ধ করে বলল, "কী হয়েছে? তুই এরকম দাঁত কেলিয়ে হাসছিস কেন?"

"তুমি যদি এইভাবে আরো কয়দিন সাঁতার শেখার চেষ্টা করো তাহলে পুকুরের সব পানি পাড়ে উঠে যাবে।"

"ঢং করবি না। তুই যখন প্রথম সাঁতার শিখেছিলি তখন তুইও নিশ্চয়ই এইভাবে সাঁতার শিখেছিলি।"

জিতু মিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু আমি সাঁতার শিখেছি এক ঘণ্টায়।"

"মিছে কথা বলবি না। মানুষ একঘণ্টায় সাঁতার শিখতেই পারে না।"

"আমি শিখেছিলাম।"

"কিভাবে?"

"আমার বাবা আমাকে ধরে পানিতে ফেলে দিয়েছিল।"

"কী করেছিল?"

"পানিতে ফেলে দিয়েছিল।"

রাশা চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই সাঁতার জানিস না আর তোর বাবা তোকে পানিতে ফেলে দিল?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"আমি পানি খেতে খেতে ডুবে গেলাম। যখন মরে যাচ্ছি তখন বাবা ঘাড় ধরে ওপরে তুলেছে। একটু নিশ্বাস নিয়ে যখন ঠিক হয়েছি, তখন আবার পানিতে ফেলে দিল।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি তখন জান বাঁচানোর জন্যে কোনোমতে ভাসার চেষ্টা করি– যখন পারি না ডুবে যাই, নাকে দিয়ে মুখে দিয়ে পানি ঢোকে তখন বাবা ঘাড় ধরে টেনে তোলে। নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু সময় দেয়। দুই-একবার নিশ্বাস নেবার পর আবার পানিতে ছুড়ে ফেলে দেয়।"

"খবরদার মিছে কথা বলবি না।"

"খোদার কসম, মিছা কথা না। এইভাবে কয়েকবার করার পর ভেসে থাকা শিখে গেলাম। একঘণ্টার মাঝে।"

রাশা বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "কী সর্বনাশ! তোর বাবার বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করা উচিত ছিল।"

জিতু হি হি করে হেসে বলল, "রাশাপু তুমি আজিব! এক্কেবারে আজিব।"

রাশা বলল, "ঠিক আছে আমি আজিব হলে আজিব। তুই আমাকে ডিস্টার্ব করবি না।"

জিতু খানিকক্ষণ রাশার সাঁতার শেখার কসরত দেখে হতাশভাবে মাথা নেড়ে জয়নবকে বলল, "জয়নব বুবু তুমি রাশাপুকে সাঁতার শেখাতে পারবে না। আমার কাছে দাও, আমি শিখিয়ে দিই।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে শিখাবি?"

"ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দিব। রাশাপু একটু পানি খেয়েটেয়ে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠবে।"

রাশা চিৎকার করে উঠল, "জিতু, তোকে আমি খুন করে ফেলব। এক্কেবারে খুন করে ফেলব। খবরদার আমার কাছে আসবি না। আমার একশ মাইলের ভিতরে তুই আসবি না।"

জিতু রাশার আতঙ্কটা উপভোগ করে হি হি করে খানিকক্ষণ হাসল তারপর নিজের শার্ট খুলে পুকুর ঘাটে রেখে ঝপাং করে একটা লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর ভুস করে পুকুরের মাঝামাঝি সে ভেসে ওঠে। দেখে মনে হয় সে যে পানিতে আছে সেটা তার মনেই নেই। হাত-পা কিছু না নাড়িয়ে পানিতে সে শুয়ে থাকতে পারে, কে জানে মনে হয় ঘুমিয়েও যেতে পারে। রাশা জিতুর দিকে হিংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে!

অনেকবার অনেকভাবে চেষ্টা করেও রাশা যখন কোনোভাবেই ভেসে থাকতে পারল না, যখন সে প্রায় সাঁতার শেখার আশা ছেড়েই দিল ঠিক তখন সে হঠাৎ করে খানিকটা জায়গা পানিতে ভেসে চলে এলো। জয়নব খুশি হয়ে বলল, "এই তো হয়ে গেছে! তোর আর কোনো চিন্তা নাই! তুই এইবারে সাঁতার শিখে যাবি।"

রাশা চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি!"

জয়নবের কথা সত্যি বের হলো। গত কয়েকদিন রাশা কতবার কতভাবে ভাসার চেষ্টা করেছে, পারেনি, এখন হঠাৎ করে সে ভেসে থাকতে পারছে। ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব রাশা কিছুতেই বুঝতে পারল না, একটা মানুষ একসময় ভেসে থাকতে পারে না, পানিতে ছেড়ে দিলে মারবেলের মতো ডুবে যায়। সেই মানুষটাই আবার একসময় পানিতে ভেসে থাকতে পারে তাকে তখন চেষ্টা করেও ডোবানো যায় না! জিতুকে দেখেছে শরীরের একটা আঙুলও না নাড়িয়ে সে পানিতে ভেসে থাকে!

পরের কয়েকদিন রাশাকে পানি থেকে সহজে তোলা গেল না। পানিতে ডুবে থাকতে থাকতে তার আঙুলগুলি হয়ে যেত শুকনো কিশমিশের মতো, যখন পানি থেকে শেষ পর্যন্ত সে উঠত তখন তার চোখ হতো টকটকে লাল এবং তার চারপাশের সবকিছু কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাত! আজকাল যখন সে খেতে বসে তখন আবিষ্কার করে তার খিদে পায় রাক্ষসের মতো, পিঁড়িতে বসে সে একগাদা ভাত খেয়ে ফেলে! প্রথম যখন সে এখানে এসেছিল তার গায়ের রং ছিল ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো বর্ণহীন ফর্সা, এখন তার গায়ের রং হয়েছে তামাটে বাদামি। সেখানে বিচিত্র একধরনের সজীবতা, রাশা নিজেকে দেখে নিজেই কেমন অবাক হয়ে যায়। তিন মাইল হেঁটে স্কুলে যায়, তিন মাইল হেঁটে ফিরে আসে, সাঁতরে পুকুর এপার-ওপার করতে পারে অবলীলায়। নিজের ভেতরে সে কেমন যেন শক্তি অনুভব করে। দৈহিক একধরনের শক্তি। যে শক্তি তার আগে কখনো ছিল না।

সাঁতার শেখার পর রাশা গাছে ওঠা শেখায় মন দিল। এখানে তার ওস্তাদের দায়িত্ব পালন করল মতি। রাশা আবিষ্কার করল গাছে চড়তে শেখা সাঁতার শেখার মতো এত কঠিন না। কাজটা অনেক সহজ, গাছে চড়ার জন্যে দরকার খানিকটা সাহস আর অনেকখানি আত্মবিশ্বাস। জয়নব রাশাকে সাঁতার শিখিয়েছে অনেক আগ্রহ করে কিন্তু দেখা গেল তার গাছে চড়ার ব্যাপারে জয়নবের আগ্রহ অনেক কম। রাশা যখন পেয়ারা গাছ, আমগাছ চড়া শেষ করে একটা নারকেল গাছে চড়া শেখার চেষ্টা করতে লাগল, তখন জয়নব তাকে বাধা দিল। বলল, "দেখ রাশা, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

"কোনটা?"

"এই যে নারকেল গাছে ওঠা শেখার চেষ্টা করছিস।"

"কেন? এটা বাড়াবাড়ি কেন?"

"সবকিছুর একটা নিয়ম আছে। কিছু কিছু কাজ হচ্ছে পুরুষ মানুষের, কিছু কিছু কাজ মেয়ে মানুষের।"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "এটা সত্যি না। যে কাজ পুরুষ মানুষ করতে পারে, সেই কাজ মেয়ে মানুষেও পারে।"

"ঠিক আছে তুই তাহলে একজন মেয়ে মানুষকে বল দাড়ি কামাতে।"

রাশা মুখ শক্ত করে বলল, "সেটা অন্য জিনিস। মেয়েদের দাড়ি না উঠলে সেটা কামাবে কেমন করে?"

"মোটেও অন্য জিনিস না। কিছু কিছু জিনিস মেয়েদের করা ঠিক না। মেয়েদের নারকেল গাছে ওঠা ঠিক না।"

"কেন?"

"তুই চিন্তা করে দেখ, বানরের মতো তুই নারকেল গাছে উঠছিস, পা বাঁকিয়ে গাছটাকে খিমচে ধরে রাখছিস, দৃশ্যটা কী সুন্দর হলো? মোটেও সুন্দর দৃশ্য না। দৃশ্যটা জঘন্য!"

রাশা এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার মানুষ না, কিন্তু জয়নব তখন অন্য একটা কায়দা করল। সে রাশার ওস্তাদ মতিকে ভয় দেখিয়ে বলল, মতি যদি রাশাকে নারকেল গাছে ওঠার তালিম দেয় তাহলে জয়নব তার ঠ্যাং ভেঙে দেবে! জয়নব চুপচাপ মানুষ কিন্তু তার পরিচিতরা তাকে বেশ সমীহ করে চলে। তাই মতি পিছিয়ে গেল, রাশার আর নারকেল গাছে চড়া শেখা হলো না।

মতি তাকে নারকেল গাছে চড়া না শেখালেও অন্য একটি জিনিস শেখাল সেটা হচ্ছে পাখি ধরার ফাঁদ দিয়ে বক ধরা। ফাঁদটা সে তৈরি করে নিজে। এক-দেড় হাত লম্বা একটা গাছের ডাল কেটে নেয় যেটা সামনে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ডালের একমাথায় সাইকেলের একটা স্পোক গেঁথে নেয়। স্পোকের মাথায় শক্ত সুতোয় একট ফাঁস লাগানো থাকে, পাখির খাবার জন্যে কিছু একটা রাখা হয়, বক যখন সেখানে ঠোকর দেয় সাথে সাথে তার গলায় ফাঁসটা আটকে যায়। পাখির এই ফাঁদের সবকিছুই রাশা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখেছে, কিন্তু যখন তার খাবারটা দেখল তার গা গুলিয়ে এলো। সেখানে রাখা হয়েছে জীবন্ত এবং পুরুষ্ট একটা তেলাপোকা!

মতির সাথে সাথে রাশা ধানক্ষেতে গিয়ে ফাঁদ পেতে এসেছে তারপর দূরে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করেছে। মতি বলেছে বক ধরা খুব সহজ নয়, দুই-চারদিনে হয়তো একটা বক ধরা পড়বে, কিন্তু রাশার কপাল ভালো প্রথম দিনেই একটা বক ধরা পড়ল। ফাঁদে আটকে পড়ে বকটা যখন ছট ফট করছে তখন মতির সাথে সাথে রাশা ছুটে গিয়েছে, গলা থেকে ফাঁস খুলে মতি শক্ত করে বকটাকে ধরে রেখে রাশাকে বলল, "রাশাবু, বক থেকে খুব সাবধান।"

"কেন?"

"বক কিন্তু ঠোকর দিয়ে তোমার চোখ গেলে দেবে।"

মতির হাতে বকটাকে দেখে এত শান্তশিষ্ট আর নিরীহ মনে হচ্ছিল যে রাশার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এই বক ঠোকর দিয়ে কারো চোখ গেলে দিতে পারে। তারপরেও সে সাবধানে থাকল। মতি তাকে বকটা দিয়ে এটাকে পোষার জন্যে কী করতে হবে, দুই বেলা কখন কী খাওয়াতে হবে সবকিছু বলে দিল।

রাশা বকটাকে বাড়ি এনে একটা ঝাঁপির নিচে আটকে রাখল। মতির উপদেশমতো সে তাকে খেতে দিয়েছে কিন্তু বকটা সেই খাবার ছুঁয়েই দেখল না। সারাক্ষণ সে ঝাঁপির ভেতরে অস্থিরভাবে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হেঁটে বেড়াতে লাগল। পারবে না জেনেও বকটা বারবার বের হয়ে যাবার চেষ্টা করে। মানুষের যখন মন খারাপ হয় তখন তার মুখ দেখে বোঝা যায় পাখিদের বেলায় সেরকম কিছু নেই। বকটার চোখ-মুখ দেখে বোঝার কোনো উপায়ই নেই যে তার মন খারাপ, কিন্তু সারাক্ষণ তার হাঁটাহাঁটি দেখে বোঝা যাচ্ছে তার মনটা খুব খারাপ। হয়তো এই বকটা মা-বক, তার বাচ্চাদের রেখে তাদের জন্যে খাবার নিতে এসেছিল। হয়তো এখন তার বাচ্চারা মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে, মা আর আসছে না। ব্যাপারটা চিন্তা করে রাশার কেমন জানি মন খারাপ হয়ে গেল। বিকেলবেলা সে ঝাঁপির ভেতর হাত ঢুকিয়ে বকটাকে বের করে এনে গায়ে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তোকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তুই তোর বাচ্চাদের কাছে যা। যাবার সময় দুইটা টেংরা মাছ ধরে নিয়ে যাস। ঠিক

আছে? আর শোন, একটু ভদ্র ব্যবহার করা শিখবি। ঠোকর দিয়ে মানুষের চোখ গেলে দেওয়া এইটা আবার কী রকম অভ্যাস। আর যদি এটা শুনি তাহলে কিন্তু ভালো হবে না–"

তারপর রাশা বকটাকে উপরের দিকে ছুড়ে দিল, সাথে সাথে সেটা ডানা ঝাঁপটিয়ে উঠে যায়, মাথার উপরে একটা চক্কর দিয়ে সেটা ধানক্ষেতের দিকে উড়ে গেল। রাশার স্পষ্ট মনে হলো সেটা তার মাথার উপর চক্কর দিয়েছে তাকে থ্যাংকু বলার জন্যে।

রাশা জিতুর কাছ থেকে শিখল কেমন করে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে হয়। মাছ ধরার জন্যে দরকার টোপ আর জিতুর মতে মাছের সবচেয়ে পছন্দের টোপ হচ্ছে কেঁচো। শুনেই রাশার গা ঘিন ঘিন করে উঠল, কিন্তু তার পরেও সে জিতুর পিছে পিছে গেল। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছোট ছোট যে মাটির ঢিবি সেগুলো নাকি কেঁচোর পেট থেকে বের হয়েছে। একটা কোদাল দিয়ে সেরকম একটা জায়গায় কোপ দিতেই অসংখ্য ছোট-বড় মাঝারি কেঁচো কিলবিল করে বের হয়ে এলো। একটা কচু পাতায় খানিকটা মাটি রেখে তার মাঝে জিতু কয়েকটা পুরুষ্ট কেঁচো এনে ছেড়ে দেয়। তারপর দুটো ছিপ আর মাছ রাখার জন্যে একট চোপড়া নিয়ে সে রাশাকে নিয়ে বের হয়ে গেল। গ্রামের এক কোনায় গাছগাছালি দিয়ে ঢাকা একটা মজা পুকুরে এসে জিতু ছিপ ফেলল। ছিপের বড়শিতে টোপ লাগানোর বিষয়টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। জিতু নখ দিয়ে ঘামচি মেরে কেঁচোর খানিকটা ছিঁড়ে নেয় তারপর সেটা বড়শিতে গেঁথে ফেলে। রাশা অবাক হয়ে দেখে যে অংশটা ছিঁড়ে বড়শিতে লাগানো হয়েছে আর যে অংশটা রয়ে গেছে দুটোই কিলবিল করে নড়ছে। কী আশ্চর্য! কী ঘেন্না!

ছিপ ফেলে রাশা ফাতনার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পর হঠাৎ সেটা টুকটুক করে নড়তে থাকে। জিতু বলল, "মাছ ঠোকরাচ্ছে।"

"তুলব?"

"না– না– এখনই না। যখন ফাতনা ডুবে যাবে তখন।"

রাশা অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু ফাতনা আর ডোবে না। শেষে ছিপটা তুলে দেখে মাছ টোপটা খেয়ে চলে গেছে! জিতু বলল, "মাছদের অনেক বুদ্ধি! খুব সাবধানে শুধু টোপটা খায়, বড়শিটা গিলে না।"

রাশা বলল, "এখন কী করব?"

"নূতন করে টোপ লাগাও।"

"আমি?"

"নয়তো কে? মাছ ধরতে এসেছ তুমি আর টোপ লাগাবে আরেকজন?"

রাশা জীবনে কখনো কল্পনা করে নি যে সে নখ দিয়ে লাল রঙের পুরুষ্ট একটা কেঁচোকে ছিঁড়ে ফেলবে। সেটা তার হাতে কিলবিল করতে থাকবে এবং সে চিৎকার না দিয়ে শান্তভাবে ছেঁড়া অংশটা বড়শিতে গেঁথে ফেলবে। কিন্তু সে সেটাই করল এবং সেটা করার সময় সে ঘেন্নায় বমি পর্যন্ত করে দিল না।

দ্বিতীয়বার ছিপটা ফেলার কিছুক্ষণের ভেতরেই ফাতনাটা নড়তে থাকে তারপর হঠাৎ সেটা ডুবে গেল, সাথে সাথে রাশা টান মেরে ছিপটা তুলে ধরে! আর কী আশ্চর্য ছিপের মাথায় কুচকুচে কালো রঙের ভয়ঙ্কর একটা মাছ কিলবিল কিলবিল করছে।

জিতু আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ইস! কত বড় মাগুর মাছ।"

"এইটা মাগুর মাছ? দেখে তো সাপের ভাতিজা মনে হচ্ছে।

"ধুর। সাপের ভাতিজা কেন হবে? এটা মাগুর মাছ। মাগুর মাছ খেতে খুব মজা।"

মাগুর মাছটা ছটফট করতে থাকে, জিতু মুখ থেকে বড়শিটা খুলে থলুইয়ের ভেতর রেখে দেয়। রাশা অবাক হয়ে মাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে– তার জীবনের প্রথম ধরা একটি মাছ। কুতকুতে দুটি চোখে সেই মাছ তার দিকে তাকিয়ে আছে। রাশা বলল, "আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী?"

"এটা আসলে মাছ না।"

"এটা তাহলে কী?"

"এটা আসলে একটা রাজকন্যা।"

"রাজকন্যা?"

"হ্যাঁ। একজন সন্ন্যাসী অভিশাপ দিয়ে এটাকে মাগুর মাছ বানিয়ে ফেলে এই পুকুরের নিচে রেখে গেছে।"

জিতু মিয়ার চোখে পরিষ্কার একটা ভয়ের ছাপ পড়ল, সে শুকনো গলায় বলল, "তোমার তাই মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। দেখছিস না কেমন করে তাকাচ্ছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছে বলতে চাইছে আমাকে ছেড়ে দাও, পিজ ছেড়ে দাও। যখন আমার অভিসাপ কেটে যাবে তখন আমি আবার রাজকন্যা হয়ে যাব। কিন্তু যদি কেটেকুটে খেয়ে ফেল তাহলে আর রাজকন্যা হতে পারব না।

রাশা এমন করে গলার মাঝে আবেগ দিয়ে কথাটা বলল যে জিতু বিভ্রান্ত হয়ে গেল। বলল, তাহলে কী করব? ছেড়ে দেব?

রাজেই রাশা আর জিতু অভিশপ্ত রাজকন্যাকে আবার মজা পুকুরটাতে ছেড়ে দিল। এতে অবশ্যি একটা লাভ হলো, ফিরে এলে জিতু যখনই এই মাগুর মাছটার গল্প করছিল তখন হাত দিয়ে সেটা কত বড় দেখানোর সময় তার আর কোনো বাধা-নিষধ থাকল না। কার সাথে গল্প করছে তার ওপর নির্ভর করে সে মাছটার সাইজটাও বড় থেকে বড় করতে লাগল।

রাশা যে শুধু গাছে চড়া শিখল, সাঁতার শিখল, কক আর মাছ ধরা শিখল না নয়, সে গ্রামের গাছগাছালিও চিনতে শিখল। এ ব্যাপারে তার নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষক নেই- সবাই কম বেশি তার শিক্ষক। যেমন নানি হঠাৎ করে পুকুর পাড় থেকে কোনো একধরনের লতাপাড়া ভেঙে এনে বেঁধে ফেলেন সেগুলো নাকি কলমি শাক। কিংবা জয়নব ছোট ছোট একধরনের গাছ তার সারা ফুল আর ফল দেখিয়ে বলে, এই গাছ থেকে খুব সাবধান। এটা হচ্ছে ধুতুরা গাছ। ধুতুরার সবকিছু হচ্ছে বিষ।

রাশা গাছটা ভারো করে চিনে রাখে, বলে যদি কখনো মরে যেতে চাই তাহলে এই গাছের ফল খেলেই হবে?

জয়নব মাথা নেড়ে বলে, ছিঃ! এরকম বলে না। তুই মরে যেতে চাইবি কেন?

জিতু খুন নিরীহ ছোট একটা গাছ দেখিয়ে বলে, এই যে, এইটে হচেছ চুতরা গাছ। বুঝলে রাশাপু তুমি যদি কাউকে একটা শিক্ষা দিতে চাও তাহলে এই গাছটা নিয়ে তার ঘাড়ের মাঝে লাগিয়ে দিবে। তাহলে সে বুঝবে মজা।"

"কী মজা?"

"চুলকাতে চুলকাতে তার বারটা বেজে যাবে।" দৃশ্যটা কল্পনা করে জিতুর নিশ্চয়ই অনেক আনন্দ হলো কারণ তার চোখে-মুখে আনন্দের একটা আভা ফুটে উঠল।

রাশা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আর আমি যে গাছটা হাত দিয়ে ধরব তখন আমার হাত চুলকাবে না?"

"সাবধানে ধরবে। গাছের গোড়ায় ধরবে তাহলে চুলকাবে না। পাতাটা যেন হাতে না লাগে খুব সাবধান।"

এরকম অসংখ্য বিষয়ে রাশার জ্ঞান বাড়তে থাকে, সব জ্ঞানই যে তার জীবনে কাজে লাগবে তা নয় কিন্তু কোনো জ্ঞান তো আর ফেলে দেয়া যায় না। সে চাইছে কি না চাইছে তাতে কিছু আসে যায় না– হাজার রকমের প্রয়োজনীয় আর অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান তার মাথার ভেতরে এসে জমা হতে থাকে।

শুধু রাশার মাঝে যে জ্ঞান জমা হতে থাকে তা নয় সে নিজেও কিছু কিছু জ্ঞান অন্যদের মাঝে বিতরণ করল। যেমন ধরা যাক, জোঁকের ব্যাপারটা।

একদিন স্কুল থেকে আসছে, রাশার মনে হলো তার পায়ের কাছে একটু চুলকাচ্ছে, পা দিয়ে সেখানে একটু ঘষা দিয়ে সে হাঁটতে থাকে। যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছে তখন হঠাৎ মতি চিৎকার করে বলল, "রাশা বুবু। দাঁড়াও।"

রাশা ভয় পেয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"জোঁক।"

"জোঁক?" রাশা এবারে জোরে চিৎকার করে বলল, "কোথায়?"

"তোমার পায়ে।"

রাশা তখন আতঙ্কে লাফাতে থাকে, কী করবে বুঝতে পারে না। মতি বলল, "নড়বে না, তুমি নড়বে না।"

রাশার প্রায় হার্টফেল করার অবস্থা, কিন্তু তারপরেও সে স্থির হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, তখন যে কয়জন ছিল সবাই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে

পড়ল। রাশা দেখল কালোমতন তেলতেলে পিছলে একটা জিনিস তার গোড়ালিতে কামড়ে ধরে আছে। মতি সেটাকে টেনে ছোটানোর চেষ্টা করল, জিনিসটা রবারের মতন যতই টানা হয় ততই লম্বা হয় কিন্তু ছোটানো যায় না। কয়েকবার চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত সেটা ছুটে এলো। জোঁকটাকে মাটিতে ফেলে মতি পা দিয়ে সেটাকে পিষে ফেলতে যাচ্ছিল, রাশা তাকে থামাল, বলল, "দাঁড়া দাঁড়া।"

"কী হয়েছে?"

"জোঁকটাকে মারিস না।"

"কেন?"

"কাজ আছে আমার।"

"কী কাজ?"

রাশা তার পায়ের গোড়ালিটা দেখল, যেখানে জোঁকটা ধরেছে সেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছে, সে জানে কিছুক্ষণ রক্ত বের হবে। ইন্টারনেটে সে পড়েছিল জোঁকের লালায় ব্যথানাশক জিনিস থাকে সেই জন্যে সে একটুও ব্যথা পায়নি, প্রথম যখন ধরছে তখন শুধু একটু চুলকিয়েছে। জোঁকের লালায় আরো একটা জিনিস থাকে যেটা দিয়ে সে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। সে জন্যে জোঁক এত নিশ্চিন্ত আরামে রক্ত খেতে পারে।

রক্ত খেয়ে জোঁকটা মোটা ঢোলের মতো হয়েছে এখন সে ধীরে ধীরে সরে যেতে চেষ্টা করল। রাশা বলল, "এই জোঁকটাকে ধরে নিতে হবে।"

"কী করবি।"

"পালব।"

জয়নব বলল, "পালবি? ছিঃ!"

রাশা বলল, "জোঁক হচ্ছে একটা অসাধারণ জিনিস। আমি বইয়ে পড়েছি একটা জোঁক যদি ভালো করে একবার রক্ত খেতে পারে তাহলে পরে টানা দুই বছর সে কিছু না খেয়ে থাকতে পারে।"

"যাহ।"

"সত্যি কথা। আমার তো মনে হয় এই ব্যাটা বদমাইশটা ভালো করেই আমার রক্ত খেয়েছে, এখন দেখি এইটা কত দিন না খেয়ে থাকতে পারে।"

জিতুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "তুমি সত্যি এটা পালবে?"

"হ্যাঁ। একটা বোতলের মাঝে পানি রেখে ছেড়ে দেব, দেখিস এটা কমপক্ষে একবছর বেঁচে থাকবে। তা ছাড়া আরো একটা জিনিস হবে।"

"কী হবে?"

"জোঁক বাতাসের চাপ বুঝতে পারে। ঝড় আসার আগে আগে দেখবি জোঁক পানি থেকে বের হয়ে আসবে।"

"যাহ।"

রাশা বলল, "সত্যি কথা। আমি ইন্টারনেটে পড়েছি।"

কাজেই জোঁকটাকে খুব সাবধানে বাড়ি এনে একটা প্লাস্টিকের বোতলে পানি ভরে সেখানে ছেড়ে দেয়া হলো। জোঁকটা বেশ আনন্দেই সেখানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

রাশা বলল, "এই জোঁকটার একটা নাম দিতে হবে।"

"কী নাম দেবে?" জিতু মিয়ার চোখ আনন্দে চকচক করতে থাকে।

"তোরা বল।"

"তোমার রক্ত খেয়েছে, তাই এটার নাম দাও রক্তখেকো।"

"উঁহু। এটা বেশি কঠিন নাম, সোজা দেখে একটা নাম দে।"

"রক্ত খেয়ে যেমন ভোটকা হয়েছে– তাহলে এটার নাম দাও ভোটকা মিয়া। না হয় মটকু মিয়া।"

রাশা বলল, "হ্যাঁ মটকু মিয়া নামটা ভালো। মটকু মিয়া নামটাই দেয়া যাক। কী বলিস?"

সবাই মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল।

নানি অবশ্যি মটকু মিয়াকে দেখে নাক-মুখ কুঁচকে বললেন, "জোঁক? বোতলের ভিতরে জোঁক? রাশা তোর কি ঘেন্না বলে কিছু নাই?"

"নানি এটার নাম হচ্ছে মটকু মিয়া।"

"জোঁকের আবার নামও আছে?"

"হ্যাঁ নানি। আমার রক্ত খেয়ে মোটা হয়েছে তাই মটকু মিয়া।"

"তুই আর কী কী রাখবি, আগের থেকে শুনে রাখি। সাপ, ব্যাঙ, বিছা?"

"না নানি, আর কিছু রাখব না। এই জোঁকটা আসলে হচ্ছে ব্যারোমিটার। যদি দেখো এটা পানি থেকে বের হয়ে উপরে উঠে যায় তাহলে বুঝবে সেদিন ঝড় হবে।"

নানি মাথা নাড়লেন, বললেন, "ঝড় হবে কি হবে না সেটা দেখার জন্যে তোর জোঁককে দেখতে হবে না। আকাশের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।"

গ্রামে এমন কোনো মানুষ নেই কিংবা এমন কোনো গরু-ছাগল নেই যাকে জোঁক কামড়ায়নি, কাজেই জোঁক নিয়ে কারো আলাদা কৌতূহল থাকার কথা নয়, তারপরও মটকু মিয়া এখানকার সবার মাঝে জনপ্রিয় হয়ে গেল। এদিকে কেউ এলেই মটকু মিয়াকে একনজর দেখে যায়। মটকু মিয়া নিরিবিলি পানিতে গুটিশুটি মেরে শুয়ে বসে থাকে, তাকে ঘিরে যে অনেক উত্তেজনা সেটা সে জানেও না।

তবে মটকু মিয়া রাশার সম্মানটা নষ্ট করল না। একদিন দুপুরবেলা খুব গরম, কেমন যেন দম আটকানো একটা পরিবেশ। নানি বললেন, "দিনটা ভালো লাগছে না।"

রাশা বলল, "কেন নানি? দিনটা ভালো লাগছে না কেন?"

"ঝড় হবে মনে হয়।"

রাশা তখন তার মটকু মিয়াকে নিয়ে আসে, সত্যি সত্যি সেটা পানি থেকে বের হয়ে উপরে উঠে এসেছে। রাশা বলল, "নানি! তুমি ঠিকই বলেছ। এই দেখো মটকু মিয়া পানি থেকে বের হয়ে এসেছে। মনে হয় আজকে আসলেই ঝড় হবে।"

আসলেই কিছুক্ষণের মাঝে আকাশের এক কোনায় এক টুকরো কালো মেঘ দেখা গেল, তারপর দেখতে দেখতে পুরো আকাশ কালো হয়ে উঠল। রাশা নিশ্বাস বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে কখনো এমন কুচকুচে কালো এমন ক্রুদ্ধ আর এমন ভয়ঙ্কর আকাশ দেখেনি। কিছুক্ষণের মাঝে আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠতে থাকে, সাথে সাথে মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন। প্রথমে এতটুকু বাতাস নেই, তারপর হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা দমকা হাওয়া এলো, গাছের পাতা, খড়কুটো উড়তে থাকে,

ধুলায় চারিদিক ঢেকে যায়। গরু-বাছুর গলা ছেড়ে ডাকতে ডাকতে ছুটতে থাকে, পাখি তার স্বরে শব্দ করতে করতে উড়তে থাকে! রাশা বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল, বাতাসের ঝাপটার জন্যে পরিচিত মাঠঘাট, গাছপালা সবকিছুকে কী বিচিত্র দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে তাকে বুঝি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

নানি চিৎকার করে ডাকলেন, "রাশা ভিতরে আয়। এক্ষুণি ঝড় শুরু হবে।"

"আমি বাইরে থাকি নানি? বৃষ্টিতে ভিজি?"

নানি অবাক হয়ে রাশার দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললি?"

"বলেছি বৃষ্টিতে ভিজি?"

নানি কয়েক মুহূর্ত রাশার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "ঠিক আছে।"

রাশা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইল, প্রথমে বড় বড় কয়েকটা পানির ফোঁটা পড়ল, তারপর আরো কয়েকটা, তারপর আরো কয়েকটা। তারপর ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। রাশা তার দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে মুখ উপরে তুলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নাচতে থাকে। তার মনে হয় সে বুঝি কোনো এক জঙ্গলের আদিম একজন মানুষ, তার চারপাশে কেউ নেই, শুধু পশুপাখি, গাছপালা আর বনলতা। সেখানে সে নাচছে তার সাথে সাথে নাচছে বনের সব পশু, সব পাখি, সব গাছপালা! রাশা প্রথমে বিড়বিড় করে তারপর জোরে জোরে চেঁচিয়ে গাইতে লাগল :

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।"

রাশা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নাচতে নাচতে গাইতে থাকে তখন হঠাৎ শুনল কে যেন ডাকছে, "রাশাপু রাশাপু-"

রাশা ঘুরে তাকাল, জিতু, মতি, জয়নব আরো অন্য বাচ্চারাও ভিজতে ভিজতে চলে এসেছে। রাশা আনন্দে হেসে ফেলল, "কী মজা দেখেছিস?"

বৃষ্টির প্রচণ্ড শব্দে কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। সবাই আনন্দে লাফাতে থাকে, নাচতে থাকে, গাইতে থাকে, সে গানের যেন কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই।

নানি ঘরের দাওয়ায় বসে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার স্বামীও এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গান গাইত। যেদিন রাজাকারেরা তাকে ধরে নিয়েছিল সেদিন ঠিক এভাবে বৃষ্টি হচ্ছিল।

নানি লক্ষ করেন তার হাতটা থরথর করে কাঁপছে। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যেতে চায়, সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসতে চায়। তার মাঝেও নানি স্থির হয়ে বসে থাকতে চান।

পাত্রী যখন সানজিদা

রাশা আর গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েরা আজ একটু সকাল সকাল স্কুলে চলে এসেছে। প্রতিদিনই সবাই দলবেঁধে আসে, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে তাই দেখা যায় কোনোদিন কারো ভাত খাওয়া হয়নি, কারো ইংরেজি খাতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কারো প্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বোতামটা গেছে ছিঁড়ে, এক্ষুণি সেখানে বোতাম সেলাই করতে হবে। আবার কোনো কোনোদিন দেখা যায় কেউ মন ঠিক করতে পারছে না সে আজকে স্কুলে যাবে কি যাবে না– সব মিলিয়ে প্রতিদিনই অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই বেশ আগে থেকেই স্কুলে যাওয়ার কাজ শুরু করতে হয়। আজকে কিভাবে কিভাবে জানি কারো দেরি হয়নি, তাই যখন স্কুলে এসেছে তখন স্কুলে আর কেউ পৌঁছায়নি, স্কুলের দপ্তরি মাত্র ক্লাসঘর খুলছে।

রাশা তখন বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসেছে আর ঠিক তখন ঢ্যাঙ্গা মতন একটা ছেলেকে ইতস্তত এদিক-সেদিক তাকিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। গ্রামের ছেলে চেহারায় তার স্পষ্ট ছাপ আছে। ছেলেটা ইতিউতি তাকিয়ে একটু এগিয়ে এসে জিতুকে জিজ্ঞেস করল, "ক্লাস এইট কোনখানে?"

জিতু হাত দিয়ে ক্লাস এইট দেখানোর চেষ্টা করে।

তখন রাশা জিজ্ঞেস করল, "কেন? ক্লাস এইটের কী হয়েছে?"

"একটা চিঠি।"

"চিঠি? কে দিয়েছে চিঠি?"

ছেলেটা এদিক-সেদিক তাকাল, তারপর গলা নামিয়ে বলল, "সানজিদা।"

"দেখি! আমি ক্লাস এইটে পড়ি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

"গোপনীয় চিঠি। সানজিদা বলেছে ক্লাস এইটে দিতে। একটা মেয়ের নাম বলেছিল খাসা না মাসা–"

রাশা মুখ শক্ত করে বলল, "রাশা?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ, রাশা।"

"আমি রাশা। দেখি চিঠিটা।"

ছেলেটা আবার এদিক-সেদিক তাকাল তারপর তার বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে রাশার হাতে দিল। কাগজে লেখা :

"আমার খুব বিপদ। আজকে দুপুরবেলা
আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে।
তোমরা যদি আমাকে উদ্ধার না করো তাহলে
আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

–সানজিদা"

রাশা দুইবার চিঠিটা পড়ল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "সর্বনাশ!"

জয়নব পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমাদের সানজিদাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।"

জয়নব একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সবসময় এই এক ঘটনা। দেখিস একদিন আমাকেও জোর করে বিয়ে দিয়ে দিবে।"

"কক্ষণো না। আঠারো বছর হওয়ার আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যায় না। এইটা বেআইনি।"

জয়নব বাঁকা করে হাসল, "তোর এই বেআইনি ঘটনার খবরটা কে জানছে?"

"আমরা জানাব।"

"কাকে জানাবি?"

"পুলিশকে।"

"পুলিশের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নাই। তোর কথা শুনে যাবে বিয়ে থামাতে!"

কথাটা সত্যি। পুলিশ তার কথায় বিয়ে থামাতে যাবে বলে মনে হয় না। রাশা দাঁত কামড়ে চিন্তা করছিল তখন ঢ্যাঙ্গা ছেলেটা বলল, "আমি যাই।"

"কোথায়?"

"বাড়িতে। লুকিয়ে এসেছি, না গেলে সন্দেহ করবে।"

"তুমি সানজিদার কী হও?"

"ভাই। মামাতো ভাই।"

"সানজিদার কী অবস্থা?"

"খারাপ। কান্নাকাটি করছে। তাই ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে আটকে রেখেছে।"

রাশা একটা নিশ্বাস ফেলল, "যে ছেলের সাথে বিয়ে দেবে, সেই ছেলে কী করে?"

"ছেলে? ছেলের সাথে বিয়ে দেবে নাকি। বিয়ে দেবে একটা বড় মানুষের সাথে।"

"একই কথা।" রাশা অধৈর্য হয়ে বলল, "কী করে সেই লোক?"

"কিছু করে না। জমিজিরাত আছে।"

রাশা ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, বলল, "লেখাপড়া?"

ছেলেটা হাসার চেষ্টা করল, "লেখাপড়া? গ্রামের মানুষ লেখাপড়া করে কী করবে?"

"লেখাপড়া নাই কাজকর্ম নাই কিন্তু বিয়ে করার শখ?"

ছেলেটা উদাসমুখে বলল, "বিয়ে করার শখ তো সবারই থাকে!"

রাশা কোনো কথা না বলে ছেলেটার দিকে কটমট করে তাকাল, তখন ছেলেটা বলল, "আমি যাই।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, সানজিদার বাড়ি কোথায় বলে যাও। কতদূর?"

"কাছেই। গোকুলপুর গ্রামে। বাবার নাম মাহতাব হোসেন। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।"

"গ্রামের নাম কী বললে, গোকুলপুর?"

"না, গোকুলপুর।"

"তাই তো বললাম, গোকুলপুর।"

"উঁহু। তুমি বলেছ গোকুলপুর। আসলে নাম হচ্ছে গোকুলপুর।"

রাশা ভালো করে লক্ষ করেও তার আর এই ছেলের গোকুলপুরের উচ্চারণের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পেল না। সে তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "কেমন করে যেতে হয়?"

"বাজারটা পার হয়ে দক্ষিণ দিকে যাবে।"

"আমি উত্তর-দক্ষিণ বুঝি না। ডানদিক না বামদিক বলো–"

ছেলেটাকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, রাশা যেরকম উত্তর-দক্ষিণ বুঝে না এই ছেলেটা সেরকম ডান-বাম বুঝে না। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "পুব দিক থেকে এলে বাম দিকে। আর পশ্চিম দিক থেকে এলে ডান দিকে।"

রাশা অধৈর্য হয়ে বলল, "পুব-পশ্চিম তো আমি জানি না!"

ছেলেটাও অধৈর্য হয়ে বলল, "বাজারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো সুখনকান্দি কোনদিকে–"

"একটু আগে না বললে গোকুলপুর। এখন সুখনকান্দি কেন বলছ?"

"সুখনকান্দির পুব দিকে হচ্ছে গোকুলপুর।"

রাশা হাল ছেড়ে দিল, বলল, "তুমি একটু দাঁড়াও। আমি তোমার সাথে যাব।"

জয়নব ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই যাবি? এখন?"

"যেতে হবে না? অবশ্যই যেতে হবে।"

"গিয়ে কী করবি?"

"গিয়ে বলব সানজিদাকে বিয়ে দিতে পারবে না। আঠারো বছরের আগে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বেআইনি।"

"তুই ভাবছিস সানজিদার বাপ-চাচারা তোর কথা শুনবে?"

"কেন শুনবে না?"

"আয়নাতে কোনোদিন তুই নিজেকে দেখেছিস?"

"কেন দেখব না? একশবার দেখেছি।"

"দেখিস নাই। দেখলে তুই জানতি তুই হচ্ছিস পুঁচকি একটা মানুষ। তার ওপর মেয়েমানুষ। তোর কথা কেউ শুনবে না।"

"শব্দটা হচ্ছে পুঁচকে। পুঁচকি না। তা ছাড়া মানুষ, মেয়ে মানুষে কিছু আসে যায় না। সত্যি কথা যে কেউ বলতে পারে, ছোট-বড় পুরুষ-মেয়ে কিছুতে কিছু আসে যায় না।"

"ঠিক আছে। যা, যখন সানজিদার বাপ-চাচা তোকে দৌড়িয়ে দেবে তখন আমাকে দোষ দিস না।"

"আমি কি একা যাব নাকি?"

"কাকে নিয়ে যাবি?"

"তোকে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ, চল যাই।"

জয়নব কিছুক্ষণ রাশার দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "তোর সাথে থেকে আমি যে কোনদিন কী বিপদে পড়ব, খোদাই জানে।"

রাশা বলল, "চল আমরা দুইজন গিয়ে সানজিদার বাসাটা আগে চিনে আসি। তারপর ক্লাসের সব ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করব। মানববন্ধন করব। অনশন করব।"

জয়নব বলল, "তুই গ্রামের মানুষকে চিনিস না!"

"না চিনলে নাই। আয় যাই।"

জিতু বলল, "আমিও যাব।"

রাশা বলল, "না, তুই এখন থাক। যখন পুরো ক্লাস নিয়ে যাব তখন তুই যাবি। আমি আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা চিঠি লিখে যাচ্ছি, ছেলেমেয়েরা এলে তুই দিয়ে দিস। আমরা যাব, বাড়িটা চিনেই চলে আসব। আমাদের বই-খাতা রেখে যাচ্ছি, তুই দেখে রাখিস।"

রাশা তার ক্লাসের ছেলেমেয়েদের একটা চিঠি লিখে সেটা জিতুর হাতে দিল। জিতু একটু মন খারাপ করে সেই চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, রাশা

তখন জয়নবকে নিয়ে ঢ্যাঙ্গা ছেলেটার সাথে রওনা দিল। জয়নব বিড়বিড় করে বলল, "যদি কোনোভাবে বাড়িতে খবর পায় আমি স্কুল পালিয়ে তোর সাথে আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তাহলে আমার কপালে দুঃখ আছে।"

"দুঃখ থাকলে থাকবে। আমরা যাচ্ছি সানজিদাকে রক্ষা করতে। সে লিখেছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে গলায় দড়ি দিবে মনে আছে?"

জয়নব মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক।"

ঢ্যাঙ্গা ছেলেটার সাথে রওনা দিয়ে একটু পরেই রাশা বুঝতে পারল কাজটা তারা বুদ্ধিমানের মতোই করেছে। ছেলেটা এমন বিচিত্র সব রাস্তা-ঘাট দিয়ে যেতে লাগল যে রাশা বুঝতে পারল সে কোনোদিন একা একা এখানে আসতে পারত না। ছেলেটা বলেছিল বাড়িটা কাছেই, কিন্তু রাশার বোঝা উচিত ছিল গ্রামের মানুষের কাছে কাছে কিংবা দূরে শব্দগুলোর কোনো অর্থ নেই। হেঁটে হেঁটে যেখানে যাওয়া সম্ভব সেটাই হচ্ছে কাছে।

শেষ পর্যন্ত যখন তারা সানজিদার বাড়িতে পৌঁছল তখন রাশা আর জয়নব দুজনেই ঘেমে-নেয়ে উঠেছে। ঢ্যাঙ্গা ছেলেটা বলল, "বরযাত্রী চলে এসেছে মনে হয়।"

রাশা চমকে উঠে বলল, "বরযাত্রী চলে এসেছে? সানজিদা যে বলল দুপুরে? এখন তো সকাল।"

জয়নব বলল, "গ্রামের মানুষের কাছে সকাল-দুপুর এক ব্যাপার। তাদের কাছে পার্থক্য শুধু দুইটা, দিন আর রাত।"

"সর্বনাশ। এখন যদি জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়?"

জয়নব কোনো কথা বলল না, মুখ শক্ত করে রাশার দিকে তাকাল। রাশা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে ঢ্যাঙ্গা ছেলেটাকে বলল, "তুমি কি আমাকে সানজিদার বাপের কাছে নিয়ে যাবে?"

ছেলেটা বলল, "মাথা খারাপ? আমার ঘাড়ে দুইটা মাথা? আমি তোমাদের কারো কাছে নিতে পারব না। তোমরা নিজেরা যার কাছে যেতে চাও যাও।"

রাশা বলল, "তাহলে অন্তত একটা জিনিস করো।"

"কী?"

"কাউকে বলো না আমরা সানজিদার স্কুল থেকে এসেছি। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

রাশা জয়নবকে বলল, "চল যাই।"

"দাঁড়া।"

"কী হলো?"

"তিনবার কুলহু আল্লা পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে দিই।"

জয়নব তিনবার কুলহু আল্লা পড়ে প্রথমে নিজের বুকে তারপর রাশার বুকে ফুঁ দিল। তারপর দুজন সানজিদার বাড়িতে গিয়ে ঢুকল।

বিয়ে বাড়িতে আরো অনেক হইচই হয়, আরো অনেক আনন্দের ছাপ থাকে। এখানে আনন্দের ছাপ নেই, মানুষজন একটু গম্ভীর মুখে ঘোরাঘুরি করছে। খুব বেশি মানুষ নেই, ছোট বাচ্চারা সেজেগুজে ছোটাছুটি করছে সেরকম দেখা গেল না। রাশা এবং জয়নব যে বাইরে থেকে এসেছে সেটা কেউ ধরতে পারল না, দু'পক্ষই ধরে নিল তারা অন্যপক্ষের।

ভিতরে ঢুকেই তারা বরযাত্রীর দলটাকে আবিষ্কার করল। যে মানুষটা বিয়ে করতে এসেছে সে যক্ষ্মা রোগীর মতো শুকনো, গাল ভেঙে ঢুকে গেছে। গায়ের রঙ বিবর্ণ। একটা সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এসেছে, মাথায় পাগড়ির বদলে একটা টুপি। গলায় একটা মালা, কোরবানির সময় কোরবানির গরুর গলায় এরকম মালা দেয়, রাশা এর আগে কখনো মানুষকে এরকম মালা পরতে দেখেনি। কিছু নানা বয়সী মানুষ ঘরে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

উঠানে কয়েকটা চেয়ার সেখানে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ নিচু গলায় কথা বলছে, মুখ দেখে মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। রাশা কাছাকাছি গিয়ে মানুষগুলোর কথা শোনার চেষ্টা করল, ধুরন্ধর টাইপের একজন বলল, "মোটরসাইকেল ছাড়া কী রকম হয়? আজকাল কি দেখেছেন মোটরসাইকেল ছাড়া কেউ বিয়ে দেয়?"

বয়স্ক একজন মানুষ, মনে হয় সানজিদার বাবা, ভীত মুখে বললেন, "মোটরসাইকেল আমি কোথা থেকে দেব। গরিব মানুষ–"

"আপনি গরিব মানুষ মানলাম, কিন্তু আমাদের ছেলে গ্রামের মাঝে

একজন সম্মানী মানুষ। সে যখন বউ নিয়ে যাবে, তখন দশজন জিজ্ঞেস করবে শ্বশুরবাড়ি থেকে কী দিল? তখন আমরা কী বলব? হ্যাঁ?"

"কিন্তু সেইরকম তো কথা ছিল না। যখন বিয়ের আলাপ হয় তখন আপনারা বলেছেন কোনোরকম দেয়া-থোয়া নাই। সুন্দর একটা বউ হলেই হবে। আমার মেয়ে ফুলের মতন সুন্দর–"

ধুরন্ধর মানুষটা বলল, "আরে, সুন্দর না হলে কি আমরা এই বাড়িতে আসি–"

রাশার মনে হলো মানুষটার টুঁটি চেপে ধরে, কিন্তু সে টুঁটি চেপে ধরল না! সেখান থেকে সরে এলো। এরকম নির্লজ্জভাবে কেউ কথা বলতে পারে সে কখনো কল্পনাও করেনি। এতক্ষণ তার মাঝে একটু দুশ্চিন্তা ছিল, এখন তার সাথে যোগ হলো রাগ। মোটামুটি সে ঠিক করে ফেলেছে, যা হয় হবে সে কিছু একটা করে ফেলবে আজ।

জয়নব বাড়ির ভেতর থেকে ঘুরে এসেছে, রাশা জিজ্ঞেস করল, "দেখেছিস সানজিদাকে?"

"না। একটা ঘরের ভিতর বন্ধ করে রেখেছে।"

রাশা কোনো কথা না বলে একটা নিশ্বাস ফেলল।

জয়নব জিজ্ঞেস করল, "কী করবি ঠিক করেছিস?"

রাশা মাথা নাড়ল, "এখনো ঠিক করি নাই।"

"জামাইকে গিয়ে সোজাসুজি বলে দেখলে হয়। বলবি, মেয়ের বয়স মাত্র চৌদ্দ। চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বিয়ে করা বেআইনি। একটু ভয় দেখা।"

"কিভাবে ভয় দেখাব?"

"বল যদি বিয়ে করে তাহলে আমরা পুলিশকে খবর দিব। এস.পি. ডি.সি. আমাদের পরিচিত। মনে নাই তুই যখন কম্পিউটারে রাজ্জাক স্যারের ছবি দেখালি–"

রাশার চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠে, সে ফিসফিস করে বলল, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।"

"কী আইডিয়া?"

"আমার একটা মোবাইল ফোন দরকার।"

জয়নবের মুখের আলো দপ করে নিভে গেল। বলল, "মোবাইল ফোন এখন কোথায় পাব?"

"সত্যিকারের মোবাইল ফোন না হলেও হবে। খেলনা হলেও হবে।"

"খেলনা মোবাইল ফোনই আমি কোথায় পাব?"

"দেখতে মোবাইল ফোনের মতো কোনো কিছু হলেও হবে।"

"কেন? কী করবি আগে শুনি।"

"আমি ভান করব মোবাইল ফোনে কথা বলছি। ঐ যে শুটকা জামাইটা দেখছিস, তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলব।"

"তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কী বলবি?"

"এমন ভান করব যেন আমি পুলিশকে ফোন করে বলছি যে এখানে আঠারো বছরের কম বয়সের একটা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে– আর সে জন্যে তারা যেন তাকে ধরতে আসে, এই সব।"

জয়নব কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা নাড়ল, বলল, "মন্দ না বুদ্ধিটা। মনে হয় কাজ করতেও পারে। ভয় দেখাতে হবে শুটকা জামাইকে। কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু জামাইকে শোনাবি কেমন করে?"

"জামাইটা ঐ জানালার কাছে বসেছে না? আমি জানালার ঐ পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কথা বলব যেন শুনতে পায়।"

"কিন্তু ঐ পাশে কি দাঁড়ানোর জায়গা আছে? ঝোপঝাড়–"

"ঝোপঝাড়ই তো ভালো।"

জয়নব বলল, "না শুনলে তো হবে না– যেভাবে হোক কথাগুলো শোনাতে হবে।"

"হ্যাঁ। লিকলিকে জামাইয়ের নামটা আগে জেনে নিই, জোরে জোরে কয়েকবার নামটা বলব, তাহলেই মানুষটার কৌতূহল হবে। শুনতে চাইবে কে তাঁর নাম বলছে।"

জয়নব মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক বলেছিস।"

"এখন দরকার, একটা মোবাইল ফোন না হলে মোবাইল ফোনের মতো দেখতে কোনো জিনিস।"

রাশা আর জয়নব তখন চারপাশে খুঁজতে থাকে। ঠিক তখন একজন মানুষ সিগারেট ধরানোর জন্যে পকেট থেকে একটা ম্যাচের বাক্স বের করে ফস করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে খালি বাক্সটা ছুড়ে ফেলে দেয়। মানুষটা এগিয়ে যাবার পর জয়নব ম্যাচের বাক্সটা তুলে এনে বলল, "এই যে নে তোর মোবাইল ফোন।"

"ম্যাচের বাক্স?"

"হ্যাঁ, এমনভাবে ধরবি যে শুধু উপরের অংশটা যেন দেখতে পায়, নিচে কী আছে কেউ জানবে না।"

রাশা একটু সরে গিয়ে ম্যাচের বাক্সটা একটু খুলে সেটাকে মোবাইল ফোনের মতো ধরে একটু প্র্যাকটিস করল, কেউ যদি না জানে তাহলে ভাবতে পারে যে সে আসলেই মোবাইল ফোনে কথা বলছে। রাশা জয়নবের দিকে তাকিয়ে বলল, "যা এবারে তুই জামাইয়ের নামটা জেনে আয়।"

জয়নব চলে গেল, কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে বলল, "শুটকো জামাইয়ের নাম রজব আলী। বাবার নাম–"

"থাক বাবার নামের দরকার নাই, আমি পরে উল্টোপাল্টা করে ফেলব। রজব আলী। নাম হওয়া উচিত ছিল গজব আলী।"

রাশা জয়নবের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। আমি এখন যাচ্ছি। আমাকে আবার কুলহু আল্লাহ্ পড়ে ফুঁ দে।"

জয়নব আবার কুলহু আল্লাহ পড়ে রাশার বুকে ফুঁ দিল।

রাশা ঘরটার পেছনে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে জানালার নিচে দাঁড়াল। ঠিক জানালার নিচে দাঁড়িয়েছে কিনা বোঝার চেষ্টা করতেই উপর থেকে রজব আলী স্বয়ং গলা খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলল, একটুর জন্যে রাশা বেঁচে গেল– আরেকটু হলে তার মাথায় পড়ত।

রাশা ম্যাচের খালি বাক্সটা মোবাইল ফোনের মতো করে ধরে গলা উঁচিয়ে বলল, "রজব আলী, রজব আলী, বললাম তো নাম রজব আলী।"

রাশা সরাসরি তাকাল না, কিন্তু তার মনে হলো কাজ হয়েছে। সত্যি সত্যি রজব আলী নিজের নাম শুনে জানালায় উঁকি দিয়েছে। রাশা না

দেখার ভান করে বলল, "হ্যাঁ। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর সানজিদার বয়স আঠারো থেকে কম। সানজিদা আমার সাথে পড়ে আমি জানি।"

রাশা এবারে কিছুক্ষণ শোনার ভান করল, তারপর বলল, "দেখেন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে একটা চিপা থেকে ফোন করছি, আমার হাতে সময় নাই, আপনি বরং এস.পি. সাহেবকে দেন। এস.পি. সাহেব আমাদের স্কুলে এসেছিলেন, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই থেকে এস.পি. সাহেব আর ডি.সি. সাহেব আমাকে খুব ভালো করে চিনেন। আপনি বলেন রাশা কথা বলতে চায়। রা-শা।"

রাশা এবারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, ফোনটা এস.পি. সাহেবকে দিতে যতক্ষণ সময় লাগার কথা ততক্ষণ সময় দিয়ে সে এবারে এস.পি. সাহেবের সাথে কথা বলার অভিনয় করতে থাকে, "স্লামালিকুম।" একটু বিরতি, তারপর হাসি হাসি মুখে, "জি জি ভালো আছি। আমরা সবাই ভালো আছি।" একটু বিরতি তারপর হঠাৎ খুবই গম্ভীর গলায়, "আপনি যখন আমাদের স্কুলে এসেছিলেন, তখন মনে আছে আমার সাথে সুন্দর একটা মেয়ে ছিল, সানজিদা? সেই মেয়েটাকে তার বাবা-মা জোর করে একটা মানুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে আইন আছে না আঠারো বছরের কম হলে বিয়ে দেওয়া যাবে না? তাহলে?"

রাশা এবারে কিছুক্ষণ শোনার ভান করল, হুঁ-হ্যাঁ করল তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, "খুবই ভালো হয় তাহলে! খুবই ভালো হয়। সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে? হাতে হ্যান্ডকাফ দিয়ে? কোমরে দড়ি? ইস! কী মজা হবে! কখন আসবে পুলিশ?"

কিছুক্ষণ আবার শোনার ভান করল, তারপর বলল, "আধাঘণ্টার মাঝে? গুড!" একটু বিরতি, তারপর, "না না আমি কাউকে বলব না। ওরা কেউ জানতে পারবে না।" তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে সেরকম ভান করে বলল, "স্যার, স্যার আপনি কি সাথে কোনো সাংবাদিক পাঠাতে পারবেন? তাহলে যখন অ্যারেস্ট করে তখন ছবি তুলতে পারত। পত্রিকায় ছাপা হতো, নাবালিকা বিবাহ করিতে গিয়ে জামাই গ্রেপ্তার।" রাশা তখন হি হি করে অনেকক্ষণ হাসল।

সে একবারও উপর দিকে তাকাল না কিন্তু চোখের কোনা দিয়ে বুঝতে পারল সেখানে রজব আলী দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনছে যা যা বলা দরকার সব সে বলে দিয়েছে এখন আর রজব আলীকে কিছু শোনানো দরকার নেই। কাজেই সে ফোনে কথা বলার ভঙ্গি করে হেঁটে হেঁটে একটু সরে এলো। তার খুব ইচ্ছে করছিল একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে রজব আলী মানুষটার মুখের ভাব কেমন হয়েছে কিন্তু সে কোনো ঝুঁকি নিল না।

কিছুক্ষণের মাঝে জয়নব এসে রাশার সাথে যোগ দিয়ে হাত-পা নেড়ে চোখ উপরে তুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রাশা থামাল, বলল, "জয়নব, খবরদার বেশি খুশি হবি না। খুবই নরমাল ভাব দেখা– এখন কিন্তু আমাকে অনেকে লক্ষ করবে। আমার সাথে সাথে তোকেও।"

জয়নব তখন বাড়াবাড়ি খুশির ভঙ্গিটা চেপে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কী মজা হয়েছে তুই চিন্তা করতে পারবি না।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"তোর কথা শুনে গজব আলীর মনে হয় ভয়ে কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরে হইচই শুরু হয়ে গেছে। ফিসফিস করে শুধু কথা বলে একজন আরেকজনের সাথে!"

রাশা মুখ টিপে বলল, "এখন আরেকটা কাজ বাকি।"

"কী?"

"ভিতরে গিয়ে গুজব ছড়িয়ে দিতে হবে রাস্তার মোড়ে অনেক পুলিশ দেখা গেছে।"

"কিভাবে ছড়াবি?"

"খুবই সোজা, খালি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করব, পুলিশ কেন আসছে?"

জয়নব চোখ কপালে তুলে রাশাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "ইস! তুই যা পাজি! তোর মাথায় যা ফিচলি বুদ্ধি।"

"শব্দটা ফিচলি না। শব্দটা ফিচলে।"

রাশা আর জয়নব এবার বাড়ির উঠানে গিয়ে প্রথম যে মানুষটাকে পেল তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আপনি কি জানেন, পুলিশ কেন আসছে?"

মানুষটা অবাক হয়ে বলল, "পুলিশ? পুলিশ কেন আসবে?"

"আমি জানি না, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম।"

"কোথায় পুলিশ?"

"ঐ রাস্তার মোড়ে। তাই তো বলল।"

"কে বলল?"

রাশা ঠোঁট উল্টে বলল, "ঐ যে একজন, চিনি না আমি!"

মানুষটাও মাথা নেড়ে হেঁটে চলে গেল, তখন তারা একটু সামনে গিয়ে বুড়োমতন একজনকে জিজ্ঞেস করল, "চাচা, এখানে কী কিছু হয়েছে?"

"না তো। কিছু হয়নি।"

"তাহলে পুলিশ কেন আসছে?"

"পুলিশ আসছে নাকি?"

"আমি তো জানি না–" বলে রাশা হেঁটে চলে গেল।

কয়েক মিনিটের ভেতর পুরো বাড়িতে গুজব রটে গেল যে পুলিশ আসছে, শুধু যে আসছে তা নয়, কয়েকজন বলল, তারা পুলিশকে দেখেও ফেলেছে। তারপর যা একটা মজা হলো সেটা দেখার মতো! রজব আলী তার গলা থেকে মালা খুলে, টুপি পকেটে ভরে কোনোমতে তার স্যান্ডেল পরে রীতিমতো দৌড়। সাথে সাথে বুড়ো আধবুড়ো যারা আছে তারাও।

রাশা দেখল সানজিদার বাবা অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

মানুষটা মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আপনারা মানুষ খুব খারাপ, বিয়ে করাতে ডেকে এনে পুলিশ খবর দেন!"

সানজিদার বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, "আমরা? আমরা পুলিশ কখন খবর দিলাম?"

মানুষটার সেটা ব্যাখ্যা করার সময় নাই, কোনোমতে পায়ে স্যান্ডেল পরে ছুটতে থাকে।

রাশা আর জয়নব কোনোমতে হাসি চেপে রজব আলীর পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে, চিৎকার করে ডাকে, "দুলাভাই! দুলাভাই!"

কোনোমতে তার স্যান্ডেল পরে রীতিমতো দৌড়।

মানুষটা পিছনে ফিরে রাশাকে দেখে আঁতকে ওঠে। রাশা মিষ্টি করে বলল, "আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন? বসেন। একটুক্ষণ বসেন। প্লিজ!"

মানুষটা হাত তুলে রাশাকে দেখিয়ে বলল, "তু-তু-তুমি! তু-তু-তুমি!"

"আমি কী?"

"ম-মনে করেছ আমি কি-কিছু জানি না। আমি সব জানি।"

"কী জানেন?"

রজব আলী সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল না। রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটতে লাগল।

বাড়ির সামনে সবাই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখনো কেউ বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। সানজিদার বাবা হতভম্বের মতো এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললেন, "কী হয়েছে? আমি এখনো বুঝতে পারছি না।"

একজন বলল, "পুলিশ আসছে, পুলিশ আসছে বলে সবাই ছুটতে লাগল।"

"কিন্তু পুলিশ আসলে তাদের সমস্যা কী? তারা কী চোর না ডাকাত?"

যারা হাজির ছিল তারা কেউ এর উত্তর দিতে পারল না, তখন রাশা বলল, "আসলে চাচা, চুরি-ডাকাতি অপরাধ, আবার আঠারো বছরের কমবয়সী মেয়ে বিয়ে করাও অপরাধ। মনে হয় সেই জন্যে!"

সানজিদার বাবা চোখ বড় বড় করে রাশার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কে?"

"আমি সানজিদার সাথে পড়ি।"

"তুমি কখন এসেছ?"

"সানজিদার বিয়ের খবর শুনেই স্কুল থেকে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি।"

সানজিদার বাবার হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হলো, জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম রাশা।"

সানজিদার বাবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, বললেন, "তুমি সেই মেয়ে, তোমাদের এক মাস্টারের চাকরি গিয়েছে তাকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছ?"

রাশা ঠিক বুঝতে পারল না সানজিদার বাবা এটা প্রশংসা হিসেবে বলছেন নাকি অভিযোগ করে বলছেন। তাই সে ইতস্তত করে বলল, "আমি আসলে কিছু করি নাই। ডিসি সাহেব এসপি সাহেব ছিলেন, তারা খুব রাগ করলেন–"

হঠাৎ করে সানজিদার বাবা কিছু একটা অনুমান করলেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাশার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কী পুলিশ খবর দিয়েছ?"

"জি না আমি পুলিশকে কিছু বলি নাই।" একটু ইতস্তত করে বলল, "তবে–"

"তবে কী?"

"বরপক্ষ মনে করেছে আমি বলেছি। তাতেই যা ভয় পেয়েছে।"

সানজিদার বাবা বিস্ফারিত চোখে রাশার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাকে দেখে মনে হতে লাগল, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি রাগবেন না হাসবেন বুঝতে পারছিলেন না, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তখন রাশা বলল, "চাচা, ভালোই হয়েছে বর পার্টি ভেগে গেছে!"

"কী বললে? ভালো হয়েছে?"

"জি চাচা। কমবয়সী মেয়ের বিয়ে দিলে অনেক ঝামেলা। আপনিও বিপদে পড়তেন।"

সানজিদার বাবা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রাশার দিকে তাকিয়েছিলেন, তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এইটুকুন একটা মেয়ে তাকে বড় মানুষের মতো উপদেশ দিচ্ছে! তিনি রেগে উঠার চেষ্টা করছিলেন, তখন রাশা বলল, "চাচা, আপনি যাই বলেন, জামাইটাকে আমার একদম পছন্দ হয় নাই। গাল ভাঙা, শুকনা দেখে মনে হয় যক্ষ্মারোগী। ভালো করে কথাও বলতে পারে না, মনে হয় তোতলা! আমাদের সানজিদার বিয়ে হবে স্মার্ট একটা ছেলের সাথে। ডাক্তার না হলে ইঞ্জিনিয়ার না হলে পাইলট। আমরা সবাই গেট ধরব– এক লক্ষ টাকার এক পয়সা কম দিলে আমরা গেট ছাড়ব না!"

"কত বললে? এক লক্ষ টাকা?"

"জি। সানজিদার জামাইয়ের কাছে এক লক্ষ টাকা হবে হাতের ময়লা!"

"হাতের ময়লা?"

"জি চাচা। সানজিদা এত সুন্দর তার সাথে এইরকম ভুসভুসা জামাই মানায় না চাচা।"

আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাদের একজন মাথা নেড়ে বলল, "কথাটা ঠিক। জামাইয়ের চেহারাটা জানি কেমন।"

আরেকজন বলল, "শুধু জামাই কেন? জামাইয়ের বাপের চেহারাও তো খাটাশের মতো।"

"শুধু চেহারা খাটাশের মতো না, স্বভাব-চরিত্রও জানি কেমন? আগে কথা বলেছে যে দেয়া-থোয়া লাগবে না, এখন বলে মোটরসাইকেল না দিলে বিয়া হবে না। কী ছোটলোক!"

সানজিদার বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মনে হয় আল্লাহ্ যেটা করেন ভালোর জন্যেই করেন।"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "জি চাচা সেইটা সত্যি কথা।"

সানজিদার বাবা মাথা ঘুরিয়ে রাশার দিকে তাকালেন, রাশা বলল, "চাচা, আমি কি সানজিদার সাথে একটু দেখা করতে পারি?"

"যাও। ভিতরে যাও।"

"চাচা, আরেকটা কথা চাচা।"

"কী কথা?"

"কালকে থেকে সানজিদাকে আবার স্কুলে পাঠাবেন। প্লিজ। সে লেখাপড়ায় এত ভালো!"

সানজিদার বাবা কিছুক্ষণ রাশার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ঠিক আছে।"

সানজিদাকে একটা লাল শাড়ি পরানো হয়েছে, রাশাকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। রাশা বলল, "এই মেয়ে, কাঁদছিস কেন বোকার মতো? তোর জামাই ভেগে গেছে, তোর আর চিন্তা নাই।" তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তোকে যা সুন্দর লাগছে! আমি ছেলে হলে নির্ঘাত তোকে বিয়ে করতাম!"

বয়স্ক একজন মহিলা মাথায় থাবা দিয়ে বললেন, "এত রান্নাবান্না হয়েছে, এতো খাবার এখন কী করব?"

রাশা মাথা ঘুরিয়ে বলল, "সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না খালাম্মা। আমাদের ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে চলে আসবে! অনশন করতে এসে পেট ভরে খেয়ে যাবে! হি হি হি..."

গৌরাঙ্গ ঘরামি

সকালবেলা জিতু দেখা করতে এলো, তার মুখে এগাল-ওগাল জোড়া হাসি। রাশাকে দেখে বলল, "কাজ হয়েছে!"

"কী কাজ?"

"রাস্তা ডুবে গেছে।"

"কোন রাস্তা?"

"স্কুলে যাবার রাস্তা। আর স্কুলে যেতে হবে না।" জিতুর মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো।

"সর্বনাশ! তাহলে কী হবে?"

"কী আর হবে। আমরা বাড়িতে বসে থাকব।"

"কিন্তু স্কুলে না গেলে কেমন করে হবে? মনে নাই আমাদের কম্পিউটারের ল্যাবরেটরিটা মাত্র তৈরি হলো। এখন কম্পিউটার ডেলিভারি দেবে?"

জিতুর মনে আছে, কিন্তু স্কুলে যেতে না হওয়ার আনন্দ অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। রাশা জিতুর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করে নিজে একটু খোঁজখবর নিল। সত্যি সত্যি স্কুলের রাস্তা জায়গায় জায়গায় ডুবে গেছে। জায়গায় জায়গায় হাঁটুপানি, জুতো হাতে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। কয়দিন পর পানি আরো বাড়বে, বুকপানি গলাপানি হয়ে যেতে পারে। রাশা একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। জয়নবের সাথে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন জয়নব বলল, "দরকার হচ্ছে নৌকা।"

"নৌকা?"

"হ্যাঁ। নৌকা করে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নাই।"

"নৌকা কোথায় পাব?"

"গ্রামের মানুষের নৌকা আছে, ভাড়া করবি, যাবি।"

"প্রতিদিন নৌকা ভাড়া করতে হবে?"

"এ ছাড়া আর রাস্তা কী?"

মতি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, "আমাদের নিজেদের একটা নৌকা থাকলে আমরা নৌকা বেয়ে চলে যেতাম!"

রাশা ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই নৌকা বাইতে পারিস?"

মতি কোনো কথা না বলে হাসল, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি ভাত খেতে পারো?" তখন সে যেভাবে হাসে সেই হাসি।

রাশা বলল, "তাহলে আমরা একটা নৌকা জোগাড় করি না কেন?"

জয়নব বলল, "কোথেকে জোগাড় করবে?"

রাশা মাথা চুলকাল, বলল, "সেইটা তো জানি না।"

রাত্রিবেলা সে নানিকে জিজ্ঞেস করল, "নানি, নৌকা কোথায় পাওয়া যায় তুমি জানো?"

"নৌকা? নদীতে, খালে-বিলে।"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "না, না সেই কথা বলছি না। আমাদের স্কুলে যাবার জন্যে একটা নৌকা দরকার। সেই নৌকাটা কোথায় পাব?"

নানি মাথা চুলকালেন, বললেন, "তোর নানার একটা ছোট নৌকা ছিল, সে তো অনেক আগে। কোথায় গেছে তাও জানি না। খালে ডুবে ছিল হয়তো, ভেঙেচুরে ভেসে গেছে।"

রাশা বলল, "ইস! নানি, কেন তুমি নৌকাটাকে ভেঙেচুরে ভেসে যেতে দিলে?"

নানি হাসলেন, বললেন, "কতদিন আগের কথা, সেই নৌকা কি আর এতদিন থাকত? নৌকা সারতে হয়, বছর বছর মেরামত করতে হয়, আলকাতরা দিতে হয়।"

"তাহলে এখন কী করি নানি?"

"এই গ্রামে ঘুরে দেখ। হয়তো কারো ছোট নৌকা আছে, তোদের ব্যবহার করতে দেবে।"

রাশা পরদিন জয়নব, জিতু আর মতিকে নিয়ে ঘুরতে বের হলো। রাশা একটু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল গ্রামের অনেকেরই ছোটখাটো নৌকা আছে। যাদের নৌকা নাই তাদের অনেকেরই ডোঙ্গা নামে নৌকার মতো একটা জিনিস আছে। তালগাছের মাঝে গর্ত করে এই ডোঙ্গা তৈরি করা হয়, একজন মানুষ বসে সেটাকে বেয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু রাশাদের দিয়ে দেয়ার মতো বাড়তি একটা নৌকা কারো নেই। চারজন একটু হতাশ হয়ে ফিরে আসছিল, কিভাবে সমস্যাটা মেটানো যায় সেটা নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে, তখন জিতু বলল, "আমরা কলাগাছ দিয়ে একটা ভেলা বানাতে পারি।"

"ভেলা?"

"হ্যাঁ। সেই ভেলায় করে আমরা স্কুলে যেতে পারি।"

মতি কম কথার মানুষ, সে কোনো কথা না বলে হাসার ভঙ্গি করল। জিতু রেগে বলল, "কী হলো, তুমি হাস কেন?"

"তোর কথা শুনে।"

"আমার কোন কথাটা হাসির?"

"যদি কলাগাছের ভেলা দিয়ে স্কুলে যেতে হয় তাহলে দিনে দুইটা করে ভেলা বানাতে হবে। যাওয়ার জন্যে একটা আসার জন্যে আরেকটা! এই দশ গ্রামের যত কলাগাছ আছে সব কেটে ফেলতে হবে!"

জিতু চিৎকার করে বলল, "কেন দশ গ্রামের কলাগাছ কাটতে হবে? কেন কাটতে হবে?"

ঠিক তখন শুনল, কে জানি বলছে, "কী ব্যাপার তোমরা কী কাটাকাটি করতে চাইছ?"

তারা তাকিয়ে দেখে গাছে হেলান দিয়ে সালাম নানা বসে আছেন। হাতে একটা বই, মনে হয় চোখের খুব কাছে ধরে বইটা পড়ছিলেন, তাদের চেঁচামেচি শুনে এখন তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

চারজনই দাঁড়িয়ে গিয়ে সালাম দিল। সালাম নানা বললেন, "কী ব্যাপার, তোমরা এই সকালে কী কাটাকাটি করতে চাইছ?"

রাশা হাসল, "আমাদের জিতু মিয়া কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরি করতে চাচ্ছে।"

"ভেলা? কলাগাছের ভেলা?"

রাশা একটু গিয়ে সালাম নানার কাছে বসে পড়ে– তার দেখাদেখি অন্যেরাও। সালাম নানার ক্রাচ দুটো পাশে শুইয়ে রাখা ছিল, জিতু সাবধানে সেগুলো একবার ছুঁয়ে দেখল। রাশা বলল, "আসলে আমরা নৌকা খুঁজতে বের হয়েছিলাম। নৌকা পাই নাই তাই জিতু বলল কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানাবে।"

"নৌকা! নৌকা কী জন্যে?"

"রাস্তা ডুবে গেছে, তাই স্কুল যেতে পারছি না। একটা নৌকা হলে স্কুলে যাওয়া যেত সে জন্যে।"

সালাম নানা এবারে একটু ঘুরে চারজনের এই ছোট দলটার দিকে ভালো করে তাকালেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "তার মানে মজা করার জন্যে নৌকা খুঁজছ না? রীতিমতো স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করার জন্যে নৌকা খুঁজছ?"

"জি নানা।" রাশা মাথা নাড়ল, তার দেখাদেখি অন্যেরাও।

"হুম।" নানা এবার চশমা খুলে শার্টের কোনা দিয়ে চশমাটা মুছে বললেন, "এরকম একটা মহৎ কাজে আমাদের তো সাহায্য করা দরকার। কী বলো?"

রাশার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, "আপনার নৌকা আছে নানা? আছে?"

"নাই। কিন্তু তাতে কী আছে? আমি তোমাদের নৌকা জোগাড় করে দেব!"

"সত্যি? সত্যি?" রাশার চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করতে থাকে।

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"কোথা থেকে জোগাড় করবেন?"

"বাংলাদেশে নৌকা জোগাড় করা কোনো ব্যাপার নাকি? সারা দেশটাই তো চলে নৌকা দিয়ে। যুদ্ধের সময় আমরা সবসময়ে নৌকার ওপর ছিলাম। যুদ্ধের সময় আধঘণ্টার নোটিশে পাঁচ-দশটা নৌকা জোগাড় করেছি আর এখন শান্তির সময় বাচ্চাদের স্কুলে যাবার জন্য নৌকা জোগাড় করতে পারব না? কী মনে করো তুমি আমাকে?"

বাংলাদেশে নৌকা জোগাড় করা কোনো কঠিন ব্যাপার নাকি?

জয়নব মাথা নাড়ল, "পারবেন নানা। আপনি চাইলেই পারবেন।"

জিতু জানতে চাইল, "নৌকাটা কি আপনি কিনবেন?"

"কেনা তো সোজা! তার থেকেও বেশি কিছু করব।"

"কী করবেন, বলেন না, নানা!" রাশা অনুনয় করল, "প্লিজ!"

নানা আবার চোখ থেকে চশমা খুলে সেটা মুছলেন, তারপর চোখে লাগিয়ে বললেন, "আমার একজন বন্ধু আছে, নাম হচ্ছে গৌরাঙ্গ। সে হচ্ছে ঘরামি। সে নৌকা বানায়। বহুদিন তার সাথে যোগাযোগ নাই। কয়দিন থেকে ভাবছিলাম তার একটু খোঁজ নিই। এখন তোমাদের অছিলায় তার সাথে যোগাযোগ করার একটা সুযোগ হলো, তাকে বলব আসতে। গল্পগুজব করবে, তোমাদের একটা নৌকা বানিয়ে দেবে।"

রাশা আনন্দে হাততালি দিল, "বানিয়ে দেবে। আমাদের চোখের সামনে?"

"হ্যাঁ। তোমাদের চোখের সামনে।"

"কয়দিন লাগবে নানা?"

"সকালে শুরু করলে সূর্য ডোবার আগে সে একটা নৌকা বানাতে পারে। এখন অবশ্যি বয়স হয়েছে, এখন একদিনে পারবে কি না জানি না।"

জিতু বলল, "আমরা সবাই সাহায্য করব।"

"তাহলে মনে হয় একমাস লেগে যাবে।"

সালাম নানার কথায় সবাই হি হি করে হাসতে লাগল, জয়নব বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন নানা। জিতু হাত দিলেই সর্বনাশ– তখন একদিনের কাজ শেষ হতে একমাস লাগবে।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "নানা আপনার বন্ধুকে কবে খবর দিবেন?"

"আজকেই দিব।"

"কবে থেকে বানাবেন?"

"কাঠ কিনতে হবে, গজাল, শিরিষ, আলকাতরা এইসব কিনতে হবে, জোগাড়যন্ত্রে একটু সময় লাগবে। মনে করো পরশু না হলে তার পরের দিন।"

"কোথায় বানাবেন, নানা?"

"তোমার নানাবাড়িতে। সামনে খাল আছে, খালের পাড়ে তৈরি করে খালে ভাসিয়ে দেয়া হবে।"

রাশা আবার হাততালি দিল, "কী মজা হবে।"

সালাম নানা হাসলেন, বললেন, "হ্যাঁ। অনেক মজা হবে।"

সালাম নানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারজন বাড়ির দিকে রওনা দেয়, কয়েক পা অগ্রসর হয়ে রাশা থেমে গেল, অন্যদের বলল, "তোরা হাঁটতে থাক, আমি সালাম নানার কাছ থেকে একটা জিনিস জেনে আসি।"

রাশা দৌড়ে আবার সালাম নানার কাছে এসে বলল, "নানা।"

"বলো।"

"নৌকার জন্যে কাঠ, আলকাতরা এসব তো কিনতে হবে। তার জন্যে তো একটু টাকা লাগবে। আর আপনার বন্ধুকে তো নৌকা তৈরি করার জন্যে একটু মজুরি দিতে হবে! আমি বলছিলাম কী–"

"কী বলছিলে?"

"আমার মা যাবার সময় আমাকে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি হবার সময় একটু টাকা খরচ হয়েছে। বাকি টাকাটা আছে। যদি কাঠ কিনতে টাকা লাগে–"

"কাঠ কিনতে টাকা লাগবে না। আমার বাড়িতে অনেক কাঠ পড়ে আছে। গজাল, আলকাতরা, শিরিষ এইসবের জন্যে এমন কিছু খরচ নাই। বাকি থাকল গৌরাঙ্গের মজুরি?"

"জি নানা।"

"আমি তোমাকে বলেছি গৌরাঙ্গ আমার খুব ভালো বন্ধু। প্রাণের বন্ধু। তোমার নানা যেরকম আমার প্রাণের বন্ধু ছিলেন সেরকম। বন্ধুর কাছে সব রকম আবদার করা যায়, কিন্তু বন্ধুকে কখনো মজুরি দিতে হয় না। সেইটা খুব লজ্জা–"

"ও আচ্ছা!" রাশা একটু লজ্জা পেয়ে যায়, "আমি আসলে বুঝতে পারি নাই। আপনারা একসাথে যুদ্ধ করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমি, তোমার নানা, গৌরাঙ্গ আমরা সব একসাথে যুদ্ধ করেছিলাম। এখন একজন শিক্ষিত মানুষ আর নৌকার মিস্ত্রি বন্ধু হতে পারবে না। যুদ্ধের সময় হয়েছিল। স্কুলের মাস্টার আর কুলি, ইউনিভার্সিটির ছাত্র আর পকেটমার সব একজন আরেকজনের বন্ধু ছিল। বুঝেছ?"

"জি বুঝেছি।"

"যাও তাহলে। তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।"

রাশা উঠে দাঁড়াল, বলল, "নানা।"

"বলো।"

"আমার নানিকে আমি নানার কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না, জিজ্ঞেস করলেই নানি জানি কেমন হয়ে যান। আপনি কি কোনো একদিন আমাকে একটু বলবেন কী হয়েছিল?"

সালাম নানা কিছুক্ষণ রাশার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বলব? নিশ্চয় বলব।"

সালাম নানার বন্ধু গৌরাঙ্গ ঘরামি দেখতে যেরকম হবে বলে রাশা ভেবেছিল দেখা গেল মানুষটা দেখতে ঠিক সেরকম। হালকা-পাতলা, শুকনো, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখে বয়সের চিহ্ন কিন্তু চোখ দুটি সজীব, একেবারে বাচ্চাদের মতো। সালাম নানা আর গৌরাঙ্গ দুজন পাশাপাশি বসে অনেকক্ষণ গল্প করলেন, পুরানো বন্ধুদের খোঁজ নিলেন। অনেকে মারা গিয়েছে তাদের কথা বলে নিশ্বাস ফেললেন, যারা বেঁচে আছে তারা কে কেমন আছে সেটা নিয়ে গল্প করলেন। নানি বাড়ির ভেতর থেকে চা বানিয়ে পাঠালেন। সালাম নানা আর গৌরাঙ্গ বসে বসে চা খেলেন, তারপরে গৌরাঙ্গ ঘরামি কাজ শুরু করলেন।

রাশা মুগ্ধ হয়ে তাঁর হাতের কাজ দেখতে লাগল। সালাম নানা আগেই কাঠগুলো মাপমতো কেটে রেখেছিলেন, গৌরাঙ্গ ঘরামি সেগুলো র‍্যাঁদা দিয়ে একটু সমান করে নিলেন। তারপর মাপজোখ করে কেটে সাইজ করলেন। কানের ওপর একটা ছোট পেন্সিল গুঁজে রাখা আছে সেটা দিয়ে কাঠের ওপর লাইন টানলেন, করাত দিয়ে সেই লাইন ধরে কাটলেন। তারপর কাঠগুলো ঠুকে ঠুকে একটার সাথে আরেকটা লাগালেন, রাশা খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারল না নৌকার কোন অংশটা তৈরি হচ্ছে!

দুপুরে নানি খাবারের আয়োজন করেছিলেন, সবাই বসে তখন খেয়ে নিল। রাশা ভেবেছিল গৌরাঙ্গ ঘরামি এত পরিশ্রম করেছেন নিশ্চয়ই ভালো করে খাবেন, কিন্তু আসলে বলতে গেলে কিছুই খেলেন না। এত কম খেয়ে

মানুষ কেমন করে এত কাজ করে কে জানে। খেয়ে একটুও বিশ্রাম না নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন। সালাম নানা আর গৌরাঙ্গ ঘরামি দুজন এত বন্ধু, সারাক্ষণই এটা-ওটা নিয়ে গল্প করছেন কিন্তু মজার ব্যাপার হলো গৌরাঙ্গ ঘরামি যখন কাজ শুরু করেন তখন একটা কথাও বলেন না, মুখ যেন সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বিকেলবেলা রাশা একটু একটু করে নৌকার আকারটা ধরতে পারল, দুই পাশের দুটি অংশ তৈরি করা হয়েছে। মাপজোখ করে গৌরাঙ্গ চাচা সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হলো, তখন দুই পাশের দুই অংশ একত্রে জুড়ে দিলেন, নৌকার মতো হলো সত্যি কিন্তু অত্যন্ত সরু একটা নৌকা! এত সরু নৌকায় তারা কেমন করে বসবে? কিন্তু রাশা কিছু জিজ্ঞেস করল না। ব্যাপারটা মনে হয় ছবি আঁকার মতো, ছবি আঁকার মাঝামাঝি সময়ে ছবির মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু যখন শেষ হয়ে আসে তখন সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়।

রাশার ধারণা সত্যি! নৌকার দুই পাশের দুটি অংশ জোড়া দেয়ার পর গৌরাঙ্গ ঘরামি সেটা উল্টো করলেন, তারপর বাঁশের টুকরো দিয়ে সেটাকে ফাঁক করে মাঝখানে এক টুকরো কাঠের পাটাতন লাগালেন, তখন হঠাৎ করে রাশার কাছে পুরো নৌকাটার আকার স্পষ্ট হয়ে গেল! সে হাততালি দিয়ে বলল, "কী সুন্দর!"

গৌরাঙ্গ ঘরামি রাশার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, কিছু বললেন না। পাটাতনের কাঠগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। রাশার নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না যখন দেখল সত্যি সত্যি সন্ধের আগে পুরো নৌকাটা তৈরি হয়ে গেছে! কী সুন্দর একটা নৌকা, দেখে মনে হয় একজন আর্টিস্ট একটা ভাস্কর্য তৈরি করেছে।

সালাম নানা এমন ভান করতে লাগলেন যেন গৌরাঙ্গ ঘরামি না, সালাম নানাই নৌকাটা তৈরি করেছেন। বুকে থাবা দিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের বলেছিলাম না আমার বন্ধু একদিনে একটা নৌকা বানাতে পারে! বলেছিলাম কিনা?"

রাশা বলল, "আপনি বলেছিলেন নানা, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নাই, আমি ভেবেছিলাম আপনার বন্ধু তো সেই জন্যে আপনি বাড়িয়েচাড়িয়ে বলেছিলেন!"

"আমি মোটেই বাড়িয়েচাড়িয়ে বলি নাই! আমার বন্ধু একদিনে একটা নৌকা বানাতে পারে, একমাস সময় দিলে একটা জাহাজ বানিয়ে ফেলতে পারবে! তাই না রে গৌরাঙ্গ?"

গৌরাঙ্গ ঘরামি খুক খুক করে হাসল, বলল, "তারপরে তুমি বলবা তিন মাসে একটা উড়োজাহাজ বানাতে পারবে!"

"পারবেই তো। তোমাকে উড়োজাহাজ বানাতে শেখালে তুমি উড়োজাহাজও বানাতে পারতে!"

"ভালো হয়েছে কেউ শিখায় নাই, তাহলে এই নৌকা আর তৈরি হতো না।"

রাশা বলল, "গৌরাঙ্গ নানা, থ্যাংকু। আপনাকে অনেক থ্যাংক্কু।"

গৌরাঙ্গ ঘরামি বললেন, "এখনই থ্যাংকু দিও না সোনা। নৌকাটা মাত্র তৈরি হয়েছে, আসল কাজই বাকি আছে।"

"আসল কাজ কী?"

"ফুটোফাটা বন্ধ করতে হবে, আলকাতরা মারতে হবে সেই আলকাতরা শুকাতে হবে তারপর তুমি নৌকা পানিতে নামাবে।"

রাশা নৌকাটার মসৃণ গায়ে হাত দিয়ে বলল, "এখন নৌকাটার কী সুন্দর রং! আলকাতরা দিলে তো কালো হয়ে যাবে!"

"সেই কালো রং আরো সুন্দর হবে দেখো! কুচকুচে কালো পানকৌড়ির মতো। কালো রং খারাপ কে বলেছে? তোমার সালাম নানাকে জিজ্ঞেস করে দেখো–"

"কী জিজ্ঞেস করব?"

"তার চুল যে পেকে সাদা হয়েছে সে জন্যে খুশি হয়েছে নাকি যখন কালো ছিল তখন খুশি ছিল!"

রাশা হি হি করে হাসল এবং অন্য সবাই সেই হাসিতে যোগ দিল।

গৌরাঙ্গ ঘরামি তার যন্ত্রপাতি একটা ব্যাগে ভরে বলল, "আজকে এই পর্যন্তই। কালকে আলো হলে, আলকাতরা মারব।"

নানি রাতের বেলাতেও খেয়ে যেতে বলেছিলেন, সালাম নানা রাজি হলেন না। গৌরাঙ্গ ঘরামি তার বাড়িতে খাবে, রাত কাটাবে, দুজনের নাকি অনেক গল্প বাকি আছে।

রাশা দেখল সালাম নানা তার ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, গৌরাঙ্গ ঘরামি তার ব্যাগটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে হাঁটছে। সালাম নানা কী একটা বললেন তখন দুজনেই একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসতে লাগলেন, একজন আরেকজনের পেটে গুঁতো মারতে লাগলেন– যেন দুটি বাচ্চা মানুষ।

পরের দিন সকালবেলাই সালাম নানা তার বন্ধু গৌরাঙ্গ ঘরামিকে নিয়ে চলে এলেন। রাশা, জয়নব, জিতু মিয়া, মতি আরো বাচ্চা-কাচ্চা আগে থেকেই বসে আছে– কখন নৌকাটা শেষ হবে, কখন সেটাকে পানিতে নামানো হবে। গৌরাঙ্গ ঘরামি নৌকাটাকে সোজা করে তার ফুটোফাটাগুলো বুজিয়ে দিতে লাগলেন। নৌকা বানানোর সময় গৌরাঙ্গ ঘরামি একটা কথাও বলেননি, আজকে সেরকম না। কাজ করতে করতে কথা বলছেন, মাঝে মাঝে কাজ থামিয়েও কথা বলছেন। রাশা তাই একসময় বলল, "যুদ্ধের একটা গল্প বলেন না, নানা।"

তখন দুজনেই কথা থামিয়ে রাশার দিকে তাকালেন, সালাম নানা বললেন, "যুদ্ধের গল্প শুনতে চাও?"

"জি নানা।"

জিতু হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফাটাফাটি গল্প!"

সালাম নানা গৌরাঙ্গ ঘরামির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোনটা বলি গৌরাঙ্গ?"

"ঐ যে তুমি আর আমি বাঘাই নদীতে অ্যামবুশ করলাম সেইটা বলো।"

সালাম নানা মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, এই গল্পটা খারাপ না! শোনো তাহলে!"

সালাম নানা খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর শুরু করলেন, "এইটা হচ্ছে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমরা যুদ্ধের 'য'ও জানি না। বলতে পারো রাইফেল কোনদিক সোজা কোনদিক উল্টা সেইটাও জানি না। গ্রেনেড কী খাওয়ার জিনিস নাকি ছুড়ে মারার জিনিস সেইটা পর্যন্ত জানি না। যাই হোক আস্তে আস্তে ধাক্কা খেয়েটেয়ে আমরা

একটু একটু যুদ্ধ করতে শিখেছি। দেখি পাকিস্তানি মিলিটারির গুলিতে যেরকম আমরা মরি ঠিক সেরকম আমাদের গুলি কোনোমতে তাদের গায়ে লাগাতে পারলে তারাও মরে! তাহলে আর ভয়টা কী? তাদের সাইজ বড় তাদের কাছে হাজার রকম অস্ত্রপাতি, তাদের জামা-জুতো ভালো, আমরা পিচ্চি পিচ্চি প্রায় বাচ্চাকাচ্চা মানুষ, অস্ত্রপাতি কম, জামা-জুতোর তো প্রশ্নই নাই। বেশিরভাগ লুঙ্গি পরে থাকে খালি পা! কিন্তু সমস্যা তো নাই, সুযোগ বুঝে খালি গুলি করা। দেশটা আমার, দেশের মানুষও আমাদের–তারা বাইরের মানুষ কোথায় গিয়ে লুকাবে?"

"আস্তে আস্তে আমাদের সাহস গেল বেড়ে। খোঁজখবর রাখি কোথাও যাচ্ছে– আসছে, খবর পেলেই অ্যামবুশ করি। যখন বর্ষা নেমেছে তখন একটু সমস্যা। ঝড়ের বেগে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারি না। নৌকা করে যেতে হয়। পাকিস্তানি মিলিটারিদেরও সমস্যা, তারাও যেতে পারে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, পানির মাঝে বড় হয়েছি, পানি দেখে ভয় পাই না। ঐ ব্যাটারা পানি দেখে ভয়ে কাঁপে, সাঁতার জানে না হাঁটুপানিতেই ডুবে মরে এমন অবস্থা!"

"যাই হোক, আমরা তখন এই এলাকাটাতে এসেছি, আশেপাশে কয়েকটা বড় অপারেশন করেছি। দুইটা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছি। রাস্তায় মিলিটারির একটা জিপ উড়িয়ে দিয়েছি। মিলিটারিরা তখন মনে হলো আমাদের শায়েস্তা করবে। হেড কোয়ার্টার থেকে প্রায় দুইশ পাঞ্জাবি মিলিটারি এসেছে। তারা নদীর ঐ পারে আমরা নদীর এই পারে।"

"এর আগে আমরা কখনোই মিলিটারিদের সামনাসামনি আমাদের আক্রমণ করতে দেই নাই। আমরা সবসময় লুকিয়ে তাদের অ্যামবুশ করেছি। এইবার আমরা ভাবলাম সামনাসামনি একটু যুদ্ধ করি! আমরা নদীর পাড়ে বাংকার করে বসে থাকব তারা যদি আমাদের আক্রমণ করতে চায় নদী পার হয়ে আসতে হবে, নদী পার হবার সময় আমরা তাদের ছ্যাড়াব্যাড়া করে দেব। আমরা তাই নদীর পাড়ে পজিশন নিয়ে বসে থাকলাম। নদীর ঐ পারেও আমাদের লোক আছে তারা খোঁজখবর দিচ্ছে। সকালবেলা খোঁজ পেলাম তারা অনেক রকম অস্ত্রপাতি নিয়ে রওনা দিয়েছে।"

"আমরা অপেক্ষা করছি, কখন তারা আসবে, নদী পার হবে কিন্তু তারা তো আর আসে না। তখন হঠাৎ একজন স্কাউট দৌড়াতে দৌড়াতে হাজির হলো, এসে বলল, মিলিটারিরা দুই ভাগে ভাগ হয়েছে, একভাগ নদীর এই পারে অন্যভাগ নদীর ঐ পারে। তারপর তারা নদীর তীর ধরে আসছে। বদমাইশের বাচ্চাগুলি নদী পার হয়েছে ঠিকই কিন্তু অনেক উজানে যেখানে আমরা আশেপাশে নাই! ব্যাটারা হচ্ছে প্রফেশনাল, যুদ্ধের বইপত্র পড়েছে, সেখানে নিশ্চয়ই কোথায় নদী পার হতে হয়, কেমন করে নদী পার হতে হয়– এইসব শেখায়। আমরা তো আর সেইসব জানি না!"

"যাই হোক, স্কাউটের মুখে খবর পেয়ে আমাদের আক্কেল গুড়ুম। আমাদের কমান্ডার হচ্ছেন রাশার নানা, আজিজ মাস্টার, আমরা আজিজ ভাই ডাকি। আজিজ ভাই খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, একটু সময় চিন্তা করে বললেন, আমাদের বিশ-পঁচিশজন মুক্তিযোদ্ধা কয়েকশ পাকিস্তানি মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না– সবাই মারা পড়ব। তাই তার চেষ্টাও করব না, কাজেই এক্ষুণি সরে পড়তে হবে। যদি সরে পড়তে পারি ভালো। যদি দেখি পারছি না তাহলে কয়েকজনের একটা ছোট দল লাইট মেশিনগান নিয়ে রাস্তার পাশে বসে যাবে, পাকিস্তানিদের আটকে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সবাই সরে পড়তে পারছে।"

"এইটুকু বলে আজিজ ভাই থামলেন, তারপর বললেন, আমার দুইজন ভলান্টিয়ার দরকার। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? আজিজ ভাই বললেন, ব্যাটাদের একটা শিক্ষা দিতে চাই। আমি বললাম, কী শিক্ষা? আজিজ ভাই বললেন, তারা নদী পার হয়ে এই পারে এসেছে না? আবার তো ঐ পারে যেতে হবে। যখন ঐ পারে যাবে তখন নৌকাগুলি ডুবিয়ে দিতে হবে। তাই দুজনকে ঐ কচুরিপানায় লুকিয়ে থাকতে হবে! অস্ত্রসহ।"

রাশা এই সময়ে জিজ্ঞেস করল, "পানিতে ডুবে গেলে অস্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে না?"

"না। বেশিদিন ডুবিয়ে রাখলে জং ধরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্যারেলে কাদা ঢুকলেও সমস্যা। এমনিতে পানিতে ভিজে গেলে, কিছুক্ষণ ডুবে থাকলে কোনো সমস্যা নাই। যাই হোক আমি আর গৌরাঙ্গ, আমরা দুইজন বললাম, আমরা থাকব। দুইটা রাইফেল নিয়ে আমরা কচুরিপানায় লুকিয়ে থাকলাম, অন্যেরা চলে গেল।"

"কিছুক্ষণের ভেতর শুনতে পাই নদীর দুই পার দিয়ে মিলিটারি যাচ্ছে। ব্যাটাদের জানের ভয় আছে, এদিক-সেদিক তাকায়, আস্তে আস্তে হাঁটে, ফাঁকা গুলি করে। কচুরিপানার দিকেও একঝাঁক গুলি করল, কপাল ভালো আমরা বেঁচে গেলাম।"

"যাই হোক আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে শুধু নাকটা ভাসিয়ে বসে আছি, টের পাচ্ছি শরীরে জোঁক ধরেছে। ব্যাটাদের মনে হলো ঈদ, এরকম ফ্রেশ রক্ত কতদিন খায় নাই! রক্ত খেয়ে ঢোল হয়ে নিজেরাই খসে পড়ছে। কান খাড়া রেখে শোনার চেষ্টা করি কোনো বড় ধরনের গোলাগুলির শব্দ শোনা যায় নাকি, শোনা গেল না। তার মানে সবাই নিরাপদে সরে পড়তে পেরেছে। আজিজ ভাই বুদ্ধি করে ছোট একটা খাল পার হয়ে গেছে, খালের উপর বাঁশের সাঁকো গুলি করে ভেঙে দিয়ে গেছে, নৌকাগুলো ডুবিয়ে দিয়ে গেছে– তাই এত সহজে পিছু নিতে পারে নাই।"

"যাই হোক বিকেলের দিকে টের পেলাম মিলিটারিগুলো ফিরে আসছে, ব্যাটাদের মনে খুব স্ফূর্তি। তাদের ধারণা তারা সব মুক্তিবাহিনীকে ভাগিয়ে দিয়ে এসেছে। আমরা কচুরিপানায় ডুবে থেকে শুনতে পাচ্ছি শালা মুক্তি বলে একেবারে যা তা ভাষায় গালাগাল করছে। আমাদের সাহস নাই, যুদ্ধ করার ক্ষমতা নাই, আমরা ইন্ডিয়ার দালাল এই রকম আজেবাজে কথা। শুনে আমাদের আরো রাগ চেপে গেল, আজকে ব্যাটাদের একটা শিক্ষা দিতেই হবে। আমাদের সাহস আছে কি নেই সেইটা আজকে তাদের জন্মের মতো বুঝিয়ে দেব।"

"ওরা যখন নদী পার হয়েছিল তখন সেটা তারা করেছিল খুব সাবধানে, যেখানে আমরা নাই সেইখানে। এখন তারা ধরেই নিয়েছে আমরা কোথাও নাই, তাই তাদের ভয়েরও কিছু নাই। তারা যেভাবে খুশি যেখানে খুশি নদী পার হতে পারবে। তাই তারা ঠিক করল তারা এখন কাছাকাছি এখান দিয়েই নদী পার হয়ে যাবে। হাঁকডাক দিয়ে নৌকা জড়ো করে বদমাইশগুলি নদী পার হতে শুরু করল। আমরা বুঝতে পারলাম এইটাই সুযোগ।"

"আমরা তাদের শান্তিমতো নদী পার হতে দিলাম। যতক্ষণ এই পারে পাকিস্তানি মিলিটারি থাকল আমরা কিছু করলাম না। যখন শেষ

মিলিটারিটাও নৌকায় উঠে রওনা দিল আমরা মাথার মাঝে কচুরিপানা লাগিয়ে ভেসে ভেসে কাছাকাছি এলাম। আমি আর গৌরাঙ্গ দুই দিকে সরে গেলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ঠিক মাঝনদীতে পৌঁছায়। যখন পৌঁছল, তখন আমরা দুইজন দুই দিক থেকে গুলি করতে শুরু করলাম।"

ব্যাস। মজা শুরু হয়ে গেল। গুলি শব্দ শুনেই বাঙালি মাঝিরা নৌকা ফেলে পানিতে লাফ দিয়েছে। সাথে সাথে নৌকা চক্কর খেতে শুরু করেছে। গাদাদাদি করে মিলিটারি উঠেছিল, সেগুলো নৌকার ওপর লাফঝাঁপ দিতে লাগল, কেউ কেউ আমাদের গুলি করার চেষ্টা করল। নৌকা গেল কাত হয়ে, কিছু বোঝার আগেই মিলিটারিগুলো পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগল, একটাও সাঁতার জানে না, সবগুলি মার্বেলের মতো ডুবে যেতে লাগল।

নদীর জন্য অন্য পারে মিলিটারিগুলি পজিশন নিয়ে গুলি করার চেষ্টা কলল, আমার রেঞ্জের বাইরে, মাথায় কচুরিপানা নিয়ে যেভাবে ভেসে উঠেছিলাম আবার ডুবে গেছি, আমার পাবে কোথায়? পানির নিচে ডুবসাঁতার দিয়ে সরে গেছি, নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দেখি নদীতে যে কয়টা নৌকা ছিল তার নোনোটার চিহ্ন নাই, একটা শুধু উল্টো হয়ে ভেসে যাচ্ছে। দুইটা পাকিস্তানি মিলিটারি কোনোমতে সেটা ধরে ভেসে থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করলে ঐ দুটোকে শেষ করে দিতে পারতাম, কিন্তু কেন জানি মায়া হলে। জান বাঁচাবার জন্যে যখন কেউ চিৎকার করে তখন তারে মারা যায় না। আমারা ঐ দুইটাকে ছেড়ে দিলাম।

জিতু জিজ্ঞেস করল, কয়টা পাকিস্তানি মরেছিল, নানা?

সঠিক সংখ্যা তো জানি না- তিনটা নৌকা, বিশ থেকে ত্রিশজন তো হবেই।

গৌরাঙ্গ ঘরামি মাথা নেড়ে বললেন, "আরো বেশি হবে। বড় বড় নৌকা ছিল, অনেকগুলি করে উঠেছিল, মনে নাই?"

জিতু হাতে কিল দিয়ে বলল, "উচিত শিক্ষা হয়েছে। জন্মের শিক্ষা হয়েছে।"

সালাম নানা মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। তাদের খুব বড় একটা শিক্ষা হয়েছিল। কিন্তু–"

সালাম নানা কথা বলতে শুরু করে থেমে গেলেন, রাশা জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কী?"

সালাম নানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দুইদিন পরে আরো অনেক মিলিটারি এসে আশেপাশের সব গ্রাম জ্বালিয়ে মানুষ মেরে একবারে ভয়ঙ্কর অবস্থা করেছিল। বুঝলি জিতু তাই বলছিলাম যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস। আমাদের কোনো উপায় ছিল না, তাই যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু এই দেশের মানুষের যেন আর কোনোদিন যুদ্ধ করতে না হয়। কোনোদিন না। বুঝেছিস?"

জিতু মাথা নাড়ল, তার সাথে অন্যেরাও।

নৌকায় নৌকায়

জিতু মিয়া নৌকাটাতে হাত দিয়ে বলল, "আলকাতরা শুকিয়ে গেছে।"

মতি নৌকাতে হাত না দিয়েই বলল, "শুকায় নাই। আলকাতরা মোটেও শুকায় নাই। আলকাতরা এত সহজে শুকায় না।"

রাশা বলল, "যথেষ্ট শুকিয়েছে, এখন পানিতে নামাই। নৌকা টেস্টিং করি।"

মতি বলল, "আলকাতরা না শুকালে নৌকাতে পানি উঠবে।"

রাশা বলল, "নৌকাতে আমরা একটা বাটি রাখব, পানি উঠলে পানি সেঁচব।"

জয়নব বলল, "কাঁচা আলকাতরা শরীরে লেগে যাবে। জামা-কাপড়ে লেগে যাবে।"

রাশা বলল, "শরীরে একটু আলকাতরা লাগলে কিছু হয় না।"

জিতু বলল, "কেরোসিন দিলেই আলকাতরা উঠে যায়।"

রাশা বলল, "হ্যাঁ, কেরোসিন দিলেই আলকাতরা উঠে যায়।"

জয়নব বলল, "তার মানে তুই নৌকায় উঠবিই?"

রাশা দাঁত বের করে হাসল, বলল, "হ্যাঁ! আমার আর ধৈর্য হচ্ছে না। চল।"

কাজেই চারজনের ছোট দলটা নৌকাটাকে ঠেলে খালের পানিতে নামিয়ে ফেলল। গৌরাঙ্গ ঘরামি নৌকার সাথে দুইটা বৈঠা তৈরি করে দিয়েছেন। মতি দুটো লম্বা বাঁশ নিয়ে এলো লগি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। জিতু খুঁজে একটা ছোট প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে এলো নৌকায় পানি সেঁচার জন্যে।

নানি খালের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, দেখলেন একজন একজন করে নৌকায় উঠে বসল। মতি বৈঠা হাতে নিয়ে পিছনে বসেছে, তারপর ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে খালের মাঝামাঝি নিয়ে আসে। নৌকাটা একবার ঘুরে যেতে যাচ্ছিল, মতি বৈঠা দিয়ে নৌকাটাকে থামায় তারপর সামনের দিকে বেয়ে নিতে থাকে। রাশা আনন্দে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক!"

আনন্দে রাশা দাঁড়িয়ে যেতেই নৌকাটা দুলে উঠল, সাথে সাথে সে আবার বসে পড়ে। মতি বলল, "নৌকার মাঝে দাঁড়ালেই বিপদ!"

রাশা বলল, "তাই তো দেখছি।"

মতি বৈঠা দিয়ে নৌকাটাকে বেয়ে নিয়ে যেতে থাকে, রাশা আগ্রহ নিয়ে দেখে, কাজটাকে তার মোটেও কঠিন মনে হলো না, বৈঠাটা তাকে দিলে সেও নিশ্চয়ই পারবে। পানিতে ডুবিয়ে সামনে থেকে পিছনে টেনে আনা, সেটা না পারার কী আছে? রাশা বলল, "মতি! আমাকে বৈঠাটা দিবি? আমি একটু চালাই।"

"তুমি আগে নৌকা বেয়েছ?"

"নাহ্। তাতে কী হয়েছে, মোটেও কঠিন মনে হচ্ছে না।"

"দেখে কোনো কাজ কঠিন মনে হয়? সাইকেল চালানো দেখে কি কঠিন মনে হয়? কিন্তু যে চালানো জানে না সে চেষ্টা করলে কী রকম আছাড় খায় তুমি জানো?"

"তা ঠিক।"

"খালটা তো সরু, এইখানে ঠিক করে না বাইলে ডানে-বাঁয়ে লেগে যাবে। আরেকটু সামনে গিয়ে জলা জায়গায় পড়ব সেইখানে চারিদিকে পানি। তুমি সেইখানে চালিও যেদিকেই যাও সমস্যা নাই।"

"কিন্তু তোকে দেখে আমার যে লোভ হচ্ছে!"

মতি তার ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল। বলল, "আরেকটা বৈঠা আছে সেইটা দিয়ে বাইতে থাকো, তাহলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।"

রাশা তখন আরেকটা বৈঠা নিয়ে বাইতে থাকে, নৌকাটা ঘুরে যেতে যাচ্ছিল, মতি পিছনে বসে সোজা করে রাখল। দুজনে মিলে বৈঠা বাওয়ার কারণে নৌকাটা এবার আরেকটু জোরে ছুটতে থাকে।

জয়নব বলল, "আলকাতরা শুকানোর আগে নৌকাটা নামিয়েছি– এখন দেখেছ কী হচ্ছে?"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "কী হচ্ছে?"

"নৌকাতে পানি উঠছে।"

সত্যি সত্যি ধীরে ধীরে নৌকার নিচে পানি জমতে শুরু করেছে। রাশা বলল, "বসে আছিস কেন? পানি সেঁচতে শুরু কর!"

কাজেই জয়নব আর জিতু পানি সেঁচতে লাগল।

কিছুক্ষণের মাঝেই খালটা একটা জলা জায়গার সাথে এসে মিশে গেল। শুকনোর সময় চারপাশে ধানক্ষেত থাকে তার মাঝ দিয়ে খালটা আলাদা করে বোঝা যায়, এখন চারিদিকে পানি, কোথায় খাল আর কোথায় ধানক্ষেত বোঝার কোনো উপায় নেই। মাঝে মাঝে পানি থেকে গাছ বের হয়ে এসেছে, কোথাও কোথাও ঝোপঝাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে তাই বোঝা যায় পানি খুব বেশি গভীর নয়। পানি ঝকঝকে পরিষ্কার, নিচে তাকালেও পানিতে ডুবে থাকা ক্ষেত মাটি চোখে পড়ে।

রাশা বলল, "মতি, এবারে আমাকে দে, আমি নৌকা বাই।"

মতি বলল, "ঠিক আছে, আমি সরে যাই, তুমি এসে বসো।"

মতি সরে গেল, রাশা এসে তার জায়গায় বসল, নৌকাটা একটু বিপজ্জনকভাবে দুলে উঠল, কিন্তু তারা দুজনে মিলে সেটা সামলে নেয়।

রাশা বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকাটা বাইতে শুরু করে– কী আশ্চর্য, সত্যি সত্যি নৌকাটা এগিয়ে যেতে থাকে! বেশ খানিক দূর গিয়ে রাশা সবার দিকে তাকাল, বলল, "দেখলি?"

কোনো একটা কারণে তখন জয়নব আর জিতু হেসে কুটি কুটি হচ্ছে, মতির মুখ দেখে মনে হলো তারও হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সে ভদ্রতা করে হাসছে না। রাশা একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হলো, তোরা হাসছিস কেন?"

জিতু বলল, "তোমার নৌকা চালানো দেখে!"

"আমার নৌকা চালানোতে হাসির ব্যাপারটা কোন জায়গায়।"

"তুমি কি জানো, তুমি এক জায়গায় ঘুরছ!"

"আমি? এক জায়গায় ঘুরছি?"

"হ্যাঁ।"

রাশা এবার একটু সামনে তাকাল এবং আবিষ্কার করল সত্যি সত্যি নৌকাটা সামনে যাচ্ছে না, এটা এক জায়গায় ঘুরে যাচ্ছে!

রাশা বলল, "কী আশ্চর্য! মতি, তুই যখন বৈঠা চালাস তখন দেখি নৌকাটা সোজা যায়। আমি চালালে ঘুরে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি?"

মতি হাসল, "এই জিনিসটাই শিখতে হবে। এইটাই হচ্ছে নৌকা চালানো! এমনভাবে বৈঠা চালাবে যেন তুমি চাইলে নৌকাটা সোজা যাবে, চাইলে ডান দিকে যাবে, আবার চাইলে বাম দিকে যাবে।"

রাশা বলল, "দেখে মনে হয় কত সোজা, কিন্তু কাজটা তো দেখি কঠিন!"

মতি বলল, "যতক্ষণ না জানো ততক্ষণ কঠিন। যখন জানবে তখন দেখবে কাজটা পানির মতো সোজা!"

রাশা তখন মুখ শক্ত করে নৌকা চালানো শিখতে শুরু করল, তার মুখ দেখে মনে হতে থাকে, এর ওপরেই বুঝি তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে!

রাত্রিবেলা রাশা আর নানি খেতে বসেছে, রাশা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, "নানি, তুমি কোনোদিন নৌকা চালিয়েছ?"

নানি চোখ কপালে তুলে বললেন, "আমি কোন দুঃখে নৌকা চালাতে যাব? একটু পরে জিজ্ঞেস করবি, নানি তুমি কোনোদিন রিকশা চালিয়েছ?"

রাশা হাসল, বলল, "না সেটা জিজ্ঞেস করব না।"

"না করলেই ভালো।"

"বুঝলে নানি, তোমার দেখে মনে হবে নৌকা চালানো বুঝি খুব সোজা। আসলে এত সোজা না, তুমি যদি ঠিক করে বৈঠা না বাইতে পার তাহলে নৌকাটা এক জায়গায় ঘুরতে থাকবে।"

"তোর ব্যাপারস্যাপার আমি খুব ভালো বুঝি না। স্কুলে যাবার জন্যে একটা নৌকা দরকার সেটা না হয় বুঝলাম। সেই নৌকা তোর কেন বাইতে হবে?"

"আমি একা বাইব কে বলেছে, সবাই বাইব।"

"এই যে ঢ্যাং ঢ্যাং করে একশ রকম কাজ করে বেড়াস, কোনদিন যে কোন বিপদে পড়বি খোদাই জানে।"

রাশা কিছুক্ষণ চোখের কোনা দিয়ে তার নানিকে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, "নানি।"

"কী হলো?"

"আমি যে এইরকম উল্টাপাল্টা কাজ করি, তুমি কি সে জন্যে আমার ওপরে বিরক্ত হও!"

নানি হাসলেন, বললেন, "ধুর বোকা মেয়ে, বিরক্ত হব কেন?" একটু থেমে বললেন, "আসলে কী হয়েছে জানিস?"

"কী হয়েছে নানি?"

"এই যে তুই আমার সাথে থাকিস, দিন-রাত পাগলামি করিস, আমার সাথে বকবক করিস, আমার সময়টা তখন কেটে যায়। আগে মনে হতো সময়টা হচ্ছে একটা বোঝা, কিছু একটা চিন্তা করলেই মনে হতো মাথাটা বুঝি আউলে যাচ্ছে। এখন আর হয় না– প্রায় প্রত্যেক দিন আমি শান্তিতে ঘুমাই!"

রাশা তার ঝোল মাখা হাত দিয়ে নানিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সত্যি নানি? তোমার এখন শান্তিতে ঘুম হয়?"

"হ্যাঁ। গত রাতে আমি তোর নানাকে স্বপ্নে দেখলাম। আগে যখনই স্বপ্ন দেখেছি মনে হচ্ছে তোর নানাকে কেউ অত্যাচার করছে, গুলি করছে, চিৎকার করছে, আমি লাফ দিয়ে উঠে সারারাত বসে থেকেছি। ভয়ে চোখ বন্ধ করতে পারিনি।"

রাশা কিছু না বলে নানির দিকে তাকিয়ে রইল। নানি বললেন, "গত রাতে প্রথমবার তোর নানাকে স্বপ্নে দেখলাম, ধবধবে সাদা একটা কাপড় পরে এসেছে, মুখে একটু একটু হাসি। আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী জোবেদা! নাতনিকে পেয়ে আমাকে ভুলে গেছ! আমি বললাম, ওমা! এটা কী বলছ? তোমাকে আমি ভুলব কেমন করে? তোমার শরীরটা ভালো? তোমার নানা বলল, হ্যাঁ ভালো। আমাকে বলল, এক গ্লাস পানি দেবে বউ। আমি কলসি থেকে ঢেলে পানি দিলাম, সে এক চুমুক করে খায় আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসে! তারপর ঘুম ভাঙল, দেখি ঘরের মাঝে কী সুন্দর ফুলের গন্ধ। বুঝলি রাশা, বুকের ভিতরটা একবারে ভরে গেল আমার।"
নানি রাশার দিকে তাকিয়ে হাসলেন কিন্তু তার চোখ থেকে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল।

পরদিন অস্ট্রেলিয়া থেকে রাশার একটা চিঠি এলো। বিদেশি চিঠি তাই পিয়নকে বখশিশ দিতে হলো, রাশার চিঠিটা খুলতে ভয় হচ্ছিল, তারপরেও তাকে খুলতে হলো। চিঠির ভেতরে একটা কার্ড, একটা মাঠের মাঝে অনেকগুলো ক্যাঙারুর ছবি। সাথে আম্মুর লেখা একটা চিঠি, সেই চিঠিতে অস্ট্রেলিয়ার নানারকম বর্ণনা। দোকানগুলো কত সুন্দর, সেখানে কতরকম জিনিস পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট কত পরিষ্কার, মানুষজন কত ভদ্র– এইসব নানা কথা লেখা। বাংলাদেশে এখন গরম কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় এখন শীতকাল সেটাও লেখা আছে। তার বাইরে কোনো কথা নেই– নিজের সম্পর্কেও নেই, রাশার সম্পর্কেও নেই। এটি যেন কোনো মেয়ের কাছে লেখা তার মায়ের চিঠি নয়, এটি যেন খবরের কাগজে লেখা একজন মানুষের চিঠি!

চিঠিটা পড়ে রাশার যেটুকু না মন খারাপ হলো তার থেকে অনেক বেশি লজ্জা হলো। কার জন্যে লজ্জা সেটা সে বুঝতে পারল না।

নৌকার ব্যবস্থা হওয়ার পর সবাই বেশ আগ্রহ নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। নৌকাতে কেউ বসে থাকে না, হয় বৈঠা বাইছে না হয় লগি দিয়ে ঠেলাঠেলি করছে। কাজেই ছোট নৌকাটা রীতিমতো বাইচের নৌকার মতো ছুটে যায়। শুধু তাই নয় নদীতে ওঠার পর নদীর একটা বাঁক মাঝে মাঝে শর্টকাট মেরে দেয়া হয়। নদীতীরে নৌকা চালানোর মতো যথেষ্ট পানি নেই, সেখানে হাঁটুপানি এবং কাদা, সেই অংশটাতে নৌকা থেকে নেমে ধাক্কা দিয়ে সেটাকে শুকনোর ওপর দিয়ে ঠেলে আবার নদীতে নামিয়ে দেয়া হয়। স্কুলে পৌঁছানোর পর তাদের গা, হাত, পা কাদা এবং পানিতে মাখামাখি থাকে, বই-খাতা ভিজে জবজবে হয়ে থাকে কিন্তু সেসব নিয়ে কেউ-ই খুব বেশি মাথা ঘামায় বলে মনে হয় না! বেশ চলে যাচ্ছে দিন। স্কুলে কম্পিউটার ল্যাবটা তৈরি হয়েছে, টেবিল-চেয়ার বসানো হয়েছে, এখন যে কোনোদিন কম্পিউটারগুলো চলে আসবে। রাশা খোঁজ নিয়ে জেনেছে চিঠি চালাচালি হচ্ছে।

দেখতে দেখতে বর্ষাকাল চলে এসেছে। প্রথম প্রথম বৃষ্টি হতো ছাড়াছাড়াভাবে। আজকাল একেবারে নিয়মিত বৃষ্টি হয়। আর সে কী বৃষ্টি, রাশা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। টিনের ছাদে যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে তার চাইতে সুন্দর কোনো শব্দ পৃথিবীতে হতে পারে কিনা রাশার

জানা নেই। চারপাশের গাছপালাগুলো ঘন সুবজ। পাতাগুলো সতেজ আর পুরুষ্ট। যেদিকেই তাকায় মনে হয় মাটি ফেটে সবুজ লকলকে গাছ বের হয়ে আসবে। গাছগুলো যেন গাছ নয়, যেন এরা জীবন্ত প্রাণী। সামনের খাল পানিতে ভরে গেছে, সেখানে এখন রীতিমতো স্রোত, পানি খলখল শব্দ করে বয়ে যায়। সামনে তাকালে দেখা যায় আগে যেখানে মাঠ ছিল সব পানিতে ডুবে আছে, দেখে মনে হয় যেন একটা সমুদ্রের মাঝে নানি বাড়িটা ছোট একটা দ্বীপ।

যে জায়গা পানিতে ডোবেনি সেখানে কাদা। প্যাঁচপ্যাঁচে আঠালো কাদা, অনেক চেষ্টা করেও রাশা এই কাদাতে অভ্যস্ত হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। বাইরে যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে তখন সে জানালার কাছে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে লেখাপড়া করে। জাহানারা ম্যাডাম তাকে যে বইগুলো পাঠিয়েছিলেন সে সেগুলো মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখেছে। এখন সে সেগুলো পড়তে শুরু করেছে। প্রথম প্রথম একটু কঠিন লেগেছে, যখন সে ঠিক করে মনোযোগ দিয়েছে হঠাৎ করে সে একটা অন্যরকম মজা পেতে শুরু করেছে। গণিতের ভেতর যে এত বিচিত্র ব্যাপার লুকিয়ে ছিল সে জানত না। তার কাছে সবচেয়ে অবাক লাগছে পদার্থবিজ্ঞান, আইনস্টাইন তার স্পেশাল রিলেটিভিটি দিয়ে সময়ের এমন সব বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলেছেন যে সে পড়ে হতবাক হয়ে যায়। পড়েও তার বিশ্বাস হয় না, মানুষ যেভাবে ডিটেকটিভ বই পড়ে রাশা সেভাবে তার বিজ্ঞানের বইগুলো পড়ছে।

নানি তাকে দেখেন আর মাথা নেড়ে বলেন, "তোর রকমসকম বুঝি না! একজন মানুষ দিন নাই রাত নাই মাথা গুঁজে পড়ে কেমন করে? এমন যদি হতো যে পরীক্ষা আছে তাহলেও বুঝতে পারতাম।"

রাশা বলে, "নানি তুমি আমার কাছে বসো। আমি তোমাকে স্পেশাল রিলেটিভিটি বোঝাই, তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

নানি বললেন, "রক্ষা কর আমাকে! অনেক কষ্ট করে মাথাটা একটু ঠিক করেছি। তুই এখন আবার পুরোটা আউলে দিবি!"

এর মাঝে একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটল। ঘরে বসে ঘাড় গুঁজে গুঁজে লেখাপড়া করতে করতে একদিন রাশা আবিষ্কার করে তার সব খাতা

শেষ হয়ে গেছে। বাজারে যাওয়া এখন সোজা কথা নয়, সে মতিকে কিছু টাকা দিয়ে বলল, কেউ যদি বাজারে যায় তাহলে তার জন্য যেন কয়টা খাতা কিনে নিয়ে আসে।

দুইদিন পর মতি চারটা খাতা এনে দিল। খবরের কাগজ দিয় মুড়ে সুন্দর করে বেঁধে-ছেঁদে দিয়েছে। রাশা বাঁধন খুলে খাতাগুলো বের করল, খবরের কাগজটা ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ সে থেমে যায়, সেখানে খুব পরিচিত একটা ছবি। একজন থুরথুরে বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথার উপর দিয়ে রকেট উড়ে যাচ্ছে, রকেটের মানুষটি কমবয়সী। থিওরি অব রিলেটিভিটি বর্ণনা করতে হলেই দুই ভাইয়ের এই কাহিনীটা থাকে, এক ভাই রকেটে করে ঘুরেফিরে এসে দেখে অন্য ভাই থুরথুরে বুড়ো হয়ে গেছে! রাশা আগ্রহ নিয়ে লেখাটি পড়ল, খবরের কাগজের বিজ্ঞানের পাতায় কোনো একজন থিওরি অব রিলেটিভিটি নিয়ে লিখেছে, রাশা পুরোটা পড়ল, বেশ ভালোই লিখেছে। যে লিখেছে সে কঠিন জিনিস সোজা করে লিখতে পারে!

রাশা খবরের কাগজটা উল্টায়, অন্য পৃষ্ঠায় খবরের কাগজের কোনায় বড় বড় করে লেখা, "সায়েন্স অলিম্পিয়াড" নিচে বিজ্ঞানের দশটি প্রশ্ন। এই দশটি প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠাতে হবে, যারা শুদ্ধ উত্তর দেবে তাদের নিয়ে ঢাকায় একটা জাতীয় অলিম্পিয়াড হবে। তবে ছাত্র বা ছাত্রীরা প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজে দিয়েছে সেটা স্কুলের হেডমাস্টারকে সত্যায়িত করে দিতে হবে। প্রশ্নের উত্তর দিতে একসপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছিল, খবরের কাগজটি তিনদিনের পুরনো, উত্তর পাঠানোর জন্যে আর মাত্র চারদিন সময় বাকি আছে।

রাশা খবরের কাগজটা নিয়ে তার বিছানায় বসে পড়ে। প্রথম তিনটার উত্তর পানির মতো সোজা। পরের তিনটার উত্তরটা কেমন করে বের করতে হবে সে জানে তবে সে জন্যে তাকে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হবে। পরের চারটার উত্তর কী হবে সে সাথে সাথে বুঝতে পারল না। চিন্তা করতে হবে।

রাশা পেন্সিলটা কামড়াতে কামড়াতে চিন্তা করতে থাকে।

খেতে খেতে নানি জিজ্ঞেস করলেন, "কী এত চিন্তা করিস রাশা?"

"একটা মানুষ রকেটে করে মহাকাশে গেছে– সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময়–"

"তোর খেতে খেতে এটা চিন্তা করতে হবে?"

রাশা নানির দিকে তাকিয়ে বোকার মতো একটু হাসল, বলল, "মাথার মাঝে ঢুকে গেছে, বের করতে পারছি না।"

"বের করে ফেল। না হলে আমার মতো অবস্থা হবে। মাথা আউলে যাবে।"

রাশা হি হি করে হাসল, কিন্তু মাথা থেকে বের করতে পারল না, চিন্তা করতেই থাকল। খেতে খেতে সে এটা চিন্তা করল, খাওয়ার পর বাসনপত্র তুলে নানিকে সাহায্য করার সময় সেটা চিন্তা করল, দাঁত মাজার সময় চিন্তা করল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করল, ঠিক যখন চোখে ঘুম নেমে আসছে তখন হঠাৎ সে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসল! সমস্যাটা কেমন করে করতে হবে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হঠাৎ করে সেটা সে বুঝতে পেরেছে। তখনই বাতি জ্বালিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসে বসে তার অঙ্কটা করার ইচ্ছে করছিল কিন্তু সে করল না। নানি নিচে গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছেন, সে এখন বাতি জ্বালালে নানি উঠে পড়বেন। আগে নানি সারা রাত শুয়ে ছটফট করতেন, আজকাল শান্তিতে ঘুমান, রাশা তাই তাকে একটুও ডিস্টার্ব করতে চায় না।

পরের পুরো দিনটা রাশা ভেবে ভেবে আরো দুটো অঙ্ক করে ফেলল, এখন বাকি আছে মাত্র একটা– সেটা সে কিছুতেই করতে পারল না। যতবার চেষ্টা করেছে ততবার আটকে গেছে, তার কাছে মনে হচ্ছে নতুন একধরনের গণিত না জানলে সে মনে হয় এটা করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এখন পর্যন্ত যে কয়টা করতে পেরেছে সেগুলোই সে লিখে পাঠিয়ে দিবে। এটা বাজার থেকে কুরিয়ার করে পাঠাতে হবে, পাঠানোর আগে হেডমাস্টারের একটা সাইন নিতে হবে। হাতে মোটেই সময় নেই।

সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে, স্কুল বন্ধ তাই হেডমাস্টারকে তার বাসায় গিয়ে ধরতে হবে। এখন যদি রওনা দেয় তাহলে সবকিছু শেষ করে সন্ধে হওয়ার আগে ফিরে আসতে পারবে, তাই রাশা আর দেরি করল না, তখন তখনই বের হয়ে গেল।

জয়নব তার খালার বাড়ি গিয়েছে, মতির কোনো হদিস নেই, জিতুর জ্বর– কাঁথা মুড়ি দিয়ে কোঁ কোঁ করছে। রাশা এই গ্রামের আরো কিছু

বাচ্চাকাচ্চাকে চিনে কিন্তু তাদের কাউকেই খুঁজে পেল না, যার অর্থ তার একাই যেতে হবে। সেটা এমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, স্কুল যখন খোলা ছিল তখন সে এক-দুইবার একা একা নৌকা চালিয়ে গিয়েছে।

রাশা তাই একটা পলিথিনের ব্যাগের ভেতর তার কাগজপত্রগুলো ভরে নৌকা করে রওনা দিল। খালটা পার হয়ে সে বিলে এসে পড়ল, বিলের মাঝামাঝি দিয়ে পাড়ি দিয়ে ছোট নদীটাতে হাজির হলো। বর্ষায় পানিতে ছোট নদীটা অবশ্য এখন আর ছোট নেই বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। নদীর তীর ঘেঁষে রাশা তার ছোট নৌকাটা বেয়ে নিয়ে যায়। ব্রিজের কাছাকাছি এসে সে নদীটা পাড়ি দিয়ে অন্য পারে আসে, বাজারের গোড়ায় নৌকাগুলো থাকে, সেখানে সেটাকে বেঁধে ওপরে উঠে আসে। এই ঘাটে তাদের পরিচিত মাঝি আছে, কাজেই কেউ তার এই ছোট নৌকা নিয়ে চলে যাবে সেরকম আশঙ্কা নেই।

রাশা ভিজে চুপসে গেছে কিন্তু আজকাল সে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আগে সে জানত বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয়, এখানে এসে সে আবিষ্কার করেছে সেটা একেবারেই বাজে কথা। একজন মানুষ যতক্ষণ খুশি বৃষ্টির পানিতে ভিজতে পারে, তাতে কিছুই হয় না! এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ বৃষ্টির পানিতে ভিজে ভিজে কাজ করে, সে জন্যে কারো জ্বর উঠে না, কারো শরীর খারাপ হয় না।

রাশা তাদের হেডমাস্টারের বাসায় এলো, বাসাটা সে চিনে কিন্তু আগে আসেনি। ভয় ছিল গিয়ে দেখবে হেডমাস্টার বাসায় নেই, তখন একটা মহাঝামেলা হয়ে যাবে, কিন্তু সে হেডমাস্টারকে পেয়ে গেল।

রাশাকে দেখে হেডমাস্টার চোখ কপালে তুলে বললেন, "সে কী? তুমি এরকম ভিজে ভিজে কোথা থেকে আসছ? কী ব্যাপার?"

রাশা হেডস্যারকে পুরো ব্যাপারটা বোঝাল, হেডস্যার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন বলে মনে হলো না। খানিকক্ষণ মুখ হাঁ করে থেকে বললেন, "তুমি এই অঙ্কগুলো করে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার কাছে নিয়া আসছ আমাকে দিয়ে সাইন করানোর জন্যে?"

"জি স্যার।"

"তাহলে কী হবে?"

"তাহলে আমি যাদের কাছে পাঠাব তারা বুঝবে যে আসলে আমিই সেগুলো করেছি, অন্য কেউ আমাকে করে দেয় নাই।"

"তাতে লাভ?"

"যারা করতে পারবে তাদের ডেকে একটা অলিম্পিয়াড হবে। সায়েন্স অলিম্পিয়াড। বিজ্ঞানের অলিম্পিয়াড।"

"সেটা কী জিনিস?"

রাশা মাথা চুলকাল, "আমি ঠিক জানি না স্যার।"

"তুমি ঠিক জানো না?"

"না স্যার।"

"না জেনেই তুমি এইসব করছ?"

"আমার মনে হয় একটা পরীক্ষার মতোন কিছু হবে।"

হেডমাস্টার ভুরু কুঁচকালেন, "বৃত্তি পরীক্ষা?"

"হতে পারে স্যার। বৃত্তি পরীক্ষার মতো কিছু একটা হতে পারে।"

হেডমাস্টার তখন কাগজগুলোতে সাইন করে দিলেন। তার বাসাতেই সিল ছিল, সাইনের নিচে সিলও মেরে দিলেন। রাশা হেডমাস্টারের বাসা থেকে বের হয়ে একটা কুরিয়ারের দোকানে গেল, সেটা যেন কালকেই পৌঁছে দেয় সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ অনুরোধ করে সে খবরের কাগজের ঠিকানায় তার অঙ্কগুলো কুরিয়ার করে দিল।

সেখান থেকে বের হয়ে সে একটা দোকান থেকে তার নানির জন্যে একটা নারকেল তেলের ছোট বোতল কিনল। নিজের জন্যে কিনল আরো কয়েকটা খাতা আর দুইটা বলপয়েন্ট কলম। তার নানি কারণে-কারণে তাঁর মাথায় নারকেল তেল মাখেন, নানির ধারণা মাথায় নারকেল তেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। তাই সুযোগ পেলেই রাশা নানির জন্যে নারকেল তেল কিনে নিয়ে যায়।

খাতা, কলম আর নারকেল তেলের বোতলটা নিয়ে সে তার নৌকায় বসে বাড়িতে রওনা দেয়। ব্রিজের কাছাকাছি এসে নদীটা পার হয়ে তীর ঘেঁষে সে নৌকা বাইতে থাকে। এতক্ষণ ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন ঝমঝম করে বৃষ্টি হতে থাকে। নদীর পানিতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো একটা বিচিত্র শব্দ তৈরি করছে। রাশা দ্রুত বৈঠা টানতে থাকে, নদীর তীরে তীরে ছোট ছোট গ্রাম, সেখানে মানুষজন থাকে। যখন সে বিলের মাঝে ঢুকবে

তখন সেখানে কোনো জনমানুষ থাকে না। পুরো বিলটা আড়াআড়িভাবে পার হতে হবে, জিতু যখন থাকে তখন সারাক্ষণই সে এই বিল নিয়ে বিচিত্র সব ভৌতিক ইতিহাস বলতে থাকে। রাশা মোটেও সেগুলো বিশ্বাস করে না কিন্তু এই মুহূর্তে তার সবগুলো গল্প মনে পড়ে গেল। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, তার মাঝে রাশা ছোট খালটা দিয়ে বিলের মাঝে এসে ঢুকল। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। বৃষ্টির জন্যে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, এখন সে জানে কোনদিকে যেতে হবে, একটু পর যখন কোনোদিক তীর দেখা যাবে না তখন সে কেমন করে বুঝবে কোনদিকে যাবে? যদি এই বিলে সে হারিয়ে যায়? যদি অন্ধকার নেমে আসে? যদি এই বিল থেকে সে আর কোনোদিন বের হতে না পারে? রাশার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধক করে ওঠে।

আড়াআড়ি বিলটা পার হতে হবে, রাশা যতটুকু সম্ভব সোজা নৌকা চালিয়ে নিতে থাকে। সে চেষ্টা করে যেন নৌকার মাথাটা ডানে-বাঁয়ে ঘুরে না যায়। তাহলে জনমানবহীন এই নির্জন বিলটাতে সে আটকা পড়ে যাবে। যদি বৃষ্টি না থাকত তাহলে দূরে গ্রামগুলো দেখা যেত, কোনো সমস্যা হতো না।

ঠিক এরকম সময় সে ঝুনঝুন একটা শব্দ শুনল, মনে হলো কেউ যেন নূপুর পায়ে নাচছে, রাশা ভয়ানক চমকে উঠেছিল, ঠিক তখন সে দেখল কিছু একটা ভেসে ভেসে তার দিকে আসছে। চার কোনায় চারটা লাল পতাকা, ভেতরের অংশটা রঙিন কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা। রাশা কৌতূহলী হয়ে তাকাল, চোখ থেকে বৃষ্টির পানি সরিয়ে ভালো করে দেখে বুঝল এটা আসলে একটা ভেলা। ভেলায় কেউ নেই কিন্তু সেটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এর মাঝে নিশ্চয়ই ঘণ্টা বেঁধে রাখা হয়েছে, বাতাসে সেগুলো ঝুনঝুন শব্দ করে নড়ছে।

রাশা তার নৌকাটা ভেলাটার কাছে নিয়ে যায়, ভেলাটাকে ধরে সে উপরে তাকাল এবং সাথে সাথে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। ভেলার উপর একটা মেয়ের মৃতদেহ। রাশা এর আগে কখনো একটা মৃতদেহ দেখেনি, কিন্তু তবু তার বুঝতে একটুও দেরি হলো না যে এটা একটা মৃতদেহ। মেয়েটিকে সুন্দর কাপড় পরে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল বৃষ্টির পানিতে সব ভেসে গেছে। মেয়েটার চোখ অল্প একটু খোলা, মুখের.

ফাঁক দিয়ে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। মনে হয় এক্ষুণি উঠে বসবে। রাশা ভেলাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নৌকাটাকে প্রাণপণে বাইতে শুরু করে কিন্তু সে অবাক হয়ে লক্ষ করল ভেলাটা তার নৌকার পিছু পিছু আসতে শুরু করেছে। রাশা ভয়াবহ আতঙ্কে কাঁপতে থাকে, তার মনে হতে থাকে এক্ষুণি বুঝি মৃতদেহটা ভেলার মাঝে উঠে দাঁড়াবে, তারপর মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে খলখল করে হাসতে শুরু করবে। কিংবা খপ করে তার নৌকাটা ধরে ফেলবে, তারপর তার নৌকায় উঠে বসবে। রাশা জানে একটা মৃতদেহ কখনোই সেটা করতে পারবে না কিন্তু তারপরেও একধরনের অবর্ণনীয় ভয়ে সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকাটা বাইতে থাকে।

তার পিছনে তাকাতে ভয় হচ্ছিল, সে শুনতে পেল ঘণ্টার ঝুনঝুন শব্দটা আস্তে আস্তে কমতে কমতে মিলিয়ে গেল। তখন সে ভয়ে ভয়ে পিছনের দিকে তাকাল, দেখল বহুদূরে ভেলাটি ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে! কী আশ্চর্য। কী ভয়ঙ্কর!

রাত্রিবেলা রাশা আজ তার নানিকে ধরে ঘুমাতে গেল। নানি তার গায়ে-মুখে আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁ দিয়ে বললেন, "তোকে নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তাতেই পড়ে যাই রে।"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ নানি। আমিও মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাই!"

"তোর একা একা এই বিল পাড়ি দেয়ার দরকারটা কী পড়েছিল?"

"আমি একা একা যেতে চাচ্ছিলাম না, কাউকে পেলাম না তাই একাই গেলাম।"

"আর যাবি না।"

"ঠিক আছে নানি। আর যাব না।"

"পৃথিবীতে কত রকম বিপদ হতে পারে–"

"নানি, একটা মরা মানুষ আর কী করবে?"

"আমি মরা মানুষকে ভয় পাই না। আমি ভয় পাই জ্যান্ত মানুষকে। পৃথিবীতে কত বজ্জাত মানুষ আছে তুই জানিস?"

"একটু একটু জানি।"

"কাজেই সাবধান থাকবি।"

"থাকব নানি।"

রাশা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "নানি।"

"কী হলো?"

"ঐ মেয়েটাকে ভেলায় করে ভাসিয়ে দিয়েছে কেন?"

"মেয়েটাকে নিশ্চয়ই সাপে কামড়েছে। সাপে কামড়ালে এভাবে ভেলায় করে মরা মানুষটাকে ভাসিয়ে দেয়।"

"কেন নানি?"

"তারা বিশ্বাস করে মরা মানুষটা ভেলায় করে সাপের ওঝার বাড়ির ঘাটে এসে লাগে। ওঝা তখন মানুষটাকে বাঁচিয়ে তোলে।"

"এটা কেমন করে হবে? মরা মানুষ কী বাঁচতে পারে?"

নানি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "পারার কথা না। তবু আপন মানুষেরা এটা বিশ্বাস করতে চায়। মৃত্যুকে কেউ মেনে নিতে পারে না। কেউ না।"

নানি হঠাৎ চুপ করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

গভীর রাতে রাশা চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল। তার মনে হলো, ভেলার মাঝে ভেসে থাকা মেয়েটি উঠে তার হাত ধরে টানছে, বলছে, "আমায় ফেলে চলে এসেছিস কেন? আয় আমার সাথে। আয়!"

রাশা নানিকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে শুয়ে রইল।

মাক্কু চোরার বউ

দুপুরবেলা সবাই পুকুরে গোসল করতে নেমেছে, তখন রাশা জয়নবকে বলল, "আয় দেখি, কে বেশি সময় পানিতে ডুবে থাকতে পারে!"

জয়নব বলল, "ঠিক আছে।"

জিতু বলল, "আমিও ডুবে থাকব।"

রাশা বলল, "তোর সাথে কম্পিটিশনে যেয়ে লাভ নাই। তুই তো আর মানুষ না, তুই হচ্ছিস বাইন মাছ।"

জিতু হি হি করে হেসে বলল, "আজিব! তুমি আজিব!"

তারপর তিনজন একসাথে পানিতে ডুব দিল। রাশার একসময় যেরকম পানি নিয়ে একধরনের ভয় ছিল এখন সেটি নেই। জিতুর মতো না হলেও সে মোটামুটি পানিতে সাঁতার দিতে পারে। পানিতে ডুবে পুকুরের একমাথা থেকে প্রায় অন্যমাথায় চলে যেতে পারে। ইদানীং শুরু হয়েছে নতুন খেলা, কে কতক্ষণ পানিতে ডুবে থাকতে পারে তার কম্পিটিশন। প্রথম প্রথম কয়েক সেকেন্ড পরেই রাশা ছটফট করে পানি থেকে বের হয়ে আসত। আজকাল দীর্ঘ সময় সে নিশ্বাস না নিয়ে পানিতে ডুবে থাকতে পারে। আজকেও সে কম্পিটিশনে জয়নবকে হারিয়ে দিল। জিতুকে অবশ্যি হারানোর কোনো প্রশ্নই আসে না, কেমন করে এতক্ষণ পানির নিচে ডুবে থাকে কে জানে! দীর্ঘ সময় পর সে ভুস করে পানির নিচ থেকে বের হয়ে এলো।

রাশা বলল, "জিতু, তুই পানির নিচে এতক্ষণ কেমন করে থাকিস?"

জয়নব বলল, "বড় হয়ে মাক্কু চোরা হবি নাকি?"

রাশা বলল, "মাক্কু চোরা? আমরা যে দেখতে গিয়েছিলাম? যার পরীর মতো সুন্দর একটা বউ আছে?"

"হ্যাঁ। সে পানির নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে!"

"ধুর!" রাশা বলল, "কেউ পানির নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে না। মানুষ নিশ্বাস না নিয়ে এক-দুই মিনিটের বেশি থাকতে পারে না। অক্সিজেন লাগে।"

জিতু বলল, "মাক্কু চোরার অক্সিজেন লাগে না। মাছের মতন পানি দিয়ে নিশ্বাস নেয়।"

"ধুর!"

"খোদার কসম। মাক্কু চোরার কানকো আছে।"

"বাজে কথা বলবি না।" রাশা ধমক দিল, "মানুষের কানকো থাকে না।"

"আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

রাশা চোখ বড় বড় করে বলল, "তুই মাক্কু চোরার কানকো দেখেছিস? কোথায় আছে কানকোগুলি?"

"কানকো দেখি নাই, কিন্তু পানির নিচে ডুবে থাকতে দেখেছি। দুই ঘণ্টা পানির নিচে ছিল।"

রাশা বলল, "মিথ্যা কথা বলবি না! একজন মানুষ যদি নিশ্বাস না নিয়ে পানির নিচে দুই ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে তাহলে এই খেলাটা দেখিয়ে সে লাখ টাকা কামাই করতে পারবে। তার চুরি করে দিন কাটাতে হবে না।"

জিতু বলল, "মাক্কু চোরার তো চুরির নেশা। চুরি না করলে তার ভালোই লাগে না।"

"সেই কথা বল। কিন্তু পানির নিচে দুই ঘণ্টা থাকে সেই কথা বলবি না।"

"থাকে।" জিতু মুখ শক্ত করে বলল, "দুই ঘণ্টা থাকে।"

রাশা বলল, "বাজে কথা বলবি না। দেব একটা থাবড়া।"

জয়নব বলল, "বাজে কথা না, রাশা। মাক্কু চোরা আসলেই পারে।"

"হতেই পারে না।"

"সবাই দেখেছে। চুরি করে পালাচ্ছিল তখন লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল।

সেই পানি থেকে আর উঠে না। শেষে জাল ফেলে তুলেছে। পানির নিচে চুপচাপ বসে ছিল।"

"হতেই পারে না।"

"হয়েছে।" জয়নব বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে তুই অন্যদের জিজ্ঞেস করে দেখ।"

রাশা অন্যদের জিজ্ঞেস করে দেখল, আশ্চর্যের ব্যাপার সবাই বলল কথাটা সত্যি। এরকম ব্যাপার সবসময় শোনা কথা হয় কিন্তু এবারে রাশা কয়েকজনকে পেয়ে গেল যারা ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছে। সত্যি সত্যি মাক্কু চোরা দুই ঘণ্টা পানির নিচে ডুবে ছিল, রীতিমতো জাল ফেলে তুলতে হয়েছে।

রাশা তখন ঠিক করল সে মাক্কু চোরাকে গিয়ে নিজে জিজ্ঞেস করবে। একদিন দুপুরবেলা তাই জিতুকে নিয়ে রওনা দিল। সেই প্রথম যখন এসেছিল তখন একবার মাক্কু চোরার বাড়ি গিয়েছিল, মাক্কু চোরা থেকে তার পরীর মতো বউটার কথা বেশি মনে আছে।

আগেরবার যখন এসেছিল তখন মাক্কু চোরা বারান্দায় বসে বাঁশের চাঁচি দিয়ে একটা খলুই না কী যেন বানাচ্ছিল, আজকে সে পায়ের সাথে বাঁধিয়ে দড়ি পাকাচ্ছে, মুখের কোনায় একটা জ্বলন্ত বিড়ি। রাশা আর জিতুকে দেখে সে একটু সন্দেহের চোখে তাকাল। জিতু বলল, "মাক্কু চাচা, ভালো আছেন?"

মাক্কু চোরা বিড়ি টানতে টানতে নাক দিয়ে একধরনের অস্পষ্ট শব্দ করল।

জিতু বলল, "রাশা আপু তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে।"

মাক্কু চোরা কোনো কথা না বলে সরু চোখে রাশার দিকে তাকাল। জিতু বলল, "তোমার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই।"

মাক্কু চোরা এই প্রথম একটা কথা বলল, জিজ্ঞেস করল, "কী জিনিস?"

রাশা একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি নাকি নিশ্বাস না নিয়ে পানির নিচে থাকতে পারেন?"

মাক্কু চোরা কোনো কথা না বলে সরু চোখে রাশার দিকে তাকিয়ে রইল। রাশা আবার জানতে চাইল, "পারেন?"

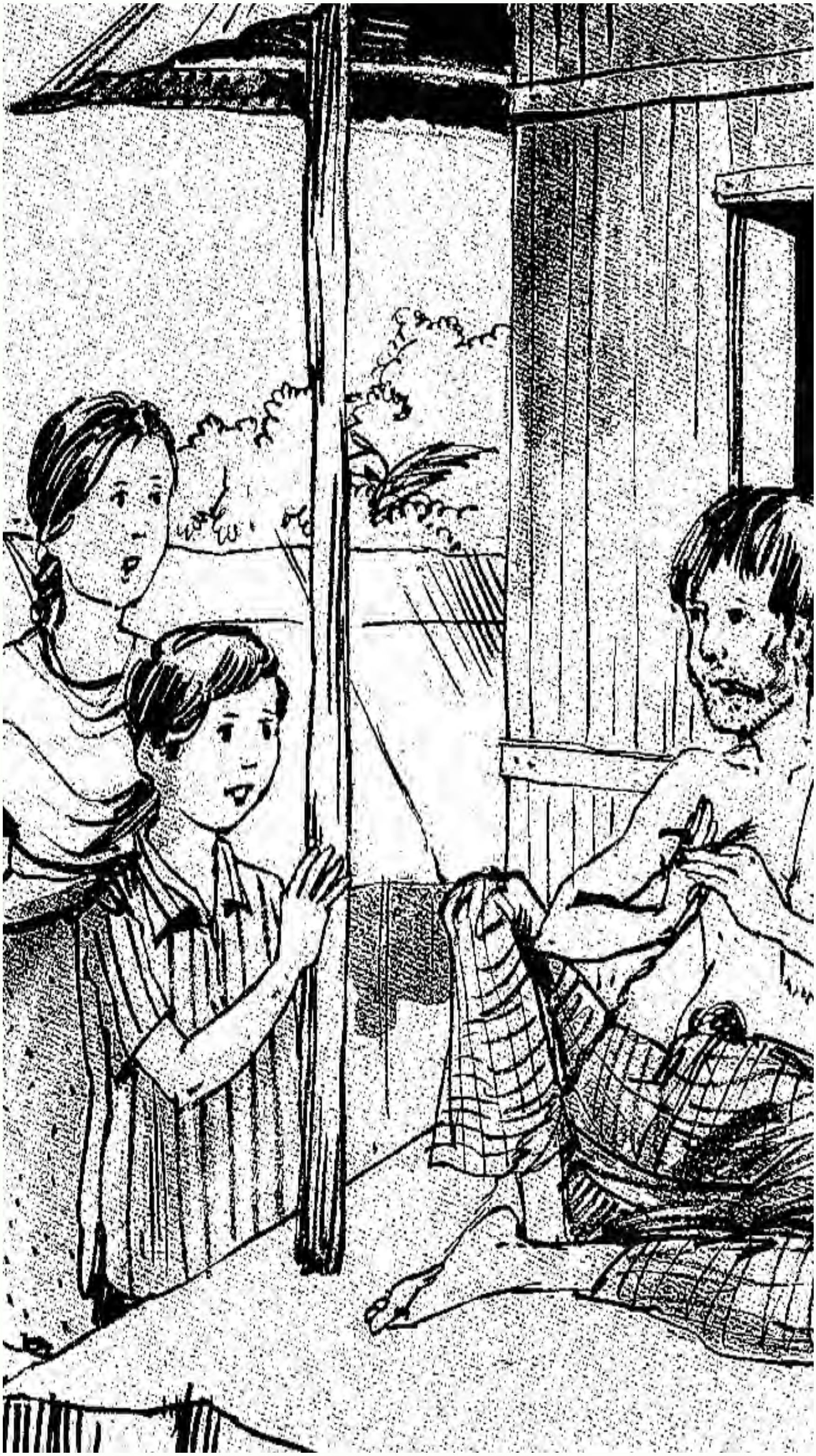

মাক্কু চোরা এবারে অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল।

"সত্যি পারেন?"

মাক্কু চোরা আবার মাথা নাড়ল।

রাশা বলল, "কিন্তু এটা তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেউ নিশ্বাস না নিয়ে এক-দুই মিনিটের বেশি থাকতে পারে না। বেঁচে থাকতে হলে অক্সিজেন লাগে। ব্রেনে অক্সিজেন না গেলে ব্রেইন ড্যামেজ হয়ে যায়–"

মাক্কু চোরা কোনো কথা না বলে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বিড়ি টানতে টানতে আবার দড়ি পাকাতে থাকে। অক্সিজেনের অভাবে ব্রেন ড্যামেজ হয় কি না হয় তাতে কিছু আসে যায় না। রাশা বলল, "আপনি কেমন করে পানির নিচে থাকেন এটা বলবেন?"

মাক্কু চোরা রাশার কথা না শোনার ভান করে দড়ি পাকাতে থাকে। রাশা আবার বলল, "বলবেন আমাদের?"

মাক্কু চোরা এবারেও কোনো কথা বলল না। রাশা আবার বলল, "প্লিজ! বলবেন?"

মাক্কু চোরা বিড়িটা কামড়ে রেখে বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে সেই অবস্থায় দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচিক করে থুতু ফেলল। বলল, "আমার ওস্তাদের দোয়া আছে।"

"দোয়া?" রাশা অবাক হয়ে বলল, "ওস্তাদের দোয়া?"

ঘরের ভেতর থেকে এরকম সময় মাক্কু চোরার পরীর মতো সুন্দরী বউটা বের হয়ে এসে দরজাটা ধরে দাঁড়াল। রাশা বউটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ভালো আছেন?"

বউ কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে জানাল, সে ভালো আছে। রাশা তখন আবার মাক্কু চোরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি বলছেন ওস্তাদের দোয়া। কিন্তু ওস্তাদের দোয়া থাকুক আর না থাকুক, নিশ্বাস তো নিতে হবে। শরীরে অক্সিজেন তো দিতে হবে! তা নাহলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে?"

মাক্কু চোরা গভীর মনোযোগ দিয়ে দড়ি পাকাতে লাগল, তাকে দেখে মনে হতে থাকে রাশা যে এখানে এসেছে, ব্যাপারটা সে জানেই না। রাশা তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আপনি যদি না বলেন তাহলে

নাই! কিন্তু যদি সত্যি সত্যি আপনি নিশ্বাস না নিয়ে এক-দুই ঘণ্টা পানির নিচে থাকতে পারেন তাহলে সেই খেলা দেখিয়ে আপনি কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করতে পারবেন।"

মাক্কু চোরা লক্ষ টাকা কামাই করতে কোনো উৎসাহ দেখাল না। গভীর মনোযেগ দিয়ে দাড়ি পাকাতে লাগল। রাশা জিতুকে বলল, চল জিতু যাই

জিতু বলল, চল

রাশার পরীর মতো সুন্দরী বউটাকে বলল, আমরা আসি তাহলে?

বউটা অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়াল।

রাশা আর জিতু মাক্কু চোরার বাড়ি থেকে বের হয়ে খানিক দূর গিয়েছে তখন হঠাৎ পিছন থেকে একটা শব্দ শুনল, এই মেয়ে!

রাশা ঘুরে তাকিয়ে দেখে মক্কু চোরার পরীর মতো সুন্দরী বউটা এগিয়ে আসছে। রাশা অবাক হয়ে তার কাছে গেল, বউটা বলল, পানির নিচে কেমন করে থাকে সেটা জানতে এসেছিলে?

হ্যাঁ। কেউ তো নিশ্বাস না নিয়ে এক দুই ঘন্টা পানির নিচে থাকতে পারবে না।

নিশ্বাস নেয়।

কেমন করে নেয়?

সাথে একটা নল রাখে। বাঁশের নল, না হলে পেঁপে পাতার ডাঁটি। কিছু না পেলে পাটখড়ি। সেইটা দিয়ে পানির নিচে থেকে নিশ্বাস নেয়।

রাশার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে চোখ বড় বড় করে বলল, কী বুদ্ধি।

বউটার চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠে, নিচু গলায় বলে, তার ওস্তাদের দোয়া আসলে দোয়া না। সেইটা হচ্ছে লানত।

বউটা ফিরে যাচ্ছিল তখন রাশা ডাকল, বলর, শুনেন।

বউটা দাঁড়াল। রাশা বলল, আপনার মতো সুন্দরী কোনো মানুষ আমি জীবনে দেখি নাই। আপনি জানেন আপনি কত সুন্দর?

বউটা কিছুক্ষণ চুকরে থেকে বলল, মেয়ে তোমাকে একটা কথা বলি?

বলেন।

"গরিবের ঘরে মেয়েদের সৌন্দর্য থেকে বড় অভিশাপ আর কিছু নাই। আমি সবসময় বলি, খোদা তুমি আর যাই করো, কখনো গরিব মানুষের ঘরে সুন্দরী মেয়ে দিও না।"

বউটি তারপর আর কোনো কথা না বলে হেঁটে চলে গেল। কেন জানি তার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। কেন খারাপ হয়েছে সে বুঝতে পারছে না। রাশা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। জিতু একসময় বলল, "চলো রাশাপু।"

রাশা একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বলল, "হ্যাঁ। চল যাই।"

একটা নল মুখে লাগিয়ে পানির নিচে বসে নিশ্বাস নেবার ধারণাটা খুবই সোজা কিন্তু রাশা আবিষ্কার করল কাজটা মোটেই সোজা না! রাশা প্রথমবার যখন চেষ্টা করল তখন তার নাক দিয়ে পানি ঢুকে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা! জিতু দাবি করল পানিটা নাক দিয়ে তার ব্রেনের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে– ব্রেনে পানি ঢুকে গেলে কী বিপদ হতে পারে সেটা নিয়েও তার ভয়ঙ্কর কিছু গল্প ছিল কিন্তু রাশা সেটাকে মোটেও পাত্তা দিল না। অন্যেরা এক-দুইবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল, কিন্তু রাশা হাল ছাড়ল না, লেগে রইল। সে আবিষ্কার করল দুই আঙুলে নাক চেপে ধরে রাখলে পানির নিচে থেকে একটা নল দিয়ে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়া যায়। মানুষ যখন নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয় সে তার শব্দ শুনতে পায় না কিন্তু পানির নিচে থেকে যখন নল দিয়ে সে নিশ্বাস নেয় তার পুরো শব্দটা শুনতে পায়– মনে হয় একটা ইঞ্জিন চলছে!

সপ্তাহ দুয়েকের মাঝে রাশা পানির নিচে থেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার একটা এক্সপার্ট হয়ে গেল। নল হিসেবে সে ব্যবহার করে পেঁপে গাছের পাতার গোড়ার দিকের ডাঁটিটা। রাশা ঠিক করে রেখেছে এর পরেরবার বাজারের দিকে গেলে সে একটা লম্বা রবারের নল কিনে আনবে, সেটা দিয়ে সে পুকুরের তলায় বসে বসে নিশ্বাস নেবে! কী মজাই না হবে তখন!

পানির নিচে একটা বিচিত্র জগৎ রয়ে গেছে সেটা রাশা জানত না। কিন্তু সেটা দেখা যায় না, পানির নিচে সবকিছুই অস্পষ্ট! ডুবুরিরা চোখের উপরে একটা গগলস লাগায় তাহলে চোখের সামনে সরাসরি পানি থাকে

না, তখন সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। এরকম গগলস তো আর গ্রামের বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না তাই রাশা চিন্তা করছে কেমন করে সেটা তৈরি করা যায়। পানির নিচে এত চমৎকার একটা জগৎ সেটা কেউ দেখবে না, সেটা তো হতে পারে না! তাকে দেখতেই হবে।

সায়েন্স অলিম্পিয়াডের অঙ্কগুলো করে পাঠিয়েছে অনেক দিন হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম কয়েক দিন সে খুব উত্তেজনার মাঝে ছিল, ভেবেছিল কোনো একটা উত্তর আসবে। শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তর আসেনি। হয়তো কুরিয়ারের লোকেরা সময়মতো পাঠায়নি, কিংবা পাঠিয়েছে কিন্তু তাদের হাতে পৌঁছায়নি। কিংবা কে জানে হয়তো সায়েন্স অলিম্পিয়াডের লোকেরা ঠিকই পেয়েছে কিন্তু তার অঙ্কগুলি সব ভুল হয়েছে। কিংবা কে জানে হয়তো তার অঙ্কগুলি শুদ্ধই হয়েছে কিন্তু অন্যদের অঙ্ক আরো অনেক বেশি শুদ্ধ হয়েছে, সে জন্যে তাকে বাতিল করে দিয়েছে। রাশা প্রথম প্রথম দুই-এক সপ্তাহ আগ্রহ নিয়ে ব্যাপারটা ভুলে গেল– তার একটা কারণ স্কুলে ঠিক তখন তাদের কম্পিউটারগুলো এসে পৌঁছাল। আগে রাজ্জাক স্যারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সেই স্যারের চাকরি চলে গেছে। এরপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গৌরী ম্যাডামকে। গৌরী ম্যাডাম মাঝখানে কোথায় গিয়ে যেন অনেক দিন ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন, ট্রেনিংটা ঠিকমতো হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, ম্যাডামকে কেমন জানি নার্ভাস মনে হচ্ছে।

যখন কম্পিউটারগুলো বসানো হচ্ছে তখন হেডমাস্টার আর অন্যান্য স্যার-ম্যাডামেরা ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। একটু পর দেখা গেল শুধু গৌরী ম্যাডাম একা নার্ভাস হয়ে কম্পিউটারের ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে কিছু কাগজ, সেগুলো দেখছেন আর উদ্বিগ্ন মুখে কম্পিউটারগুলো দেখছেন, ঠিক কোথা থেকে কিভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না।

রাশা যখন দেখল আশেপাশে কেউ নেই তখন ল্যাবরেটরি ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, "ম্যাডাম, আসতে পারি?"

গৌরী ম্যাডাম বললেন, "কে? রাশা? আয়।"

রাশা ভেতরে ঢুকে সারি সারি সাজিয়ে রাখা কম্পিউটারগুলো দেখে বলল, "কী সুন্দর কম্পিউটারগুলো, তাই না ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ। তোর জন্যেই তো হলো।"

"না ম্যাডাম, শুধু আমার জন্যে হয় নাই। সবার জন্যে হয়েছে।"

গৌরী ম্যাডাম মাথা চুলকে বললেন, "এতগুলো কম্পিউটার দিল, দেখেশুনে রাখার জন্যে একটা মানুষ দেওয়া দরকার ছিল না?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম দরকার ছিল।"

"আমি একা কেমন করে এতগুলো কম্পিউটার দেখে রাখব?"

"একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে ম্যাডাম।"

"হয়ে গেলেই ভালো।" গৌরী ম্যাডাম ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন।

রাশা বলল, "কবে থেকে আমাদের কম্পিউটার ক্লাস হবে?"

"শুরু করব। কয়েক দিনের মাঝেই শুরু করব।"

"ম্যাডাম–"

"কী হলো?"

"আমি একটা কম্পিউটার একটু অন করে দেখি কী কী দিয়েছে?"

"দেখবি? দেখ। সাবধান, আবার নষ্ট করে ফেলিস না যেন।"

"না ম্যাডাম, নষ্ট করব না।"

রাশা তখন এক কোনায় বসে একটা কম্পিউটার অন করল। ঝকঝকে নতুন মেশিন, এখনো নতুন প্লাস্টিকের গন্ধ বের হচ্ছে। মাত্র অপারেটিং সিস্টেম বসানো হয়েছে, দেখতে দেখতে মনিটরে সবকিছু বের হয়ে এলো। রাশা জিব চটাশ করে একটা শব্দ করল, যেন ভারি মজার একটা কিছু সে চেটে চেটে খাচ্ছে। রাশা খানিকক্ষণ কম্পিউটারটা ঘাঁটাঘাঁটি করল, তারপর আনন্দের একটা শব্দ করল, বলল, "ম্যাডাম!"

"কী হয়েছে।"

"ইন্টারনেট কানেকশান আছে ম্যাডাম। ফাটাফাটি স্পিড!"

"তাই নাকি?"

"জি ম্যাডাম। এই দেখেন–" বলে সে ঝড়ের গতিতে কি বোর্ডে হাত চালিয়ে স্ক্রিনে আইনস্টাইনের একটা ছবি নিয়ে এলো।

গৌরী ম্যাডাম দেখে বললেন, "কোথা থেকে পেলি?"

"গুগল থেকে।"

গৌরী ম্যাডাম ঠিক বুঝতে পারলেন মনে হলো না।

রাশা অনেক দিন পর তার ই-মেইলগুলো চেক করল। কত মেইল এসে জমা হয়েছে! যার বেশিরভাগেরই এখন আর কোনো অর্থ নেই। সে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে!

ম্যাডাম একটু ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে রাশার দিকে তাকিয়ে রইলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কম্পিউটার চালাতে পারিস?"

"পারি ম্যাডাম। কম্পিউটার ছিল আমার এক নম্বর বন্ধু।"

গৌরী ম্যাডাম তার কম্পিউটারের সামনে বসে খুব সাবধানে মাউসটাকে একটু নাড়ালেন, দেখেই বোঝা গেল-ম্যাডাম একেবারেই অভ্যস্ত নন। বিড়বিড় করে বললেন, "বইয়ে লিখেছে দুইবার ক্লিক করলে ওপেন হবে কিন্তু ওপেন হতে চাচ্ছে না। সমস্যাটা কী?"

রাশা ঠিক বুঝতে পারছিল না তার কিছু বলা ঠিক হবে কি না, শেষে বলেই ফেলল, "তাড়াতাড়ি দুইবার ক্লিক করতে হবে ম্যাডাম।"

"আমি তো ভাবছিলাম তাড়াতাড়িই করছি। এই কম্পিউটার মনে হয় বেশি ফাস্ট–" গৌরী ম্যাডাম নিজের রসিকতায় নিজেই একটু নার্ভাসভাবে হাসলেন।

একটু পরে আবার বিড়বিড় করে বললেন, "আমাকে বলেছিল বাংলায় লেখা যাবে! এই দ্যাখ কি বোর্ড টিপলেই শুধু ইংরেজি বের হয়! কী মুশকিল!"

রাশা আবার একটু ইতস্তত করে বলল, "ফন্টটা সিলেক্ট করা হয়নি! বাংলা একটা ফন্ট সিলেক্ট করলেই বাংলা লেখা বের হবে।"

গৌরী ম্যাডাম অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ! হ্যাঁ। তাই তো।"

প্রথম প্রথম গৌরী ম্যাডাম রাশাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই তার লজ্জা কেটে গেল। যখনই তার কোনো একটা সমস্যা হচ্ছিল তখনই রাশাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তার কিছু কিছু প্রশ্ন এত হাস্যকর যে রাশার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সে হাসল না, গম্ভীর হয়ে গৌরী ম্যাডামকে বুঝিয়ে দিল।

গৌরী ম্যাডামও রাশাকে পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটু সাহস পেলেন। তারা দুজনে মিলে সবগুলি কম্পিউটার অন করলেন, রাশা সবগুলিই একটু ঘাঁটাঘাঁটি করল, করে বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম!"

"গুড।"

"তাহলে কালকে থেকে কি ক্লাস হবে?"

"কালকে থেকেই?" ম্যাডামকে দুশ্চিন্তিত দেখাল, "রুটিন করতে হবে না?"

"রুটিন পরে করলে হবে না ম্যাডাম? সবাই একটু দেখুক?"

গৌরী ম্যাডাম চোখ কপালে তুলে বললেন, "সর্বনাশ! ভুল জায়গায় টেপাটেপি করে পরে নষ্ট করে ফেলবে!"

"নষ্ট করবে না ম্যাডাম। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি থাকব। কাউকে ওল্টাপাল্টা কিছু করতে দিব না।"

"তুই থাকবি?"

"আপনি যদি বলেন।"

"ঠিক আছে তাহলে দেখি চেষ্টা করে।"

কাজেই রাশাকে সবসময়েই কম্পিউটার ল্যাবরেটরিতে দেখা যেতে লাগল। গৌরী ম্যাডাম যদি ক্লাস নিতেন তাহলে কম্পিউটার বিষয়টা হতো দুর্বোধ্য কঠিন একটা বস্তু। যেহেতু রাশা ছেলেমেয়েদের দেখাল তাই সবাই আবিষ্কার করল এটা আসলে একটা খেলনা। সেই খেলনা দিয়ে খেলতে এত মজা যে কেউ আগে কল্পনা করেনি।

গৌরী ম্যাডাম অসহায়ভাবে আবিষ্কার করলেন কয়েকদিনের মাঝে বাচ্চাকাচ্চারা তার থেকে অনেক বেশি জেনে গেছে। শুধু তাই নয়, কম্পিউটারে তার জ্ঞান হচ্ছে ভাসা ভাসা, ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারের নাড়ি-নক্ষত্র জানে। তারা কম্পিউটার নিয়ে এমন এমন জিনিস করতে লাগল যে তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

এরকম সময় একদিন হেডমাস্টার রাশাকে ডেকে পাঠালেন। রাশা একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে হেডমাস্টারের কাছে গেল, কম্পিউটার শেখানো নিয়ে

সে কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সেটা নিয়ে তাঁকে কেউ নালিশ করেছে কি না কে জানে? দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে রাশা বলল, "আসতে পারি স্যার?"

"আস।"

রাশা ভেতরে ঢুকে হেডমাস্টারের সামনে দাঁড়াল। হেডমাস্টার তার দিকে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে একটা খাম হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "ঢাকা থেকে একটা চিঠি এসেছে। সায়েন্স অলিম্পিয়াড কমিটির চিঠি–"

রাশার বুকের ভেতর ছলাৎ করে উঠল, জিজ্ঞেস করল, "কী লিখেছে চিঠিতে?"

"লিখেছে ঢাকায় একটা সায়েন্স অলিম্পিয়াড হবে সেখানে তোকে সিলেক্ট করেছে। আমি ঠিক বুঝলাম না– অলিম্পিক তো হয় দৌড়াদৌড়ি না হলে লাফঝাঁপ দিয়ে। সায়েন্স দিয়ে অলিম্পিকটা কেমন করে হবে? হাতে একটা টেস্টটিউব নিয়ে দৌড়াবে? নাকি একটা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে লাফ দিবে?" হেডস্যার কথা শেষ করে হা হা করে হাসলেন, যেন ভারি চমৎকার একটা রসিকতা হয়েছে!

রাশা বলল, "মনে হয় বিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন দিবে, সেইগুলোর উত্তর দিতে হবে।"

হেডস্যার হাতের চিঠিটাতে আরেকবার চোখ বুলালেন। তারপর বললেন, "ঢাকায় গেলে তোকে একটা মেয়েদের হোস্টেলে রাখবে, হাতখরচের টাকা দেবে। যাতায়াতের ভাড়া দেবে– যাবি নাকি?"

রাশা তার উত্তেজনাটা চেপে রেখে বলল, "হ্যাঁ স্যার। যেতে চাই।"

হেডস্যার কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "স্কুলের জন্যে একটা প্রেস্টিজ। তোর তো যাওয়াই উচিত। কিন্তু কেমন করে যাবি? তোর সাথে কে যাবে?"

রাশা একটু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে না?"

"দেখি কোনো স্যারকে রাজি করতে পারি কি না।"

রাশা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় সবাইকে বলল সে সায়েন্স অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে ঢাকা যাচ্ছে। তাকে যাতায়াতের ভাড়া দেয়া হবে

এবং হাত খরচ দেয়া হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আসবেন। শুনে সবাই চমৎকৃত হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত হলো জিতু এবং স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে জিতু সারা গ্রামে সবাইকে খবরটা দিয়ে এলো। সবাইকে যে খবরটা সঠিকভাবে দিল তা নয়, খবর দেয়ার সময় যখন যেখানে প্রয়োজন অনেক বাড়তি ব্যাপার স্যাপার যোগ করে দিল।

জিতুর খবর প্রচারের কারণেই মনে হয় সন্ধেবেলা সালাম নানা রাশার সাথে দেখা করতে এলেন। উঠানের মাঝখান থেকে ডাক দিয়ে বললেন, "রাশা, বেটি, তুমি কোথায়?"

রাশা হ্যারিকেন হাতে বের হয়ে দেখে সালাম নানা। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "নানা, আপনি! আসেন, আসেন, ভিতরে আসেন।"

সালাম নানা বললেন, "না রে রাশা বসব না। জিতুর মুখে একটা খবর শুনে এসেছি। কোন মন্ত্রী নাকি তোমাকে পুরস্কার দিবে? ব্যাপারটা কি?"

রাশা লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, "না, না, আমি মোটেই কোনো পুরস্কার পাব না! জিতু বজ্জাতটা উল্টাপাল্টা কথা বলে বেড়াচ্ছে।"

সালাম নানা হাসলেন, বললেন, "আমাদের জিতু হচ্ছে রয়টার। সে সবসময় সব রকম খবর ছড়ায়।"

"মোটেই খবর ছড়ায় না, গুজব ছড়ায়। এত বাজে কথা বলতে পারে!"

সালাম নানা বললেন, "ঠিক আছে! সে না হয় একটু বাড়িয়েচাড়িয়ে বলছে। তুমি তাহলে আসল কথাটা বলো। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে, সেটা কী?"

"ঢাকায় একটা সায়েন্স অলিম্পিয়াড হচ্ছে, আমি সেখানে সিলেক্ট হয়েছি।"

"সায়েন্স অলিম্পিয়াড? সেটা আবার কী?"

রাশা বলল, "আমিও ভালো করে জানি না। মনে হয় বিজ্ঞানের উপরে একটা পরীক্ষার মতো হবে।"

"তোমাকে কেমন করে সিলেক্ট করল?"

"পত্রিকায় দশটা প্রশ্ন ছাপিয়ে দিয়েছিল, সেগুলো করে পাঠিয়েছিলাম।"

"বাহ্!" সালাম নানা খুশিতে মাথা নেড়ে বললেন, "কী চমৎকার! আজিজ মাস্টারের যোগ্য নাতনি তুমি। এখন দেখি তুমি সেখান থেকে কী পুরস্কার আনতে পারো।"

রাশা বলল, "কত শতশত ছেলেমেয়ে আসবে! আমি কি কোনো পুরষ্কার পাব নাকি?"

"নিশ্চয়ই পাবে। আর না পেলেই কী। ওখানে যাওয়াই তো একটা বড় ব্যাপার।"

সালাম নানা তখন ক্রাচে ভর দিয়ে চলে যেতে শুরু করলেন, রাশা বললেন, "নানা, আপনি বসবেন না?"

"নাহ্ রে। যাই।"

রাশা বলল, "আমি আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

সালাম নানা হা হা করে হাসলেন, বললেন, "তুমি আমাকে কী এগিয়ে দিবে? আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি?"

"না, নানা। আসলে এত সুন্দর জোছনা উঠেছে তাই আপনার সাথে একটু হাঁটি।"

"তাহলে আসো। আসলেই দেখো কী সুন্দর জোছনা। পৃথিবীতে মনে হয় জোছনার মতো সুন্দর কিছু নাই।"

রাশা সালাম নানার সাথে খালের পাড় ধরে হাঁটতে থাকে। রাশা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "নানা।"

"বলো।"

"আমার নানা কেমন করে মারা গিয়েছিলেন আপনি জানেন?"

সালাম নানা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আসলে কেউ-ই জানে না। আমরা কাছাকাছি একটা অপারেশনে এসেছিলাম। অপারেশন শেষ হয়েছে বিকেলের দিকে, তোমার নানা বলল, বাড়ির এত কাছে এসেছি একটু বউ-বাচ্চাকে দেখে আসি। আমি না করলাম, বললাম, রাজাকারদের উৎপাত বেড়েছে এখন যাওয়া ঠিক হবে না।"

"তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছিল, তোমার নানা বলল, এই বৃষ্টিতে কেউ ঘর থেকে বের হবে না। আমি যাব বাচ্চাগুলোকে একনজর দেখে চলে আসব।"

"তোমার নানা তারপর তার হাতিয়ারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, এইটা তোমার কাছে রাখো। আমি রেখে দিলাম। এখন মনে হয় হাতিয়ারটা নিয়ে গেলেই পারত, কয়টা রাজাকারকে তো অন্তত শেষ করতে পারত, ধরাও পড়ত না। মানুষটার সাহস ছিল সিংহের মতো।"

"যাই হোক আজিজ ভাই বাড়ি আসলেন, তোমার নানির সাথে দেখা করলেন, তোমার মা'কে দেখলেন, তারপর চলে আসতে চাচ্ছিলেন, তোমার নানি তখন বললেন, এত বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিটা একটু ধরুক তখন যেন যায়।"

সালাম নানা একটু থামলেন, একটা বড় নিশ্বাস নিলেন, তারপরে বললেন, "মৃত্যু নিশ্চয়ই আজিজ ভাইয়ের পিছনে পিছনে এসেছিল তা না হলে কেন একটু দেরি করলেন? এর মাঝে রাজাকাররা এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল।"

"তারপর ঠিক কী হয়েছে কেউ ভালো করে জানে না। রাজাকারের দল তাকে ধরে নিয়ে গেল, শুনতে পেলাম মিলিটারির কাছে দিবে। কিন্তু মিলিটারির কাছে দিল না, আর কোনোদিন মানুষটার খোঁজও পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই তাকে ঐ রাতেই মেরে ফেলেছে।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় কবর দিয়েছে কেউ জানে না?"

"না। কেউ জানে না। আসলে–"

"আসলে কী?"

"যারা তোমার নানাকে ধরে নিয়েছিল তারা কি কবর দিয়েছে? কবর দেয় নাই, মেরে লাশটাকে কোথাও ফেলে দিয়েছে। ঐ রাজাকাররা তো মানুষ না। ওরা পশু, পশুর থেকেও খারাপ। জাহান্নামেও ওদের জায়গা হবে না।"

"সেই রাজাকারগুলোর কী হয়েছে?"

"যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা কিছু মেরে শেষ করেছে। কিছু পালিয়েছে। কিছু ধরা পড়ে জেলে গেছে। সেভেন্টি ফাইভে যখন রাজাকারদের ক্ষমা করে দিল সেগুলো ছাড়া পেয়ে এসেছে।"

"আচ্ছা নানা, এইটা কি সত্যি, আমাদের স্কুলটা যার নামে সে নাকি–"

সালাম নানা একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সত্যি। শোনা যায় তোমার নানাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার মাঝে সেও নাকি ছিল।"

"একটা রাজাকারের নামে স্কুল? এটা কেমন হলো নানা?

"খুব অন্যায় হলো। কিন্তু কী করবে বলো? মাঝখানে কয়েকটা সরকার গেল তারা তো সেই রাজাকারদেরই তোষামোদ করেছে। আহাদ আলী সেভেন্টি ফাইভে জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসে কয়েক বছর চুপচাপ ছিল, তারপর চেয়ারম্যান ইলেকশান করল। টাকা কামাই করল– নিজের নামে মাদ্রাসা বানাল, স্কুল বানাল। আগে স্কুল কমিটিতে ছিল, এখন বয়স হয়েছে বাড়িতে বসে থাকে।"

"আপনি কখনো দেখেছেন নানা এই মানুষটাকে?"

"না দেখি নাই। কেন?"

"একটা রাজাকার দেখতে কেমন হয় সেটা জানার জন্যে।"

"এরা দেখতে মানুষের মতোই। নাক মুখ চোখ আছে। কিন্তু আসলে মানুষ না। আসলে এরা পশু। পশুর চাইতেও খারাপ।"

রাশা নিঃশব্দে সালাম নানার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। নরম মাটিতে তার ক্রাচ গেঁথে গেঁথে যাচ্ছিল, তারপরেও তার অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায়। একটা মুক্তিযোদ্ধার কষ্টের শব্দ।

সায়েন্স অলিম্পিয়াড

কলেজের মেয়েটি একটু অবাক হয়ে রাশার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তুমি এখানে কী করছ?"

"আমি সায়েন্স অলিম্পিয়াডে এসেছি।"

"সায়েন্স অলিম্পিয়াডে?" কলেজের মেয়েটি অবাক হয়ে তার বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চাদেরও একটা অলিম্পিয়াড হচ্ছে নাকি?"

"জানি না তো। একটাই তো অলিম্পিয়াড।"

কলেজের মেয়েটি রাশাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কীসে পড়?"

"ক্লাস এইটে।"

"ক্লাস এইটে পড়লে তুমি অলিম্পিয়াডে কেমন করে চান্স পেলে? অলিম্পিয়াডের সব প্রশ্ন তো ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের!"

ঝকঝকে চেহারার একটা মেয়ে হি হি করে হেসে বলল, "বুঝিস না? বাড়িতে একজন ইন্টারমিডিয়েট ইউনিভার্সিটির থাকলেই তো হয়! অঙ্ক করে দেবে– পাঠিয়ে দেবে!"

"কিন্তু তাহলে এখানে এসে ধরা খাবে না?"

ঝকঝকে চেহারার মেয়েটা বলল, "ধরা মনে করলেই ধরা! একটু দুই নম্বরি করে মাগনা ঢাকা থেকে বেড়িয়ে যেতে পারলে ক্ষতি কী?"

রাশার কানটা একটু লাল হয়ে উঠল, কিন্তু সে কিছু বলল না। ঝকঝকে চেহারার মেয়েটা রাশার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপু, তুমি কাজটা কিন্তু ঠিক করলে না!"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "এখন মনে হচ্ছে হয়তো ঠিক করলাম না।"

"বড় মানুষদের দিয়ে অঙ্কগুলো করিয়ে–"

"উঁহু। আমি সেটার কথা বলছি না।"

"তাহলে কোনটার কথা বলছ?"

"এখানে আসার কথাটা বলছি। মনে হচ্ছে এখানে এসে ঠিক করলাম না, যদি কোনোভাবে আপনারা জানতে পারেন যে অঙ্কগুলো আমি নিজেই করেছি তাহলে না জেনে আমাকে এই খারাপ কথাগুলো বলছেন সেটা চিন্তা করে আপনাদের খারাপ লাগবে না?"

কলেজের মেয়েগুলো হঠাৎ করে চুপ করে গেল।

রাশাকে হেডমাস্টার নিজেই নিয়ে এসেছেন। মেয়েদের এই হোস্টেলে তুলে দিয়ে তিনি উধাও হয়ে গেছেন। কাল অলিম্পিয়াডে থাকতেও পারেন নাও থাকতে পারেন। পরশু দিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর রাশাকে নিয়ে ফিরে যাবেন। রাশাকে বলেছেন ঢাকায় তার নানা কাজকর্ম আছে, সেগুলো করতে করতেই সময় চলে যাবে। রাশা আপত্তি করেনি, তার রাতে ঘুমানোর জায়গা আছে, খাওয়ার জায়গা আছে। তাকে এখান থেকে বাসে করে নিয়ে যাবে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে কাজেই দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

রাতে মেয়েদের হোস্টেলে ঘুমানোর আগে আগে সে আবিষ্কার করল হোস্টেলের আলোগুলো অসম্ভব তীব্র, রীতিমতো চোখে লাগে। গ্রামে রাতের বেলা কুপি বাতি না হয় হ্যারিকেনের আলোতে থাকতে থাকতে তার চোখ এখন ইলেকট্রিক বাল্বের প্রখর আলো সহ্য করতে পারছে না। কী আশ্চর্য!

রাশা খুব ভোরবেলা প্রস্তুত হয়ে নিল, ঢাকার বাইরে থেকে যারা এসেছে তাদের বেশির ভাগই আত্মীয়স্বজনের বাসায় উঠেছে। তাই হোস্টেলের মেয়ে খুব বেশি নেই। সাত সকালে সে গোসল করেছে, কাপড় পরেছে, ক্যান্টিনে নাস্তা করেছে তারপর নিচে এসে বসে আছে। তার ভেতরে একটা ভয়, যদি তাকে এখানে ফেলে রেখে বাস চলে যায় তখন কী হবে?

ঠিক নয়টার সময় বাস এলো, তাকে ফেলে রেখে যেতে পারল না, সে সবার আগে বাসে গিয়ে উঠে বসল। বাসটা তাদের সায়েন্স অলিম্পিয়াড ভেন্যুতে নিয়ে গেল, বিশাল একটা মাঠ, সেখানে বিশাল একটা প্যান্ডেল। প্যান্ডেলের এক পাশে বড় স্টেজ, পিছনে চকচকে ডিজিটাল ব্যানার। একপাশে রেজিস্ট্রেশনের জায়গা সেখানে ছেলেমেয়েরা লাইন ধরে রেজিস্ট্রেশন করছে। সবাই কলেজের বড়-বড় ছেলেমেয়ে। তার বয়সী ছেলেমেয়ে খুব কম। রাশাও লাইনে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নিল, সেখান থেকে গলায় ঝুলিয়ে নেয়ার জন্যে তার নাম লেখা একটা কার্ড দেয়া হলো, সাথে সায়েন্স অলিম্পিয়াডের নিয়ম-কানুন লেখা কিছু কাগজপত্র আর হাতখরচ আর ভাড়ার টাকা। একপাশে ফ্রি নুডল খাওয়াচ্ছে সেখানে ছেলেমেয়েদের খুব ভিড়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হতে এখনো প্রায় আধঘন্টা বাকি, রাশা মোটামুটি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন হঠাৎ করে সে জাহানারা ম্যাডামকে দেখতে পেল। রাশা ছুটে ম্যাডামের কাছে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল, "ম্যাডাম! ম্যাডাম!"

জাহানারা ম্যাডাম ঘুরে তাকালেন, রাশাকে দেখে তার এক মুহূর্ত সময় লাগল চিনতে, প্রথমে তার চোখে বিস্ময়, তারপর সেখানে আনন্দের ছাপ পড়ল! রাশাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "রাশা! তুমি? এই অলিম্পিয়াডে?"

"জি ম্যাডাম!"

"তুমি না মাত্র ক্লাশ এইটে পড়। এটা তো কলেজের কম্পিটিশন!"

"মনে নাই আপনি আমাকে কতগুলো বই পাঠিয়েছেন- বসে বসে সেগুলো পড়েছি তো-"

জাহানারা ম্যাডামের মুখে বিশাল একটা হাসি ফুটে উঠল, "তুমি সেগুলো পড়েছ?"

"পুরোটা শেষ হয় নাই-"

"এখনই শেষ হবে কেমন করে? তোমার বয়সে শুরু করাই তো কঠিন!"

"সবকিছু বুঝি না, মাঝে মাঝে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স লেখে–"

"ক্যালকুলাস। ওটাকে ক্যালকুলাস বলে।"

"ওটা জানি না তো তাই একটু ঝামেলা হয়।"

"আর ঝামেলা হবে না, আমি তোমাকে ফ্যান্টাস্টিক একটা ক্যালকুলাস বই কিনে দেব।" জাহানারা ম্যাডাম রাশার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি কখনো চিন্তা করিনি তুমি সত্যি সত্যি সিরিয়াসলি ওই বইগুলো পড়বে–"

"আসলে বর্ষাকালে যা বৃষ্টি আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। চারিদিকে পানি, ঘর থেকে বের হওয়া যায় না! তখন ঘরে বসে বসে পড়েছি। কুপি বাতি জ্বালিয়ে–"

"ইলেকট্রিসিটি নাই?"

"কিছু নাই!"

"কিন্তু রাশা তোমাকে দেখে কিন্তু খুব ফ্রেস লাগছে, গায়ের রংটা একটু পোড়া পোড়া। কিন্তু খুব ফ্রেশ লাগছে। তেজি তেজি ভাব!"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "জি ম্যাডাম, তেজি না হলে পারতামই না। বর্ষার সময় নৌকা করে স্কুলে যাই! নিজেরাই নৌকা বেয়ে যাই!"

জাহানারা ম্যাডাম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, "তুমি নৌকা বাইতে পারো?"

"আরো অনেক কিছু পারি ম্যাডাম!"

"কী কী পারো?"

"সাঁতার দিতে পারি। গাছে উঠতে পারি। একটু একটু রান্না করতে পারি। স্যারদের মার খেতে পারি। ঝগড়া করতে পারি–"

জাহানারা ম্যাডাম হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার স্কুলটা কেমন?"

রাশা গলা নামিয়ে বলল, "খুব খারাপ। লেখাপড়া হয় না। স্যার-ম্যাডামরা কিছু জানেন না, পড়াতেও পারেন না– সব নিজেরা নিজেরা পড়তে হয়।"

"সেটা একদিক দিয়ে ভালো, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস বাড়বে।"

রাশা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "আমাদের ক্লাসের কেউ আসে নাই?"

"না। কলেজ সেকশনের কয়েকজন এসেছে।"

"তাদেরকে তো আমি চিনব না।"

"না চিনবে না।"

জাহানারা ম্যাডাম রাশাকে প্রায় ধরে রেখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, একসময় ইতস্তত করে বললেন, "তোমাকে কি তোমার আম্মুর কথা জিজ্ঞেস করব রাশা?"

রাশা জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "জিজ্ঞেস না করলেই ভালো ম্যাডাম।"

"ঠিক আছে তাহলে জিজ্ঞেস করব না।"

"আম্মু অস্ট্রেলিয়া থেকে মাঝে মাঝে ভিউকার্ড পাঠান।"

"ও।" জাহানারা ম্যাডাম একটু থেমে বললেন, "আর তোমার নানি?"

"নানি খুব ভালো আছেন। আমার নানি খুব্ সুইট।"

"গুড! সবার জীবনে এক-দুইজন সুইট মানুষ থাকতে হয়।"

রাশা একটু হেসে বলল, "আমার বন্ধুরাও সুইট।"

"চমৎকার! দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল–" জাহানারা ম্যাডাম আরো কিছু বলতে চাইছিলেন কিন্তু ঠিক তখন মাইকে ঘোষণা করে সবাইকে তাদের জায়গায় বসতে বলা হলো, এক্ষুণি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। জাহানারা ম্যাডাম তখন রাশাকে নিয়ে প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

রাশা ভেবেছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে লম্বা, একজনের পর একজন বক্তৃতা দিতে থাকবে, সে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না,' কয়েকজন ছেলেমেয়ে মিলে আমার সোনার বাংলা গান গাইল, তারপর কয়েকজন একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ায়, একটা ব্যানারের ওপর অনেকগুলো গ্যাস বেলুন বেঁধে রাখা হয়েছে, সেটা ছেড়ে দেয়া হলো, একটা ঝাঁকড়া আমগাছের গা ঘেঁষে সেটা আকাশে উড়ে গেল, সবাই তখন জোরে জোরে হাততালি দিতে থাকে।

মাইকে তখন সবাইকে নিজেদের রুমে যেতে বলা হলো, কত রেজিস্ট্রেশন নম্বর কোথায় বসবে সেটা মাইকে বলে দিতে লাগল, কিন্তু কেউ সেটা শুনল না, সবাই নিজের মতো করে নিজেদের রুম খুঁজে বের করতে শুরু করে দিল।

রাশাও নিজের রুমটা খুঁজে বের করল, তার সিট পড়েছে দোতলায় বেঞ্চের এক কোনায়, ঠিক জানালার পাশে। দেখেই তার মনটা ভালো হয়ে যায়। জানালা দিয়ে নিচে একটা গলির মতো জায়গা দেখা যাচ্ছে, দুইপাশে ছোট ছোট টিনের ঘর। গলিতে একটা কমবয়সী মা ছোট একটা বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাশা গভীর মনোযোগ দিয়ে কমবয়সী মাটিকে লক্ষ করে, একজন মানুষ যখন জানে না তখন তাকে এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করা মনে হয় অনুচিত কাজ! কিন্তু রাশা সেই অনুচিত কাজটি গভীর মনোযোগ দিয়ে করতে থাকল।

একসময় কিছু মানুষ এসে তাদের কিছু সাধারণ কথাবার্তা বলল, তারপর কী করা যাবে আর কী করা যাবে না সেই বিষয়ে কিছু উপদেশ দিল। তখন ঢং করে কোথায় জানি একটা ঘণ্টা পড়ল সাথে সাথে তাদের প্রশ্ন আর খাতা দিয়ে দেয়া হলো।

রাশা প্রশ্নটা মন দিয়ে পড়ে অবাক হয়ে গেল, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু তার কাছে মনে হতে থাকে সে সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। রাশা সোজা হয়ে বসে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে শুরু করে।

যারা প্রশ্নগুলো করেছে তারা নিশ্চয়ই অসম্ভব বুদ্ধিমান, প্রশ্নগুলো এমনভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে কেউ যদি সত্যি সত্যি বিষয়টা বুঝে না থাকে কোনোভাবেই তার উত্তর দিতে পারবে না। শেষের প্রশ্ন দুটো সবচেয়ে মজার, প্রশ্নের শুরুতে নতুন একটা জিনিস তাদের শেখানো হয়েছে তারপর যেটা শেখানো হয়েছে সেটা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। সুপারনোভার বিস্ফোরণ কিভাবে হয় সে জানত না, এই প্রশ্ন পড়ে সেটা শিখেছে। শুধু যে শিখেছে তা নয়– সেটার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আরেকটা প্রশ্ন প্রোটিন নিয়ে, প্রথমে কেমন করে প্রোটিন তৈরি হয় সেটা বোঝানো হয়েছে, তারপর অ্যামিনো এসিড সম্পর্কে বলা আছে, সবশেষে কয়েকটা জিনের কোড, কোনটা প্রোটিন খুঁজে বের করতে হবে– এমন মজার প্রশ্ন যে রাশা মুগ্ধ হয়ে গেল।

একসময় পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা পড়ল, পরিদর্শকরা খাতা নিতে আসছে। রাশা লক্ষ করল সে খাতার উপরে তার নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে

ভুলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে তার নাম লিখল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখল, নিচে স্কুলের নাম লিখতে হবে। 'আহাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়' লিখতে গিয়ে রাশা থেমে যায়, এই খাতাটাতে সে কেমন করে একটা রাজাকারের নাম লিখবে, যেই রাজাকার তার নানাকে মেরেছে! রাশা কিছুক্ষণ চিন্তা করে স্কুলের নামটা না লিখেই তার কলমটা বন্ধ করল, সে তার এই হাত দিয়ে তার খাতায় একটা রাজাকারের নাম লিখতে পারবে না। তাছাড়া স্কুলের নামটা নিশ্চয়ই এত গুরুত্বপূর্ণ না, রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা থেকেই সব কিছু বের করে ফেলতে পারবে।

রাশা ক্লাসঘর থেকে বের হয়ে আসতে থাকে, তার ঠিক সামনে দিয়ে দুজন হেঁটে যাচ্ছে, তাদের কথা শুনতে পেল। একজন বলল, "প্রশ্নের কোনো মাথামুণ্ডু নাই!"

অন্যজন বলল, "মানুষগুলোর আক্কেল বলে কিছু নাই! প্রশ্নের মাঝে আমাদের জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করেছে। দেখেছিস?"

"আরে বাবা, কার এত সময় আছে বসে বসে পড়ার? কী জিজ্ঞেস করার আছে ঝটপট জিজ্ঞেস কর, উত্তর দিই।"

"এই রকম পাগলামির মাঝে আমি আর নাই। খালি খালি সময় নষ্ট।"

"তুই কয়টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিস?"

"পাঁচটা। তিনটা হলেও হতে পারে– অন্যগুলো বুঝিই নাই। তুই?"

"আমি ছয়টা। আমারও এক অবস্থা– প্রথম তিনটা মনে হয় হবে। অন্যগুলো জানি না।"

রাশা শুনতে পেল, দুইজন তারপর সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আয়োজকদের মুখ খারাপ করে গালাগাল করতে থাকে!

রাশা পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসা ছেলেমেয়েদের ভেতর একটু হাঁটাহাঁটি করে দেখল, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল কে কী বলছে। রাশা বেশ অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের ধারণা প্রশ্নটা খুবই খারাপ হয়েছে, তাদের ভাষায় রীতিমতো "আউল ফাউল" প্রশ্ন।

মাঠের এক কোনায় সবাইকে লাঞ্চের প্যাকেট দিচ্ছে, রাশা লাইনে দাঁড়িয়ে লাঞ্চের প্যাকেটটা নিয়ে মাঠের এক কোনায় খেতে বসে। হঠাৎ

করে তার একটু মন খারাপ হয়ে যায়। এখানে যারা এসেছে সবাই একজনের সাথে আরেকজন তা নাহলে কয়েকজন মিলে গল্প করছে। অনেকের বাবা-মা এসেছে, অনেকের স্যার-ম্যাডামরা এসেছেন, তারা মিলে গল্প করতে করতে খাচ্ছে। শুধু সে একা, মাঠের এক কোনায় বসে খাচ্ছে। একা একা খাওয়া কী মন খারাপ করা একটা ব্যাপার– এর মাঝেই মনে হয় একধরনের দুঃখী দুঃখী ভাব আছে। রাশা সেই দুঃখী দুঃখী ভাব নিয়ে খেতে থাকে, তেল জবজবে খানিকটা বিরিয়ানি, একটা সেদ্ধ ডিম আর মোরগের শুকনো একটা রান, কী ভয়ঙ্কর খাবার!

বিকেলের দিকে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল, ভালো ভালো কয়েকজন শিল্পী গান গেয়ে শোনাল, একটা নাচের অনুষ্ঠান, সবার শেষে ছোট একটা নাটক। রাশা অনেক দিন পর এরকম একটা অনুষ্ঠান দেখছে, আগের স্কুলে তারা নিজেরাই কতবার এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে! সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে তার বুক থেকে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। প্রায় সাথে সাথেই রাশা ভুরু কুঁচকে ভাবল, মন খারাপ হলে মানুষ দীর্ঘশ্বাস কেন ফেলে? দীর্ঘশ্বাস হচ্ছে ফুসফুসের ভেতর আটকে থাকা সব বাতাস জোর করে বের করে দেয়া– শুধু মন খারাপ হলে এটা করে, অন্যসময় কেন করে না? রাশা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সন্ধেবেলা বাসে করে তাদের মেয়েদের হোস্টেলে নিয়ে যাওয়া হলো, সকালে যে কয়জন ছিল এখন তারাও নেই। পুরো বাসে তারা মাত্র তিনজন। ঢাকা শহরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নেই সেরকম মানুষ খুব কম। এই বাসে বসে থাকা তিনজন হচ্ছে এরকম তিনজন হতভাগী! রাশা চোখের কোনা দিয়ে এই হতভাগীদের দেখল, চেহারা দেখেই বোঝা যায় মফস্বল থেকে এসেছে, তাদের মাঝে ঢাকা শহরের মেয়েদের মতো চকচকে ভাবটা নেই।

রাতে ক্যান্টিনে খেতে বসে রাশা অন্য দুটি মেয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু আবিষ্কার করল মেয়ে দুটো কথা বলতে খুব আগ্রহী নয়, তাদের ভেতর কী নিয়ে যেন একটা ভয় ভয় ভাব!

পরদিন সকালে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে প্রশ্নোত্তর পর্ব। মঞ্চে কিছু বুড়ো

বুড়ো মানুষ বসেছে, দেখেই রাশা বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুড়ো মানুষেরা কেন যেন একটু বেশি কথা বলে, এই মানুষগুলোও নিশ্চয়ই বকবক করে কানের পোকা নাড়িয়ে দেবে। তারপরেও রাশা একটু আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল কে কী প্রশ্ন করে আর তার উত্তরে বুড়ো বুড়ো মানুষেরা কী বলে সেটা শোনার জন্যে।

প্রথম প্রশ্নটা হলো মহাকাশে মানুষ কেন ভরশূন্য হয়। একজন প্রশ্নটার উত্তর দিলেন অনেক ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, কী বললেন কিছু বোঝা গেল না। কোনো মানুষ যখন একটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে জানে না তখন এভাবে উত্তর দেয়। স্টেজে যারা বসেছিলেন তার মাঝে একজনের মনে হলো উত্তরটা পছন্দ হলো না, সেই মানুষটা তখন মাইক নিয়ে প্রশ্নটার উত্তর দেয়া শুরু করলেন। এই মানুষটার উৎসাহ অনেক বেশি কাজেই এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যে কথা আর শেষ হয় না! একসময় শেষ হলো তখন একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, পৃথিবীর কেন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ শূন্য কেন? তারা যে ফর্মুলা শিখে এসেছে সেটা ব্যবহার করলে তো অসীম হওয়ার কথা।

রাশা একটু সোজা হয়ে বসল, এই প্রশ্নটার উত্তর সে নিজে অনেক কষ্ট করে বের করেছে, সে দেখতে চায় তার উত্তরটার সাথে মিলে কিনা। স্টেজে বসে থাকা মানুষগুলো বড় বড় বিজ্ঞানী, সবকিছুই জানে কিন্তু বোঝাতে পারে না! রাশা দেখল তারা কয়েকভাবে ব্যাখ্যা করল কিন্তু কেউ ঠিক করে বুঝতে পারল না! এরপরের প্রশ্নটা ছিল বিবর্তন নিয়ে, স্টেজে কমবয়সী একজন মহিলা খুব সুন্দর করে উত্তরটা দিলেন। এরপরে যে প্রশ্ন করতে দাঁড়াল সে প্রশ্ন না করে বিজ্ঞান এবং ধর্মের সাথে সম্পর্ক নিয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। স্টেজে বসে থাকা বুড়ো মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "ধর্মের মূল হচ্ছে বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের মূল হচ্ছে যুক্তিতর্ক। দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধারার জ্ঞান। তাই ধর্ম দিয়ে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে হয় না আবার বিজ্ঞান দিয়ে ধর্ম ব্যাখ্যা করতে হয় না!"

যে প্রশ্নটা করেছিল সে কঠিন মুখে আবার তর্ক করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু স্টেজে বসে থাকা বুড়ো মানুষটা তাকে সুযোগ না দিয়ে

আরেকজনের কাছে চলে গেল। এবারের প্রশ্নটা ছিল বিগ ব্যাং নিয়ে, প্রশ্নটা ছিল সুন্দর, উত্তরটাও দেয়া হলো সুন্দর করে। রাশারও একটা প্রশ্ন ছিল, জাহানারা ম্যাডাম তাকে বিজ্ঞানের যে বইটা দিয়েছেন সেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে বিচিত্র একটা বিজ্ঞানের কথা বলা আছে, সেখানে ওয়েভ ফাংশন বলে আরো বিচিত্র একটা কথা আছে, সেটা নিয়ে সে প্রশ্ন করতে চাইছিল। প্রথম প্রথম খুব বেশি ছেলেমেয়ে প্রশ্ন করছিল না, তখন হাত তুললে তাকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হতো। এখন সবাই হাত তুলে বসে আছে, সবাই কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়। তাই রাশা আর চেষ্টা করল না চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

প্রশ্নোত্তর পর্ব যখন শেষের দিকে সেছে তখন রাশা কমবয়সী একটা মেয়ে একটা কাগজ নিয়ে স্টেজে এস বুড়ো মানুষদের একজনের সাথে একটু কথা বলে তার কাছ থেকে মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে বলল, আমরা একটা মেয়েকে খুঁজছি। সে যেন এক্ষুণি আমার অফিসে চলে আসে। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর হচ্ছে দুই হাজার তিনশ সাতাশ। আর তার নাম হচ্ছে- মেয়েটা নামটা দেখার জন্যে কাগটার দিকে তাকাল। রাশা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দুই হাজার তিনশ সাতাশ, আর সত্যি তখন মেয়েটি মাইক্রোফোনে তার নাম ধরে ডাকল।

রাশা একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, এত হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ভেতরে তাকে আলাদা করে কেন ডাকছে। কোনো একটা সমস্য নিশ্বয়ই হয়েছে, কিন্তু কী সমস্যা? তবে একটা জিনিষ অনুমান করা যাচ্ছে অফিম্পিয়াডের অঙ্কগুলো মনে হয় ঠিক হয়েছে, তা নাহলে আলাদা করে তাকে ডাকবে কেন? রাশার একই সাথে একধরনের আনন্দ আবার অন্য ধরনের ভয় হতে থাকে।

কমবয়সী মেয়েটির পিছু পিছু রাশা যেতে থাকে। মেয়েটা বলল, "আমার নাম মিমি। আমি সায়েন্স অলিম্পিয়াডের কো-অর্ডিনেটর।"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "মিমি আপু, আমাকে কেন ডেকেছেন?"

"আমি ঠিক জানি না, পরীক্ষার কন্ট্রোলার খবর পাঠিয়েছে! চলো গিয়ে দেখি।"

রাশা মিমি নামের মেয়েটার পিছনে পিছনে একটা তিনতলা বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একটা রুমে গিয়ে ঢুকল। সেই রুমে খিটখিটে ধরনের একটা মানুষ বসে আছে, রাশাকে দেখে চশমার উপর দিয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর খসখসে গলায় বলল, "তুমি সেই মেয়ে?"

রাশা যেহেতু আগে-পিছে কিছু জানে না তাই কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মানুষটা খসখসে গলায় বলল, "পরীক্ষা তো খুবই ভালো দিয়েছ, একেবার ফার্স্ট কিন্তু এত কেয়ারলেস হলে কেমন করে হবে?"

রাশা জিজ্ঞেস করল, "কেয়ারলেস?"

"হ্যাঁ। খাতায় নাম লিখেছ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখেছ, স্কুলের নাম লেখ নাই।" মানুষটি রাশাকে তার খাতাটা দেখিয়ে বলল, "এই দেখছ না, এখানে বড় বড় করে লেখা আছে স্কুলের নাম লিখতে হবে?"

রাশা কিছু বলল না। খিটখিটে মানুষটা বলল, "পরীক্ষার নিয়মে স্পষ্ট বলা আছে ভুল কিংবা মিথ্যা তথ্য দিলে কিংবা সব তথ্য না দিলে খাতা ক্যান্সেল হয়ে যাবে! বুঝলে মেয়ে আমি ইচ্ছে করলে তোমার খাতা ক্যান্সেল করে দিতে পারতাম। বুঝেছ?"

রাশা মাথা নেড়ে বলল যে সে বুঝেছে। খিটখিটে মানুষটা বলল, "কিন্তু তুমি এইটুকুন মেয়ে পরীক্ষায় এত ভালো করেছ খাতা ক্যান্সেল করি কেমন করে? তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। নাও স্কুলের নাম লেখ। ফিউচারে এরকম কেয়ারলেস হবে না।"

রাশা ইতস্তত করে বলল, "আসলে আমি কেয়ারলেস হইনি। আমি আসলে ইচ্ছা করে স্কুলের নামটা লিখি নাই।"

খিটখিটে মানুষটার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল, সরু চোখে রাশার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তাহলে কেয়ারলেস না, তুমি হচ্ছ আইন অমান্যকারী! নিয়ম কানুনের প্রতি তোমার কোনো সম্মান নেই–"

"না, না, তা নয়।" রাশা একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "আসলে আমার স্কুলটার নাম একটা রাজাকারের নামে। খাতায় রাজাকারের নামটা লিখতে ইচ্ছে করে না তো–"

মানুষটার মুখটা এবারে কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল। সে রাশার খাতাটা টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসে রাশার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বলেছ?"

"বলেছি যে স্কুলটার নাম একটা রাজাকারের নামে, সেই নামটা লিখতে ইচ্ছে করে না।"

"রাজাকার?"

"জি।"

"তোমার বয়স কত?"

"চৌদ্দ।"

"তোমার বয়স চৌদ্দ আর এই বয়সে তুমি রাজাকার মুক্তিযুদ্ধের পলিটিক্সে ঢুকে গেছ?"

"ঠিক পলিটিক্স না–"

মানুষটা ধমক দিয়ে রাশাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমি কী বলি শোনো। এই দেশে রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে অনেক পলিটিক্স হয়েছে, আর না। বুঝেছ? যে জিনিস দেখ নাই সেই জিনিস নিয়ে কথা বলবা না।"

"কিন্তু–"

মানুষটা ক্রুদ্ধ মুখে বলল, "বড় বড় লম্বা লম্বা কথা অনেক শুনেছি। আমার বয়স তো কম হয় নাই। লম্বা লম্বা কথা বললে সেই লম্বা কথা এক সময়ে গিলতে হয়। তুমি এখন যেভাবে গিলবে।"

মানুষটা কী বোঝাতে চাইছে রাশা অনুমান করতে পারল, তারপরও সে বলল, "আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ আমি কী বলছি। খুব বড় গলায় বলেছ, রাজাকারের নাম লিখতে ইচ্ছা করে না! এখন ফার্স্ট প্রাইজটার জন্যে তুমি এসে ঠিকই রাজাকারের নাম লিখবে। যদি না লেখো তাহলে আমি তোমার খাতা ক্যান্সেল করে দেব।"

এতক্ষণ মিমি নামের মেয়েটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, এবারে সে একটু অস্থির হয়ে বলল, "স্যার আমি ওর রেজিস্ট্রেশন ফর্ম খুঁজে বের করে স্কুলের নামটা নিয়ে আসি স্যার। আমি লিখে দিই–"

খিটখিটে মানুষটা চিৎকার করে বলল, "না! এই মেয়ের নিজের লিখতে হবে। তাকে শিখতে হবে থুথু ফেলা সোজা। সেই থুথু চেটে খাওয়া কঠিন।"

রাশার মনে হলো তার মাথার ভেতরে বুঝি আগুন ধরে গেছে। মনে হলো সে পরিষ্কার করে কিছু চিন্তা করতে পারছে না– তার নানি যখন দুই মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলেন, মাথাটা মনে হয় আউলে গেছে তখন তার মনে হয় ঠিক এরকম লাগে!

"লেখো।" খিটখিটে মানুষটা খাতাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "রাজাকারের নামে দেওয়া তোমার স্কুলের নাম লেখো।"

রাশা বলল, "আমি লিখব না।"

মানুষটা মনে হয় চমকে উঠল, বলল, "কী বললে?"

"আমি বলেছি, আমি আমার খাতায় কোনো রাজাকারের নাম লিখব না।"

মানুষটা মনে হলো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "তুমি তোমার স্কুলের নাম লিখবে না?"

"না।"

"তাহলে আমি তোমার খাতা ক্যান্সেল করে দেব। সবচেয়ে বেশি মার্কস পেয়েও তুমি কোনো পুরস্কার পাবে না।"

"জানি।"

"তারপরেও তুমি তোমার খাতায় তোমার স্কুলের নাম লিখবে না?"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি থুথু ফেলেছি, সেই থুথু আমি চেটে খাব না।"

খিটখিটে মানুষটা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "বেয়াদব মেয়ে।" কিছুক্ষণ হিংস্র চোখে সে রাশার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তুমি আমাকে চেনো না! আমি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে কোনো কথা বলি নাই, আমি সত্যি সত্যি তোমার খাতা ক্যান্সেল করব। এই দেখো–"

মানুষটি টেবিল থেকে একটা লাল মার্কার হাতে তুলে নেয়, তখন মিমি নামের মেয়েটা ছুটে এসে রাশার খাতাটা আড়াল করার চেষ্টা করল, কাতর গলায় বলল, "প্লিজ স্যার। প্লিজ! ওর খাতাটা ক্যান্সেল করবেন না–

আমাকে পাঁচটা মিনিট সময় দেন আমি ওর স্কুলের নাম নিয়ে আসছি! প্লিজ!"

খিটখিটে মানুষটি প্রায় ধাক্কা দিয়ে মিমিকে সরিয়ে দিয়ে রাশার খাতার ওপর লাল কালিতে বড় বড় করে ইংরেজিতে লিখল ক্যান্সেলড! তারপর খাতাটা ছুড়ে দিয়ে রাশার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এবারে যেতে পারো। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে বলব, ইচ্ছে হলে জাহান্নামেও যেতে পারো।"

রাশা ঘর থেকে শান্ত মুখে বের হয়ে এলো, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তার চোখ দিয়ে পানি বের হতে থাকে। কাঁদবে না, সে কিছুতেই কাঁদবে না প্রতিজ্ঞা করেও সে নিচে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে। বিল্ডিংয়ের একটা বড় পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে অনেক কষ্টে নিজের কান্না থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই থামাতে পারল না, সে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কেউ দেখে ফেললে সেটা ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে।

রাশা অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করল, তারপর বের হয়ে এলো। এখন আর এখানে থাকার কোনো অর্থ নেই। সত্যি কথা বলতে কী যখন পুরস্কার দেয়া হবে তখন যখন ফার্স্ট প্রাইজ দেয়া হবে তখন মনে হয় দুঃখে তার বুকটা একেবারে ফেটে যাবে। সে তখন কেমন করে সেই দৃশ্য সহ্য করবে? রাশা টের পায় তার ভেতরে ভয়ঙ্কর একধরনের রাগ ফুঁসে উঠছে, অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে শান্ত করল।

হেডস্যার বলেছেন এখানে থাকতে, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শেষে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। তাই তাকে এখানে থাকতেই হবে। একটা কাজ করা যায়, সে এখন এখান থেকে বের হয়ে যাবে, যখন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হবে তখন সে ফিরে আসবে। অনুষ্ঠান শেষ হবে বিকেল পাঁচটায়, ফিরে আসবে তারপর।

রাশা হেঁটে হেঁটে গেট খুলে বের হয়ে গেল। বাইরে ব্যস্ত রাস্তা, বড় বড় বাস-ট্রাক গাড়ি যাচ্ছে। রাশা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে, ফুটপাথে নানারকম দোকানপাট। একটা বড় ওভারব্রিজ, ওভারব্রিজের নিচে ছোট

একটা খুপচিতে একটা আস্ত পরিবার থাকে। ছোট একটা বাচ্চা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা রাস্তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তার নাক ঘষে বড় বড় বাস যাচ্ছে, বাচ্চাটির কোনো ভয়ডর নেই। রাশা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। ফুটপাথে একজন নানা রকম বই বিক্রি করছে, রাশা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বইগুলো দেখল। একটু পরে সে আবিষ্কার করল আসলে সে শুধু তাকিয়ে আছে, কিছু দেখছে না। তার এত অস্থির লাগছে যে সে কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছে না। মনে হচ্ছে লাফিয়ে একটা চলন্ত বাসের নিচে চাপা পড়ে যায়।

"না, আমি পাগলামো করব না।" রাশা নিজেকে বোঝাল, "আমি যেটা করেছি, ঠিকই করেছি। আমি বলেছিলাম আমি রাজাকারের নাম লিখব না, আমি নাম লিখি নাই। যে রাজাকার আমার নানাকে খুন করেছে, আমি মরে গেলেও তার নাম লিখব না। আমার নানা ছিলেন মুক্তিযাদ্ধা, আমি নানার সম্মানের জন্যে ফাইট করেছি। কেউ এই ফাইটের কথা জানবে না। না জানলে নাই– আমি তো জানব!" রাশা বিড়বিড় করে বলল, "আমি জানব। আমি জানব। আমি জানব।"

রাশা ইতস্তত হাঁটে, একটা বাসস্ট্যান্ডে অনেক মানুষ বসে ছিলো একটা বাস আসতেই সবাই বাসে উঠে যেতেই বাসস্ট্যান্ড খালি হয়ে গেল। রাশা তখন চুপচাপ বাসস্ট্যান্ডে বসে থাকে। বেঞ্চের অন্যপাশে একটা পাগল বসে আছে, তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখগুলো লাল, দাঁতগুলো হলুদ। পাগল মানুষটা রাশার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল, যেন সে কত দিনের পরিচিত। রাশা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিক তাকিয়ে থাকে।

পাঁচটা বাজার পরও রাশা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর সে হেঁটে গণিত অলিম্পিয়াডের মাঠের দিকে রওনা দিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুরস্কার দেয়া হয়ে গেছে। তার যে ফার্স্ট প্রাইজটা পাওয়ার কথা ছিল সেটা অন্য একজন নিয়ে নিচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই এখন আর সেই দৃশ্যটা দেখতে হবে না।

সায়েন্স অলিম্পিয়াডের মাঠের কাছে এসে রাশা গেট খুলে ভেতরে ঢুকল, সে ভেবেছিল দেখবে পুরো মাঠ ফাঁকা, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল

প্যান্ডেল বোঝাই মানুষ। রাশা আরেকটু এগিয়ে গেল তখন দেখতে পেল একটা মানুষ বক্তৃতা দিতে উঠেছে। নিশ্চয়ই শেষ বক্তৃতা, রাশা নিজেকে বুঝিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেল। অনেক মানুষ, বসার জায়গা বলতে গেলে নেই, একটু সামনে একটা চেয়ার ফাঁকা, রাশা সেখানে গিয়ে বসল। পাশে তাকিয়ে দেখে হোস্টেলে প্রথম দিন দেখতে পাওয়া ঝকঝকে চেহারার মেয়েটি, যে মেয়েটি সন্দেহ করেছিল যে সে বড় কোনো মানুষকে দিয়ে অঙ্কগুলো করিয়ে পাঠিয়েছে। রাশা অস্বস্তিবোধ করতে থাকে, কিন্তু কিছু করার নেই। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখন এসেছ?"

"না। আগেই এসেছিলাম– একটু বাইরে গিয়েছিলাম।"

"ও।"

রাশা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "প্রাইজ দিয়ে দিয়েছে তো, তাই না?"

"না। এখনো দেয়নি।"

রাশা চমকে উঠল, "এখনো দেয়নি?"

"নাহ্। সবাই লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছে।"

"এখনো প্রাইজ দেয়নি?"

"এক্ষুণি দেবে, ঐ যে দেখো প্রাইজ আনছে।"

রাশা দেখল স্টেজে টেবিলের ওপর অনেকগুলো মেডেল এনে রাখা হচ্ছে। একটি মেয়ে হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে স্টেজে উঠে ব্যস্তভাবে অন্য একজনের সাথে কথা বলছে। রাশার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, তার লাফ দিয়ে উঠে ছুটে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে করছিল কিন্তু সে উঠতে পারল না। এখন আর উঠে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। যে দৃশ্যটা দেখার জন্যে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এখন তাকে বসে সেই দৃশ্যটি দেখতে হবে। সে ঘুরে ঘুরে সেই দৃশ্যটি দেখার জন্যেই ফিরে এসেছে। খোদা এত নিষ্ঠুর কেন কে জানে! রাশা মাথা নিচু করে বসে রইল।

মেয়েটি মাইকে একজন একজন করে নাম ডাকতে থাকে, যার নাম ডাকা হয়েছে সে আনন্দে চিৎকার করে নাচতে নাচতে স্টেজে যায়। আধা পাকা চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, খোঁচা খোঁচা গোঁফ একজন মানুষ পুরস্কার দিতে থাকে। এই মানুষটা নিশ্চয়ই একজন মন্ত্রী হবে, সে শুনেছিল পুরস্কার দেয়ার জন্য একজন মন্ত্রী আসবেন।

বারোজনকে সেকেন্ড রানারআপ পুরস্কার দেয়া হলো। তারপর আরো বারোজন পেল রানারআপ পুরস্কার। শেষে ছয়জন পেল চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার। যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের বেশিরভাগই ছেলে, হাতেগোনা অল্প কয়জন মাত্র মেয়ে। যতটুকু যন্ত্রণা হবে বলে ভেবেছিল রাশা আবিষ্কার করল তার ততটুকু যন্ত্রণা হলো না, ভেতরটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে আছে, মনে হচ্ছে কিছুই টের পাচ্ছে না। সে নিঃশব্দে বসে আছে, এক্ষুণি অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে ঘোষণা করা হবে তখন সবার সাথে সাথে সে উঠে দাঁড়াবে তারপর হেঁটে চলে যাবে। কিন্তু ঘোষণাটি করা হলো না আর রাশা ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে বসে রইল।

পাশে বসে থাকা ঝকঝকে চেহারার মেয়েটা বলল, "কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে।"

রাশা মাথা তুলে তাকাল, "কী ঘাপলা?"

"ঐ দেখো। একটা মেয়ে হাতে একটা কাগজ নিয়ে চেঁচামেচি করছে। সবাই তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।"

রাশা চোখ তুলে তাকাল, মিমি নামের মেয়েটা হাতে একটা খাতা নিয়ে কথা বলছে, অন্যেরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। রাশা সাথে সাথে বুঝে গেল কী হয়েছে, মিমির হাতে যে খাতাটা, সেটা হচ্ছে তার পরীক্ষার খাতা, সে এই খাতাটা নিয়ে স্টেজে চলে এসেছে, সবাইকে নিশ্চয়ই বলছে যে একটা খুব বড় অবিচার করা হয়েছে। হঠাৎ করে রাশার দুই চোখে পানি চলে এলো।

মন্ত্রী চেঁচামেচি শুনে খুব বিরক্ত হলেন মনে হলো, হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন মিমিকে তার কাছে পাঠাতে। মিমি মন্ত্রীকে খাতাটা দেখাল, হাত-পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে কিছু বলল, মন্ত্রীও খাতাটা দেখলেন তারপর মাথা নাড়লেন। বুড়ো মানুষগুলোও মন্ত্রীর কাছে চলে এসেছে, তারাও কিছু একটা বোঝাচ্ছে, মন্ত্রী মনে হয় তাদের কথাও শুনলেন, তারপরে মাথা নাড়লেন।

পাশে বসে থাকা মেয়েটা বলল, "কী হচ্ছে বলে মনে হয়?"

রাশা বলল, "একটা খাতা পাওয়া গেছে যেখানে একজন অনেক মার্কস পেয়েছে কিন্তু তাকে কোনো পুরস্কার দেয় নাই!"

"তুমি কেমন করে জানো?"

"জানি না। আন্দাজ করছি।"

রাশা দেখল হঠাৎ মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, হাতে মাইকটা নিয়ে বললেন, "আমি একটা ছোট ঘোষণা দিতে চাই। এই যে আজকে সায়েন্স অলিম্পিয়াড হলো, দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক, প্রফেসর মিলে সেটা আয়োজন করেছেন, তাদের নিয়ম-কানুনমতো খাতা দেখা হয়েছে পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তারা সবাই জ্ঞানী-গুণী মানুষ, আমার থেকে অনেক বেশি লেখাপড়া জানেন, তারা যেভাবে এটা করেছেন সেভাবেই সবকিছু হয়েছে।"

মন্ত্রী রাশার খাতাটা দেখিয়ে বললেন, "এখন আমার কাছে একটা খাতা এসেছে, অলিম্পিয়াডের নিয়ম-কানুন মানে নাই দেখে এই খাতাটা বাতিল হয়েছে। ঠিকই আছে– আমার কিছু বলার নাই। তবে যে জিনিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে, এইটা যার খাতা সেই মেয়েটা সবচেয়ে বেশি মার্কস পেয়েছে! সবার চেয়ে বেশি।"

প্যান্ডেলের নিচে বসে থাকা সবাই বিস্ময়ের মতো শব্দ করল!

মন্ত্রী বললেন, "সায়েন্স অলিম্পিয়াড কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি সেটাকে পুরোপুরি সম্মান দেখাচ্ছি, যে খাতাটা বাতিল সেটা বাতিলই থাকুক। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মেয়েটাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই! আপনারা কী বলেন?"

সামনে বসে থাকা হাজার খানেক ছেলেমেয়ে আর তাদের বাবা-মা চিৎকার করে বলল, "পুরস্কার! পুরস্কার!"

মন্ত্রী বলল, "তাহলে মা তুমি আসো!" মন্ত্রী খাতাটা দেখে রাশার নামটা পড়লেন।

প্যান্ডেলের নিচে বসে থাকা হাজার খানেক ছেলেমেয়ে, তাদের বাবা-মা আর শিক্ষকেরা নিশ্বাস বন্ধ করে মানুষটিকে দেখার জন্যে বসে রইল।

রাশা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল, তার চোখে পানি এসে গিয়েছে, সে সাবধানে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিল। তারপর সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার পাশে বসে থাকা ঝকঝকে

চেহারার মেয়েটির মনে হলো একটা হার্ট অ্যাটাক হলো, চিৎকার করে বলল, "তুমি?"

রাশা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

মেয়েটার তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, আবার জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি!"

তখন মেয়েটি একটা গগনবিদারি চিৎকার দিল যেন রাশা নয় আসলে তাকেই স্টেজে ডাকা হচ্ছে! সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর রাশাকে জাপটে ধরে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে চিৎকার করতে করতে স্টেজের দিকে ছুটতে থাকে। রাশা অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটার কবল থেকে ছোটার চেষ্টা করল কিন্তু মেয়েটি তাকে ছাড়ল না, একেবারে স্টেজের সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। দৃশ্যটি দেখার জন্যে প্যান্ডেলের প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবার তারা বসতে শুরু করে।

মন্ত্রী রাশার হাত ধরে স্টেজে নিয়ে এসে বললেন, "মা, আমি তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই। তুমি বলো কী পুরস্কার চাও।"

মন্ত্রী মাইক্রোফোনটা রাশার মুখে ধরলেন, রাশা বলল, "আমি আমার পুরস্কার পেয়ে গেছি। এই যে আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন এটাই আমার পুরস্কার।"

"তারপরেও তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই। বলো।"

"আপনি আমার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন।"

সামনে যারা বসেছিল কোনো একটা কারণে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। মন্ত্রী বলল, "অবশ্যই মা, অবশ্যই আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেব।"

রাশা দেখল বুড়ো বুড়ো প্রফেসর মন্ত্রীর পিছনে এসে ভিড় করে উসখুস করছে। একজন গলা উঁচিয়ে বলল, "স্যার আসলে একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে, আমরা আসলে মেয়েটাকে একটা স্পেশাল প্রাইজ দিতে চাই।"

মন্ত্রী মহোদয় হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "কোনো প্রয়োজন নাই! এই মেয়েটি আপনাদের পুরস্কার ছাড়াই অনেকদূর যাবে বলে মনে হচ্ছে!"

বুড়ো প্রফেসর বলল, "কিন্তু স্যার–"

মন্ত্রী হাত নেড়ে বুড়ো প্রফেসরকে বাতিল করে দিয়ে রাশার দিকে তাকালেন, বললেন, "মা, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। তুমি এইটুকুন বাচ্চা মেয়ে এই রকম কঠিন কঠিন অঙ্ক করে ফেল, কিন্তু খাতার উপরে স্কুলের নাম লিখতে ভুলে গেলে এটা কী রকম কথা?"

রাশা বলল, "আমি ভুলি নাই।"

"তাহলে?"

"আমি ইচ্ছা করে লিখি নাই।"

"কেন?"

"আমাদের স্কুলের নামটা একটা রাজাকারের নামে। আমার নানা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, এই রাজাকার আমার নানাকে মেরেছে। আমি মরে গেলেও কোথাও এই রাজাকারের নাম লিখব না।"

মন্ত্রী কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে রাশার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, এতক্ষণ হাতের মাইক্রোফোনে কথা বলছিলেন, এখন মাইক্রোফোনটা টেবিলে রেখে রাশাকে কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "মা, আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। সেভেন্টি ওয়ানে আমার অনেক বন্ধু মারা গেছে। রাজাকাররা মেরেছে– আমি মূর্খ মানুষ, লেখাপড়া করি নাই। আমার বন্ধুরা সব ট্যালেন্টেড ছেলে ছিল, বেঁচে থাকলে আজকে কত বড় বড় মানুষ হতো!"

মন্ত্রী রাশার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "মা, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, একসপ্তাহের মাঝে আমি তোমার স্কুলের নাম বদলে দেব। রাজাকারের নাম সরিয়ে একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম দিব। এই স্কুলের সবচেয়ে কাছাকাছি এলাকায় শহীদ হয়েছে সে রকম একজন মুক্তিযোদ্ধার নামে। ঠিক আছে?"

মন্ত্রী এমনভাবে রাশাকে জিজ্ঞেস করলেন, যেন তার কথার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

রাশা বলল, "ঠিক আছে। আপনাকে থ্যাংকু। অনেক থ্যাংকু।" তারপর কাজটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না তারপরও করে ফেলল, মন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, "আমার মনে আর কোনো দুঃখ নাই!"

স্টেজে যারা উপস্থিত ছিল, সামনে যারা বসে আছে তারা সবাই বুঝতে চাইছিল ঠিক কী হচ্ছে। মন্ত্রী তাই মাইকটা হাতে নিয়ে বললেন, "আমি এই মায়ের কাছে ছোট একটা ওয়াদা করেছি। তার স্কুলের নামটা আমি বদলে দিব। সেই নামটা দেয়া হবে একটা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে। আমার এই ছোট মা তখন বুক ফুলিয়ে সবার কাছে তার স্কুলের নামটা বলতে পারবে।"

স্টেজ থেকে নামার পর অনেকগুলো টেলিভিশন ক্যামেরা রাশাকে ঘিরে ধরল, রাশা দেখল তাদের হেডস্যার সবাইকে ঠেলে রাশার পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, "তুমি যে সবচেয়ে ভালো করেও সায়েন্স অলিম্পিয়াডে পুরস্কার পেলে না সে জন্যে তোমার কি মন খারাপ হয়েছে?"

রাশা মাথা নাড়ল, "না একটুও মন খারাপ হয়নি। আমার স্কুলে আর রাজাকারের নাম থাকবে না এইটা আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।"

হেডস্যারকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি কিন্তু তিনি নিজে থেকে যোগ করলেন, "আমাদের স্কুলের নাম নিয়ে একটু সমস্যা আছে কথা সত্যি কিন্তু স্কুলটা খুব হাইফাই। তিরিশটা কম্পিউটার আছে। আমি হচ্ছি হেডমাস্টার কফিলউদ্দিন বি.এড।"

সাংবাদিকরা রাশাকে ঘিরে তাকে প্রশ্ন করতে লাগল, রাশা চেষ্টা করল শান্তভাবে উত্তর দিতে। মাঝে মাঝে তার একটু নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু সে লক্ষ করল কাছেই জাহানারা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে মিমি। এই দুজনকে দেখেই তার সাহস বেড়ে গেল, সে তখন বেশ গুছিয়েই সব প্রশ্নের উত্তর দিল।

সাংবাদিকরা চলে যাবার পর রাশা ছুটে গিয়ে মিমির হাত ধরে বলল, "মিমি আপু! আপনাকে যে আমি কিভাবে থ্যাংকু দিব! ইস!"

মিমি হি হি করে হেসে বলল, "আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে শামসু মিয়ার।"

"শামসু মিয়াটা কে?"

সাংবাদিকরা রাশাকে ঘিরে তাকে প্রশ্ন করতে লাগল।

"ঐ যে তোমার খাতা ক্যান্সেল করে দিল। ব্যাটা রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার। এখন চাকরি চলে যাবে দেখো। কত বড় সাহস।"

জাহানারা ম্যাডাম রাশাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "বুঝলে রাশা, তোমাকে দেখে গর্বে আমার বুক ফুলে যাচ্ছে। তোমার মতোন দুই-একজন ছাত্রী পেলেই আমাদের জীবনটা কমপ্লিট হয়।"

হেডমাস্টার বললেন, "রাশা আসলে আমাদের স্কুলের ছাত্রী। আমি হচ্ছি হেডমাস্টার। আমাদের স্কুলের নামটা নিয়ে একটু সমস্যা আছে কথা সত্যি। কিন্তু স্কুল ভালো। কম্পিউটারই আছে তিরিশটা। বি.এস.সি. শিক্ষক তিনজন। আমার নাম কফিলউদ্দিন বি.এড।"

জাহানারা ম্যাডাম হাসলেন, বললেন, "আপনার স্কুল নিশ্চয়ই খুব ভালো, তা না হলে এরকম ছাত্রী কোথা থেকে তৈরি হয়?"

আহাদ আলী রাজাকার

কোনোরকম অনুষ্ঠান ছাড়াই একদিন স্কুলের পুরানো সাইনবোর্ড নামিয়ে নতুন একটা সাইনবোর্ড লাগানো হলো, সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা 'শহীদ রায়হান উচ্চ বিদ্যালয়'। রায়হান পাশের গ্রামের ছেলে, একাত্তরে কলেজে পড়ত, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই সে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। ট্রেনিং নিয়ে আবার এখানেই ফিরে এসেছে, এখানে মিলিটারির সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করে মারা গেছে, তখন তার বয়স বিশ বছরও হয়নি। হেডমাস্টার অনেক খোঁজাখুঁজি করে রায়হানের একটা ছবি জোগাড় করেছেন, দেখে মনে হয় বাচ্চা একটা ছেলে, মুখ টিপে হাসছে! ছবিটা বড় করানোর কারণে সেটা বেশ ঝাপসা হয়ে গেছে, সেই ছবিটাই বাঁধাই করে হেডমাস্টারের অফিসে রাখা হয়েছে।

প্রতিদিন যখন স্কুলে আসে তখন অনেক দূর থেকে রাশার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, রাজাকার আহাদ আলীর নামটা তাকে আর কোনোদিন বলতে হবে না, এটা চিন্তা করেই রাশার মনটা ভরে ওঠে। তার সবচেয়ে বেশি জানতে ইচ্ছে করে আহাদ আলী রাজাকারটা এখন কী করছে। লোকজনের কাছে কানাঘুষা শুনেছে যে সে নাকি মামলা করবে, করলে করুক। রাশার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

কয়েকদিন পর তারা যখন সবাই নৌকা করে ফিরে আসছে তখন মতি বলল, "রাশা আপু। তোমার মনে হয় একটু সাবধান থাকা দরকার।"

রাশা অবাক হয়ে বলল, "আমার সাবধান থাকা দরকার? কেন?"

"আহাদ আলী রাজাকার খুবই ডেঞ্জারাস। তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে।"

"আমার কী ক্ষতি করবে?"

"সেইটা জানি না। কিন্তু তোমার সাবধান থাকা দরকার।"

মতি কম কথা বলে, কাজেই সে যদি রাশাকে সাবধান থাকতে বলে তাহলে সেটা খুবই গুরুতর কথা। রাশা জিজ্ঞেস করল, "কোনো কিছু কি হয়েছে?"

"বলতে পারো হয়েছে।"

"কী হয়েছে?"

"সেইদিন আমরা স্কুলে যাচ্ছি তখন একটা মানুষ আমাকে ডেকে নিল, ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এইখানে রাশা কোন মেয়েটা!"

"তুই কী বললি?"

"আমি বলেছি আমি চিনি না।"

জয়নব বলল, "বেশ করেছিস। কোনো কথা বলার দরকার নাই।"

"আমি তো বলি না, কিন্তু কেউ না কেউ তো বলে দিবে।"

"তা ঠিক।"

মতি বলল, "রাশা আপু, তুমি কখনো একা বের হবে না।"

রাশা বলল, "আমি একা আর কোথায় যাই। সবসময়েই তো একসাথেই থাকি।"

জয়নব বলল, "হ্যাঁ এখন থেকে আরো বেশি একসাথে থাকতে হবে।"

নৌকা চালিয়ে ওরা নদী থেকে বিলে ঢুকল, মোটামুটি নির্জন বিল, অনেক দূরে দূরে একটা-দুইটা জেলে নৌকা মাছ ধরছে। এ ছাড়া কোথাও কোনো জনমানুষ নেই। রাশার দেখে বিশ্বাসই হয় না যে শীতকালে প্রায় পুরো বিলটাই শুকিয়ে যাবে, এখন যেখানে পানি, তখন সেখানে হবে ধানক্ষেত।

রাশা কয়েকদিন পর লক্ষ করল তারা সবাই যখন স্কুল থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে নৌকা ঘাটে যাচ্ছে তখন একজন মানুষ তাদের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। তারা যখন নৌকায় উঠে রওনা দিয়েছে তখন তার সাথে আরো দুজন লোক এসে যোগ দিল, তারপর তারা তিনজন তাদের নৌকার

দিকে তাকিয়ে রইল। লোকগুলোর কী উদ্দেশ্য কে জানে কিন্তু রাশার পুরো ব্যাপারটাকেই কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়, কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হয়। তার বুকের ভেতর কেমন যেন একধরনের দুশ্চিন্তা এসে ভর করে।

শুধু যে রাস্তায় তাদের পিছু পিছু অপরিচিত মানুষ হাঁটে তা নয়, স্কুলের ভেতরেও মাঝে মাঝে অপরিচিত মানুষ এসে ক্লাসের ভেতর উঁকি দিতে লাগল। মানুষগুলো কী করতে চায় কে জানে। রাশা কাউকে ঠিক করে বলতেও পারছিল না, কী করবে বুঝতে পারছিল না। একবার ভাবল হেডমাস্টারকে জানাবে, কিন্তু তাকে জানিয়ে কী লাভ? সালাম নানাকে জানিয়ে রাখলে হয়, কিন্তু রাশা তার পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত, সালাম নানার সাথে দেখা করারই সময় পাচ্ছিল না।

সেদিন সবাই দল বেঁধে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসছে, রাশা চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ করে দেখার চেষ্টা করল, কেউ তাদের পিছু নিয়েছে কিনা, কাউকে দেখল না। তখন সে গলা নামিয়ে বলল, "আমাদের সমস্যাটা কী জানিস?"

জয়নব জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"আমরা প্রত্যেক দিন একইভাবে যাই আর আসি। তাই কেউ যদি আমাদের ধরতে চায় তাহলে সে জানে তাকে ঠিক কী করতে হবে। কোথায় আমাদের ধরতে হবে।"

"তাহলে আমাদের কী করতে হবে?"

"একেক দিন একেক দিক থেকে স্কুলে আসতে হবে। আবার একেক দিন একেক পথ দিয়ে স্কুল থেকে বাড়িতে যেতে হবে।"

মতি বলল, "তুমি চিন্তা করো না রাশা আপু। আমি সবসময় তোমার সাথে থাকব। কেউ তোমারে কিছু করতে পারবে না। আমার জান থাকতে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না।"

রাশা হেসে বলল, "তুই কী করবি?"

"আমি জানে মেরে ফেলব!"

জিতু বলল, "রাশাপু আমিও থাকব তোমার সাথে। আমিও জানে মেরে ফেলব!"

রাশা হি হি করে হেসে বলল, "তোদের মতো দুইজন বডিগার্ড থাকলে আমার আর চিন্তা কিসের?"

কথা বলতে বলতে তারা নৌকাটায় উঠেছে। যে যার জায়গায় বসার পর মতি লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে নদীর পানিতে নিয়ে এসেছে। তারপর বৈঠা বেয়ে সাবধানে নদীটা পার হয়েছে। নদীর কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে ছোট খালটা দিয়ে বিলে ঢুকেছে। বিলের পানি ধীরে ধীরে কমে আসছে, জায়গায় জায়গায় শুকনো মাটি বের হয়েছে, সেখানে সাদা ধবধবে কাশফুল। বাতাসে কাশফুলগুলো মাথা নাড়ছে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

অন্যান্য দিনের মতোই বিলটা নির্জন, শুধু অনেক দূরে একটা ট্রলার; তার ইঞ্জিনের শব্দ এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। বিলের ভেতর এসে রাশা মতির কাছ থেকে বৈঠাটা নিয়ে পিছনে বসেছে। বৈঠাটাকে হালের মতো করে ধরেছে, মতি আর জিতু তখন মোটামুটি প্রতিযোগিতা করে বৈঠা বাইছে, নৌকাটা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। বেশ খানিকদূর এগিয়ে যাবার পর তারা লক্ষ করল ট্রলারটা বিশাল বিল পাড়ি দিয়ে ঠিক তাদের দিকেই আসছে, এতক্ষণে সেটা অনেক কাছে চলে এসেছে। ট্রলারের ইঞ্জিনের বিকট শব্দটা এখন রীতিমতো কানে লাগছে।

মতি বলল, "এই ট্রলারটা কই যায়"

জিতু বলল, "মনে হয় নদীতে।"

"আসছে কোথা থেকে?"

"কে জানে, কোথা থেকে আসছে।"

পুরো বিলে আর কোথাও কেউ নেই শুধু তাদের নৌকাটা আর এই ট্রলার, তাই তারা কৌতূহলী হয়ে ট্রলারটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ট্রলারের ইঞ্জিনটা হঠাৎ আরো জোরে গর্জন করে উঠে, রাশা লক্ষ করল সেটা এখন সোজাসুজি তাদের দিকে ছুটে আসছে। রাশা চিন্তিত মুখে বলল, "ট্রলারটা আমাদের দিকে কেন আসছে?"

জয়নব বলল, "বুঝতে পারছি না।"

মতি হাতে একটা লগি তুলে নিয়ে বলল, "নিশানা ভালো মনে হচ্ছে না। মনে হয় খারাপ মতলব আছে।"

রাশার বুকটা ধক করে উঠল, ট্রলারটা কী করতে চাইছে? ঠিক এরকম সময় রাশা দেখল দুজন মানুষ ট্রলারের ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা অনেকবার মানুষগুলোকে দেখেছে, এই মানুষগুলো অনেক দিন থেকে তাদের পিছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে।

মতি বলল, "রাশা আপু, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি আছি।"

'রাশা মতির দিকে তাকাল, শুকনা কাঠির মতো কালো দড়ি পাকানো শরীর, দুজন জোয়ান মানুষের সাথে সে কী করবে? রাশা বলল, "নৌকাটাকে বিলের কিনারে নিয়ে যাই। ঐ কাশবনের কাছে শুকনায়।"

"ঠিক আছে।"

রাশা নৌকাটাকে ঘুরিয়ে নিল। মতি আর জিতু প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে নৌকাটাকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন তারা আতঙ্কিত হয়ে দেখে ট্রলারটাও একটু ঘুরে সোজা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন আর তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই এই ট্রলারটা তাদেরকে ধরার জন্যেই এসেছে। দেখতে দেখতে সেটা তাদের ওপর ওঠে এলো। কী করবে বুঝে উঠার আগেই ট্রলারটা তাদের নৌকাকে একপাশ থেকে ধাক্কা দিল, সাথে সাথে নৌকায় যারা ছিল তারা বিলের পানিতে ছিটকে পড়ল! ট্রলারের বিকট গর্জন তার সাথে সবার চিৎকার মুহূর্তের মাঝে পুরো পরিবেশটা নারকীয় হয়ে ওঠে!

ট্রলারটা থামল না, নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পিছনে নৌকায় যারা আছে তাদের কার কী হয়েছে জানার জন্যে কোনো কৌতূহল নেই। বিলের পানির ভেতর থেকে প্রথমে জয়নব, তারপর মতি ভেসে উঠল। জিতুও একটু পরে সাঁতার কেটে তাদের কাছে এলো। সাথে আরো দুজন ছিল তারাও পানি থেকে ভেসে উঠেছে, কিন্তু রাশা নেই। জয়নব আতঙ্কিত হয়ে ডাকল, "রাশা, রাশা!"

কেউ উত্তর দিল না। মতি তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, "রাশা আপু! রাশা আপু!"

এবারেও কেউ উত্তর দিল না।

বিলের পানিতে ভেসে থাকতে থাকতে সবাই এদিক-সেদিক তাকায়, কোথাও রাশার চিহ্ন নেই।

জয়নব ভাঙা গলায় বলল, "কোথায় গেল রাশা? কোথায়?"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মানুষ রাশাকে ট্রলারের পাটাতনে চেপে ধরে রেখেছে। তার হাতে গরু জবাই করার একটা ছুরি, ট্রলারের ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ ছাপিয়ে সে চিৎকার করে রাশাকে বলল, "এই মেয়ে, তুই যদি উল্টাপাল্টা কিছু করিস, এই ছুরি দিয়ে জবাই করে দেব।"

রাশা উল্টাপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করল না, মানুষটার চেহারা, চোখের দৃষ্টি, কথা বলার ভঙ্গি সবকিছুই আশ্চর্য রকম নিষ্ঠুর। রাশা বুঝতে পারে সত্যি সত্যি একজন মানুষকে জবাই করা তার জন্যে বিন্দুমাত্র কঠিন ব্যাপার না।

মানুষটা বলল, "তোরে এখনই জবাই করে বিলের মাঝে পুঁতে ফেলা উচিত ছিল। হুজুর তোরে নিজের চোখে একবার দেখতে চাচ্ছেন তাই নিয়ে যাচ্ছি। খবরদার কোনো তেড়িবেড়ি করবি না।"

রাশার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে থাকে। হুজুর মানে নিশ্চয়ই রাজাকার আহাদ আলী। এই মানুষগুলো তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আহাদ আলীর কাছে। ট্রলারটা দিয়ে যখন নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়েছে তখন অন্য সবার সাথে সেও পানিতে ছিটকে পড়েছে, সাঁতার দিয়ে পানিতে ভেসে উঠার আগেই সে টের পেল লোহার মতো শক্ত দুটো হাত তাকে ধরে ফেলেছে, রাশা চিৎকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজে সেটা চাপা পড়ে গেল। কিছু বোঝার আগে তাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে ট্রলারের পাটাতনে চেপে ধরেছে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে সবকিছু ঘটে গেছে, রাশা কিছু বুঝে ওঠারও সময় পেল না।

রাশাকে এত জোরে পাটাতনে চেপে ধরে রেখেছে যে রাশার মনে হলো তার শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাবে, তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে রাশা সেগুলো ভালো করে বুঝতেও পারছিল না যে ভয়ঙ্কর একটা বিপদের মাঝে পড়েছে, সেটা তার সমস্ত চিন্তা করার ক্ষমতাকে শেষ

করে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছে সে একটা ঘোরের মাঝে আছে, মনে হচ্ছে চারপাশে যা ঘটছে তার সবকিছু বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন। মনে হচ্ছে এক্ষুণি সে জেগে উঠবে তখন দেখবে এই সবকিছু আসলে মিথ্যা– আসলে কিছুই হয়নি!

কিন্তু রাশা জানে এটা দুঃস্বপ্ন না। রাশা জানে যা ঘটছে তার সবকিছু সত্যি। রাশা জানে এখান থেকে বেঁচে ফিরে আসাটা হবে একটা অলৌকিক ঘটনা।

এভাবে কতক্ষণ কেটেছে ঠিক জানে না, হঠাৎ একসময় রাশা শুনতে পেল ট্রলারের ইঞ্জিনটার শব্দ কমে এলো। তাকে যেখানে আনার কথা মনে হয় তাকে সেখানে নিয়ে এসেছে। ট্রলারটার গতিও কমতে কমতে একসময় পুরোপুরি থেমে গেল। রাশা শুনতে পেল, যে মানুষটা তাকে চেপে ধরে রেখেছে সে কাউকে বলছে, "পাড়ে লাগাস না। এখানেই থামা।"

"এখানেই থামাব?"

"হ্যাঁ, পাড়ে লাগালেই কেউ না কেউ দেখে ফেলবে, আর একটা ঝামেলা হবে।"

"ঠিক আছে, একটা লগি মেরে ট্রলারটা রাখি।"

রাশা টের পেল ট্রলারটাকে নদীর মাঝখানে কোথাও থামিয়ে লগি দিয়ে আটকে ফেলা হলো।

অন্য মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "হুজুর কখন আসবেন?"

যে মানুষটা রাশাকে চেপে ধরে রেখেছে সে বলল, "হুজুর আসবেন না। অন্ধকার হলে আমরা নিয়ে যাব।"

"এতক্ষণ এই ছেমড়িকে কী করব?"

"বেন্ধে রেখে দেব। এর তড়পানি বড় বেশি, কখন কী করে তার ঠিক নাই।"

লোকটা রাশার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তুলল। গরু জবাই করার চাকুটা তার নাকের সামনে দিয়ে একবার ঘুরিয়ে এনে বলল, "একটু তেড়িবেড়ি করবি তো জবাই করে ফেলব। বুঝেছিস?"

রাশা কোনো কথা বলল না। মানুষটা তখন কোথা থেকে একটা ময়লা গামছা এনে তার মুখটা বেঁধে ফেলল, যেন সে চিৎকার করতে না পারে। তারপর আরেকটা গামছা দিয়ে হাতটা পিছনে নিয়ে ট্রলারের বেঞ্চের পায়ার সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। বাঁধনটা পরীক্ষা করে মুখে সন্তুষ্টির একটা শব্দ করে বলল, "এখন ঠিক হয়েছে। চুপ করে বসে থাক।"

রাশার কিছু করার ছিল না, তাকে চুপ করে বসেই থাকতে হলো। ভয়ঙ্কর একধরনের আতঙ্কে তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে, সে কী করবে বুঝতে পারছে না। চোখ বন্ধ করে সে মনে মনে বলল, "হে খোদা! বাঁচাও তুমি। আমাকে বাঁচাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে এখন বাঁচাতে পারবে না। কেউ না।"

ঠিক এই সময় জয়নব, মতি, জিতু আর অন্যেরা সালাম নানার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। জয়নব হাউমাউ করে কাঁদছে, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। মতি আর জিতুও একসাথে কথা বলতে চাইছে– সালাম নানা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "তোমাদের ভেতর যে কোনো একজন কথা বলো। যে কোনো একজন।"

তখন মতি বলল, "রাশা আপুকে ধরে নিয়ে গেছে!"

সালাম নানা চমকে উঠলেন, "কে ধরে নিয়ে গেছে?"

"একটা ট্রলার এসে আমাদের নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়েছে, আমরা সবাই তখন পানিতে পড়ে গেছি। পানি থেকে উঠে দেখি রাশা আপু নাই।"

"হয়তো রাশা ব্যথা পেয়েছে, ডুবে গেছে।"

জিতু বলল, "ডুবে নাই। আমরা পুরো জায়গাটা খুঁজে দেখেছি, রাশা আপু নাই। তার ব্যাগটাও পেয়েছি।"

মতি বলল, "ট্রলারের মাঝে যে দুইটা লোক ছিল তারা সবসময় আমাদের পিছে পিছে হাঁটত। রাশা আপু কোনজন আমাদের সেটা জিজ্ঞেস করত।"

সালাম নানা আতঙ্কিত গলায় বললেন, "সর্বনাশ!"

জয়নব হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "এখন কী হবে? রাশার এখন কী হবে?"

সালাম নানা ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "পুলিশকে খবর দিতে হবে। ট্রলারটাকে খুঁজে বের করতে হবে। কোনদিকে গিয়েছে?"

"উত্তর দিকে। মনে হয় মাতাখালি নদীর দিকে।"

"মাতাখালি! সর্বনাশ!"

জয়নব কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, "কেন? সর্বনাশ কেন?"

সালাম নানা বললেন, "মাতাখালি নদীর পাড়েই তো আহাদ আলী রাজাকারের বাড়ি।"

রাশা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে দেখল, হাতটাকে ছুটিয়ে আনা যায় কিনা– পারল না। এত শক্ত করে বেঁধেছে যে কোনোভাবেই সেটা ঢিলে করা সম্ভব হলো না। তার মনে হতে লাগল বুঝি হাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। হাতটাকে একটু পরপর নেড়ে সে রক্ত চলাচল চালু রাখছে। মুখের মাঝে ময়লা গামছাটা দিয়ে বেঁধেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে বাতাসের অভাবে বুঝি বুকটা ফেটে যাবে। যা তৃষ্ণা পেয়েছে সেটা বলার মতো নয় মনে হচ্ছে এক ফোঁটা পানির জন্যে সে তার জীবনটা দিয়ে দিতে পারবে।

ট্রলারের ছাদে মানুষ দুজন বসে আছে, মাঝে মাঝে নিচে এসে দেখে যাচ্ছে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। তাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা রাশা নিচে বসে শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ শুনল একজন উত্তেজিত গলায় বলল, "আরে! আরে! হুজুর নিজেই দেখি চলে আসছেন!"

অন্যজন বলল, "অন্ধকার হওয়ার পর ছেমড়িটাকে হুজুরের কাছে নেওয়ার কথা ছিল না?"

"তাই তো কথা ছিল। দেখি ব্যাপারটা কী!"

রাশা একটু পরে শুনতে পেল একটা নৌকা এসে ট্রলারের গায়ে লাগল, তারপর নৌকা থেকে একজন ট্রলারে উঠল। একজন বলল, "হুজুর, আপনি নিজেই চলে এসেছেন? অন্ধকার হলে আমরাই তো ছেমড়িটাকে নিয়ে যেতাম।"

রাশা শুনতে পেল মোটা একজন বলল, "নাহ্, মনে হয় দেরি করা ঠিক

হবে না। খবর পেয়েছি এই ছেমড়ির পরিচিত লোকজন সন্দেহ করছে তাকে এইখানে আনা হয়েছে। পুলিশ-টুলিশ এসে যদি ছেমড়িকে এখানে পেয়ে যায় ঝামেলা হবে!"

"পুলিশে আমাদের লোক আছে না হুজুর?"

"আছে বলেই তো খবরটা পেয়েছি। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

"কই? ছেমড়ি কই?"

"এই যে হুজুর এদিকে। ট্রলারের বেঞ্চে বেঁধে রেখেছি।"

রাশা দেখল একজন বুড়ো মানুষ ট্রলারের ভেতরে ঢুকেছে। তার লম্বা পাকা দাড়ি, মাথায় গোল টুপি। একটা পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে আছে। এই বুড়ো মানুষটা নিশ্চয়ই আহাদ আলী রাজাকার। রাশা মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

দাড়িওয়ালা মানুষটা এগিয়ে এসে রাশার দিকে ঝুঁকে তাকাল, বলল, "এইটাই সেই ছেমড়ি?"

"জি হুজুর।"

"মুখের গামছাটা খোল দেখি, চেহারাটা দেখি।"

একজন এসে মুখের বাঁধন খুলে দিল, রাশা অনেকক্ষণ পর বুক ভরে নিশ্বাস নিল, তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। সে একবার ঢোঁক গিলে বলল, "আমি একটু পানি খাব।"

আহাদ আলী বলল, "কী বললি?"

"আমি বলেছি, আমি একটু পানি খাব।"

আহাদ আলী হঠাৎ দুলে দুলে হাসতে শুরু করে। লোক দুজন একটু অবাক হয়ে আহাদ আলীর দিকে তাকায়, সে ঠিক কী জন্য হাসছে তারা বুঝতে পারছে না। আহাদ আলী বলল, "এর নানাও আমারে বলেছিল, আমি একটু পানি খাব। এতদিন পর তার নাতনিও আমাকে বলে, আমি একটু পানি খাব।"

রাশা মানুষটার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমার নানাকে মেরেছেন?"

জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমার নানাকে মেরেছেন?"

ঘরের ভেতরে হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল। রাশা আবার জিজ্ঞেস করল, "মেরেছেন?"

আহাদ আলীর মুখটা হঠাৎ কেমন জানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, সে হিংস্র গলায় বলে, "হ্যাঁ মেরেছি। মেরে ঐ মাদার গাছের তলায় পুঁতেছি। তো কী হয়েছে? তুই কী করবি?"

রাশার বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠে। এই মানুষটা তার সামনে অবলীলায় স্বীকার করল যে সে নানাকে মেরেছে– এই কথাটা তাকে জানাতে মানুষটা আর ভয় পাচ্ছে না। তার একটাই অর্থ, মানুষগুলো আসলে এখন তাকেও মেরে ফেলবে– কাজেই এখন তাকে যা ইচ্ছে তাই বলা যায়। এই কথাগুলো বাইরে কোথাও প্রকাশ হবে না। রাশা হঠাৎ ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। সে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, "আমি একটু পানি খাব।"

আহাদ আলীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা মুখ খিঁচিয়ে বলল, "তোরে পানি খাওয়ানোর জন্যেই আনছি! এই যে গাঙ দেখছিস, একটু পরে তুই এই পানি খাবি। মুখ দিয়ে খাবি, নাক দিয়ে খাবি! পানি খেয়ে তুই গাঙের নিচে শুয়ে থাকবি।"

অন্য লোকটা বলল, "তোর নানা ছিল ইন্ডিয়ার দালাল! গাদ্দার! তার সাথে তোর দেখা হবে। তুই আর তোর নানা জয়বাংলা জয়বাংলা করে লেফট-রাইট করবি। বুঝেছিস?"

রাশা বলল, "আমি একটু পানি খাব।"

লোকটা মুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আহাদ আলী বলল, "দে! একটু পানি দে। শেষ সময়ে একটু শখ করেছে, খেতে দে।"

"হুজুর, গাঙে এত পানি আছে, খেয়ে শেষ করতে পারবে না।"

"থাক থাক। নৌকায় বোতলে পানি আছে, পানি খেতে দে।"

লোকটা একটু বিরক্ত হয়েই নৌকা থেকে পানির বোতলটা আনতে গেল। একটু পর লোকটা একটা প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে এলো, তার নিচে অল্প একটু পানি। সে পানির বোতলটা খুবই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রাশার দিকে ছুড়ে দেয়। রাশা বলল, "আমার হাতটা খুলে দিতে হবে।"

মানুষটা একেবারে মারের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আর কী কী করতে হবে?"

রাশা বলল, "আমার হাত খুলে না দিলে পানি খাব কেমন করে?"

আহাদ আলী বলল, "খুলে দে হাত।"

"যদি অন্য কিছু করে?"

"তোরা দুইজন দামড়া জোয়ান এইখানে আছিস এই পুঁচকে মেয়ে করবেটা কী?"

"এরে বিশ্বাস নাই। এর মতো ত্যাঁদড় মেয়ের কথা আমি আমার বাপের জন্মে শুনি নাই!"

"ত্যাঁদড়ামি এক্ষুণি শেষ হবে! খুলে দে।"

মানুষটা একটু বিরক্ত হয়ে রাশার হাতের বাঁধন খুলে দিল। রাশা তার হাত দুটো সামনে এনে তাকায়, একেবারে নীল হয়ে গেছে। সে আঙুলগুলো খুলল, তারপর বন্ধ করল। হাতের মাঝে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে, আঙুলগুলোতে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে। রাশা এবারে নিচে থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই মানুষ দুজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, "কী করিস? কী করিস তুই?"

রাশা বলল, "আমি একটু বেঞ্চের ওপর ঠিক করে বসব।"

একজন ভেংচে উঠে বলল, "ওরে আমার শাহজাদি! তার বেঞ্চের ওপর বসতে হবে! নিচে থেকে উঠবি না খবরদার।"

রাশা আর ওঠার চেষ্টা করল না। পাটাতনে বসে পানির বোতলটা হাতে নিয়ে তার ছিপি খুলে সে মুখে বোতলটা লাগিয়ে ঢকঢক করে পানিটা খেল। তার মনে হলো তার বুকটা যেন একটা জ্বলন্ত চুলোর মতো হয়ে আছে, পুরো পানিটা সেটা যেন মুহূর্তে শুষে নিল। পানির শেষ বিন্দুটা খেয়ে সে খালি বোতলটা নিচে নামিয়ে রাখে আর ঠিক তখন তার মাথায় বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা চিন্তা খেলে যায়! এদের হাত থেকে ছাড়া পাবার একটা সুযোগ এসেছে– অত্যন্ত কঠিন কিন্তু তবু একটা সুযোগ। হাতে ধরে রাখা এই এক লিটারের খালি প্লাস্টিকের বোতলটাই হচ্ছে সেই সুযোগ। তার শেষ সুযোগ। তার জীবন বাঁচানোর সুযোগ। রাশা তার বুক থেকে একটা নিশ্বাস খুব সাবধানে বের করে দিল।

রাশা মুহূর্তের মাঝে পরিকল্পনাটা ঠিক করে ফেলে। প্লাস্টিকের বোতলটার তলাটা আলাদা করতে হবে। কাজটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব না। মানুষগুলোর মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে কাজটা করতে হবে। রাশা বোতলটা হাতে ধরে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নাড়তে থাকে– একজন মানুষ নার্ভাস হলে যেরকম করে অনেকটা সেরকম। মানুষগুলোকে ব্যস্ত রাখার জন্য কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলারও দরকার। রাশা কী বলবে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা আমাকে কেন ধরে এনেছেন?"

আহাদ আলী বেঞ্চের এক মাথায় বসে বলল, "সেইটা তুই এখনো বুঝিসনি? আমি তোরে টেলিভিশনে কথা বলতে দেখেছি, তুই কী বলেছিস আমি শুনেছি!" আহাদ আলী হিংস্র গলায় বলল, "আমার নাম উচ্চারণ করতে তোর ঘেন্না লাগে? আমি তোকে দেখাব ঘেন্না কেমন করে লাগতে হয়! শুধু তুই না তোর চৌদ্দ গুষ্টি দেখবে কেমন করে ঘেন্না করতে হয়।" আহাদ আলী হঠাৎ জঘন্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। একজন বয়স্ক মানুষের মুখ থেকে যে এরকম অশ্লীল শব্দ বের হতে পারে নিজের কানে না শুনলে সে বিশ্বাস করতে পারত না।

রাশা ভয় পাবার ভঙ্গি করে। পা দুটো গুটিয়ে আনে, দাঁত দিয়ে নখ কাটে তারপর প্লাস্টিকের বোতলের নিচের অংশটা টিপে ভাঁজ করে সেটা নাড়াচাড়া করতে থাকে, নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে কামড়ানোর চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত প্লাস্টিকের একটা অংশ দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে। রাশার বুকের ভেতর থেকে স্বস্তির নিশ্বাস বের হয়ে আসে। সে বেঁচে থাকতে পারবে কি পারবে না সেটা নির্ভর করছে এই প্লাস্টিকের বোতলটার ওপর। এর তলাটা আলাদা করতে পারবে কি পারবে না তার ওপর। প্লাস্টিকের বোতলে যেখানে একটু কেটেছে সেখানে আঙুলটা ঢুকিয়ে টানতে থাকে। প্লাস্টিকের ধারালো কাটা অংশে তার আঙুল কেটে যেতে চায় কিন্তু সে থামল না– টেনে আলগা করতেই লাগল।

আহাদ আলী একসময় থামল, রাশা তখন আবার জিজ্ঞেস করল, "আমাকে এখন কী করবেন?"

আহাদ আলী উত্তর দেবার আগেই একজন হা হা করে হেসে উঠল,

"ছেমড়ি? তুই এখনো বুঝিস নাই তোরে কী করব? তুই কী ভেবেছিস তোরে দুলহা বানিয়ে কারো সাথে শাদি দিব? না। তোরে পানিতে ডুবিয়ে মারব! বুঝেছিস?"

রাশা মাথা নেড়ে বোঝাল, সে বুঝেছে। হাত দিয়ে টেনে প্লাস্টিকের বোতলের তলাটা সে প্রায় আলগা করে ফেলেছে, এখন সে তার শেষ অংশটুকুর জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। মানুষ দুটো যখন একটু অসতর্ক থাকবে ঠিক তক্ষুণি তাকে লাফ দিয়ে উঠে একলাফে জানালা থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়তে হবে। একটা মাত্র সুযোগ পাবে সে। তার জীবনের শেষ সুযোগ। এই সুযোগটা যদি সে নিতে না পারে কেউ আর তাকে রক্ষা করতে পারবে না!

রাশা বিড়বিড় করে মনে মনে বলল, "হে খোদা! তুমি আমাকে রক্ষা করো খোদা। আমি তোমার কাছে আর কোনোদিন কিছু চাইব না! শুধু তুমি আমাকে একটা সাহায্য করো– শুধু একটুখানি।"

রাশা মানুষ দুটির দিকে তাকিয়েছিল, একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলছে, একটু অসতর্ক, রাশা ঠিক সেই মুহূর্তটাকে বেছে নিল। প্লাস্টিকের বোতলটা ধরে সে উঠে দাঁড়ায় তারপর বিড়ালের মতো লাফিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মানুষগুলো ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়, এক মুহূর্ত লাগে তাদের বুঝতে কী হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে দুজন ছুটে এসে তাকে ধরার চেষ্টা করল, তার পা প্রায় ধরেই ফেলেছিল কিন্তু হ্যাঁচকা টানে শেষ মুহূর্তে রাশা নিজেকে মুক্ত করে নেয়!

রাশা হাত-পা নেড়ে তীরের দিকে সাঁতরাতে থাকে– মাথা তুলে একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে সে ডুবসাঁতার দেয়ার জন্যে ডুবে গেল।

আহাদ আলী অশালীন একটা গালি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মানুষ দুজন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয় বলল, "এই ছেমড়ি দেখি যন্ত্রণার একশেষ!"

আহাদ আলী বলল, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন? মেয়েটাকে ধর।"

মানুষটা বলল, "হুজুর আমার আর ধরা লাগবে না। এই পানিতে যাবে কোথায়? ভেসে উঠুক আমি ধরছি।"

অন্য মানুষটা বলল, "এই মেয়ে পানির মাঝে আমার থেকে জোরে সাঁতার দিবে? খালি মাথাটা বের করুক।"

রাশা যেদিকে সাঁতরে গেছে সবাই সেদিকে তাকিয়ে থাকে, নিশ্বাস নেবার জন্যে তাকে মাথা বের করতে হবে তখনই তারা তাকে ধরার জন্যে অন্য দুজন পানিতে নামবে।

মানুষ দুজন শার্ট খুলে খালি গা হয়ে নিল। লুঙ্গিটাকে মালকোচা মেরে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে দুজনেই তৈরি। কোনদিকে যাবে সেটা ঠিক করার জন্যে তারা পানির দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্বাস নেবার জন্যে রাশা মাথা বের করা মাত্রই তারা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাশা নিশ্বাস নেবার জন্যে মাথা বের করল না। মানুষগুলো অবাক হয়ে দেখল এক মিনিট দুই মিনিট করে পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেল কিন্তু রাশা পানি থেকে মাথা বের করল না। মানুষগুলো একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল, বলল, "কই গেছে মেয়েটা?"

আহাদ আলী বলল, "ডুবে গেছে নাকি?"

"ডোবার কথা না। যেই মানুষ সাঁতার জানে সে ডুবে না।"

আহাদ আলী খেঁকিয়ে উঠল, "তাহলে গেছে কই?"

"সেইটাই তো তাজ্জব। মানুষ আর যেটাই করুক নিশ্বাস না নিয়ে তো বেঁচে থাকতে পারে না। এই ছেমড়ির তো নিশ্বাস নেবার জন্য মাথা বের করতে হবে!"

তারা পানির দিকে ইতিউতি করে তাকায়, চারিদিকে পানি, কোথাও রাশা নেই। সে একবারও নিশ্বাস নেবার জন্যে মাথা বের করেনি। মেয়েটা ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ করে মানুষগুলো একধরনের অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

রাশা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথমে সোজা তীরের দিকে এগিয়ে গেল, খানিকদূর এগিয়ে সে মাথা উঁচু করে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ডুব দেয়। এবারে সে ডানদিকে ঘুরে গেল, নদীর স্রোতটা যেদিকে। ডুব সাঁতার দিয়ে সরে যেতে থাকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যতদূর সম্ভব। যখন তার নিশ্বাস শেষ হয়ে আসে তখন প্লাস্টিকের বোতলটা মুখে লাগিয়ে চিৎ

হয়ে একটু উপরে উঠে আসে। বোতলটার উপরের অংশটা পানির একটু উপর ওঠা মাত্রই সে পানিটুকু টেনে সরিয়ে খালি করে নেয়। বাতাসের জন্যে তার বুকটা তখন হাহাকার করছে কিন্তু তবুও সে তাড়াহুড়া করল না। পুরো বোতলটা খালি হবার পর সে বাতাস টেনে নেয়, বুক ভরে একবার নিশ্বাস নেয়। তারপর আবার সে ডুবে গেল, ডুবসাঁতার দিয়ে সে আবার সরে যেতে থাকে–যতদূর সম্ভব। যখন আবার তার নিশ্বাস শেষ হয়ে এলো আবার সে বুক ভরে নিশ্বাস নেয়। তারপর সে ডুবসাঁতার দিয়ে আবার সরে যেতে থাকে।

ট্রলারের উপর আহাদ আলী দুজনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, চারিদিকে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কোথাও রাশার চিহ্ন নাই। আহাদ আলী মুখ খিঁচিয়ে বলল, "সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? পানিতে নাম–খুঁজে বের কর মেয়েটাকে।"

"কিন্তু গেল কই?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করবি না গেল কই? খুঁজে বের কর।"

মানুষ দুজন তখন পানিতে নামল, কেমন করে খুঁজবে বুঝতে পারছিল না, তবু ডুবে ডুবে এদিক-সেদিক গেল, বৃথাই খোঁজার চেষ্টা করল। ঘণ্টাখানেক খুঁজে যখন হাল ছেড়ে দিয়ে নদী থেকে উঠে এসেছে তখন আহাদ আলী লক্ষ করল দূরে পুলিশের একটা স্পিডবোট দেখা যাচ্ছে। সে একটা নিশ্বাস ফেলল, সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। মেয়েটা বেঁচে থাকলে মহাসমস্যা। ডুবে যদি মরে গিয়ে থাকে, আর এক-দুই দিন পর যদি লাশ ভেসে ওঠে সেটাও সমস্যা। কথা ছিল মেয়েটাকে বিলের পানিতে ফেলে আসবে যেন কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

স্পিডবোটে পুলিশের সাথে সালাম নানা ছিলেন, মতি আর জিতুও ছিল। স্পিডবোট থেকে নেমে পুলিশ যখন চারিদিকে খুঁজতে থাকে তখন মতি আর জিতু নদীর তীরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে থাকল, "রাশা আপু! রাশা আপু! তুমি কোথায়।" কেউ তাদের ডাকের উত্তর দিল না। দুজন তখন নদীর তীর ধরে ছুটতে থাকে আর চিৎকার করে ডাকতে থাকে, "রাশা আপু! রা-শা-আ-পু!"

রাশা সারা শরীর পানিতে ডুবিয়ে কচুরিপানার মাঝে তার মাথাটা একটুখানি বের করে শুয়েছিল, মতি আর জিতুর গলার স্বর শুনে সে সোজা হয়ে বসল। গলার স্বরটা যখন আরো একটু স্পষ্ট হলো তখন সে পানি থেকে বের হয়ে এলো, তার সমস্ত শরীরে কাদা, পানিতে ডুবে থেকে তার চোখ লাল, মুখ রক্তশূন্য। মতি আর জিতু রাশাকে ডাকতে ডাকতে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ করে রাশাকে দেখতে পায়, তখন তারা চিৎকার করে নদীর তীরে নেমে এসে তাকে জাপটে ধরে ফেলল! মতি রাশাকে শক্ত করে ধরে বলল, "রাশা আপু! রাশা আপু তুমি বেঁচে আছ? তুমি বেঁচে আছ রাশা আপু?"

রাশা খকখক করে একবার কাশল, তারপর বলল, "হ্যাঁ মতি। খোদা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।"

"আর তোমাকে কেউ মারতে পারবে না!" মতি রাশাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কেউ পারবে না। কেউ পারবে না।" তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মতি এর আগে কখনো কাঁদেনি– কেমন করে কাঁদতে হয় সে জানে না।

আহাদ আলীর উঠানে একটা চেয়ারে আহাদ আলী কঠিন মুখে বসে আছে। তার সামনে একজন পুলিশ অফিসার, আহাদ আলী মিছিমিছি তাকে সন্দেহ করার জন্যে সেই পুলিশ অফিসারকে ধমকাধমকি করছিল। ঠিক এরকম সময় মতি আর জিতুর হাত ধরে রাশা সেখানে হাজির হলো। সারা শরীরে কাদা, তাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না, তারপরেও আহাদ আলী তাকে চিনতে পারল এবং ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তার দুই পাশে তার দুজন সাগরেদ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হঠাৎ করে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, পুলিশের লোকজন দৌড়ে তাদের ধরে ফেলল।

সালাম নানা ক্রাচে ভর দিয়ে রাশার কাছে ছুটে গেলেন, তাকে ধরে বললেন, "রাশা! তুমি ঠিক আছ?"

রাশা মাথা নেড়ে বলল, "না, নানা। নাকে-মুখে পানি ঢুকে গেছে।"

সে খকখক করে কেশে বলল, "নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে মরে যাব।"

"না, তুমি মরবে না। তুমি এখন পর্যন্ত যখন বেঁচে আছ, আমরা তোমাকে মরতে দিব না।"

হঠাৎ করে রাশার মনে হলো তার পায়ে কোনো জোর নেই, সে পড়ে যাচ্ছিল, সালাম নানা তখন তাকে ধরে ফেললেন। রাশা ফিসফিস করে বলল, "যদি আমি মরে যাই, আপনাকে একটা জিনিস বলে রাখি।" রাশা আঙুল দিয়ে আহাদ আলীকে দেখিয়ে বলল, "এই যে রাজাকারটাকে দেখছেন– সে আমাকে বলেছে, সে আমার নানাকে মেরেছে। মেরে তার ডেডবডি একটা মাদার গাছের নিচে পুঁতে রেখেছে।"

রাশা আবার খকখক করে কাশল, তার কাশির সাথে ময়লা ঘোলা পানি বের হয়ে আসে। হঠাৎ করে তার মাথা ঘুরে আসে, সে সালাম নানার কোলে অচেতন হয়ে পড়ল।

সালাম নানা চিৎকার করে বললেন, "স্পিডবোট! কুইক। মেয়েটাকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে।"

শেষ কথা

অনেক দিন পরের কথা।

শীতের রাতে আকাশে একটা চাঁদ উঠেছে, কুয়াশায় সেই চাঁদকে কেমন যেন অস্পষ্ট দেখায়। চারিদিকে জোছনার ঘোলাটে আলো। কান পেতে থাকলে শোনা যায় গাছের পাতা থেকে টুপটুপ শব্দ করে শিশির পড়ছে মাটিতে।

এর মাঝে নানি একটা হ্যারিকেন নিয়ে বের হচ্ছেন, রাশা জিজ্ঞেস করল, "নানি, তুমি কই যাও?"

নানি লাজুক মুখে একটু হাসলেন, বললেন, "আমি আর কোথায় যাব? তোর নানার সাথে একটু কথা বলে আসি!"

রাশা বলল, "আমি আসি তোমার সাথে?"

"আসবি? আয় তাহলে! কবরস্থানে রাতবিরেতে ভয় পাবি না তো?"

"না, নানি। তুমি ভয় না পেলে আমিও ভয় পাই না।"

"হ্যাঁ, ভয় কিসের? তোর নানা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে না?"

রাশা চোখের কোনা দিয়ে নানির মুখের দিকে তাকাল। নানি এমনভাবে কথা বলেন যে শুনে মনে হয় সত্যিই বুঝি নানা কবরের মাঝে শুয়ে নানির জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন।

আহাদ আলীর বাড়ির পিছনে একটা বড় মাদার গাছের নিচে খুঁড়ে সত্যিই নানার দেহাবশেষটা পাওয়া গিয়েছিল। জায়গাটা আহাদ আলীই দেখিয়ে দিয়েছিল, তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সেখানে রাখা হয়েছিল।

যেদিন খুঁড়ে বের করা হয় সেদিন রাশাও ছিল সেখানে, সালাম নানা কিন্তু তাকে যেতে দেননি। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "তুমি কাছে এসো না সোনা?"

"কেন নানা?"

তোমার নানা ছিলেন অসম্ভব দুদর্শন একজন মানুষ। সেটাই তোমার কল্পনাতে তাকুক? কেন তুমি তার হাড়গোড়কে দেখে মন খারাপ করবে?

রাশা তাই তার নানার দেহাবশেষটুকু দেখেনি। মাটি খুঁড়ে সবাই মিলে সেটা বের করে একটা কফিনে করে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা দিয়ে সালাম নানা কফিনটাকে ঢেকে দিয়েছিলেন। দশ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে কফিনটাকে তাদের গ্রামে নিয়ে এলো। সেখানে তার জানাজা পড়ানো হলে তারপর সারা কাফনের কাপড়ে ঢেকে নানাকে কবরস্থানে করব দেয়া হলো।

সেই থেকে নানিসময় পেলেই কবরস্থানে এসে নানার কবরের পাশে বসে থাকেন। রাশার মনে হয় নানির ভেতরে সেই অস্থিরতাটুকু আর নেই, তার ভেতরে কেমন যেন একটা শান্তি এসেছে। রাশা টের পায় নানি অপেক্ষা করছেন করে নানার কাছে ফিরে যাবেন।

রাশা আর তার নানি হ্যারিকেন দুলিয়ে দুলিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাছে, ঠিক তখন মাথার উপর দিয়ে একটা রাতজাগা পাণি করুণ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। পাখির ডাকটা শুনলেই বুকের ভেতর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নাকি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, রাশা।

জি নানি।

তোর মায়ে কোনো চিঠি পেয়েছিস?

উঁহু রাশা হাসার চেষ্টা করে বলল, মাহতাব পিয়ন খুব ফাঁকিবাজ নানি। বেশি চিঠি জমা না হলে আসতেই চায় না।

তোর মাও মনে হয় চিঠি লেখার সময় পায় না!

"সেটাও ঠিক।" রাশা একটু থেমে বলল, "আম্মু মনে হয় আমার ওপরে একটু রাগ করেছে, তাই না নানি? কিন্তু কী করা বলো, এখন তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না!"

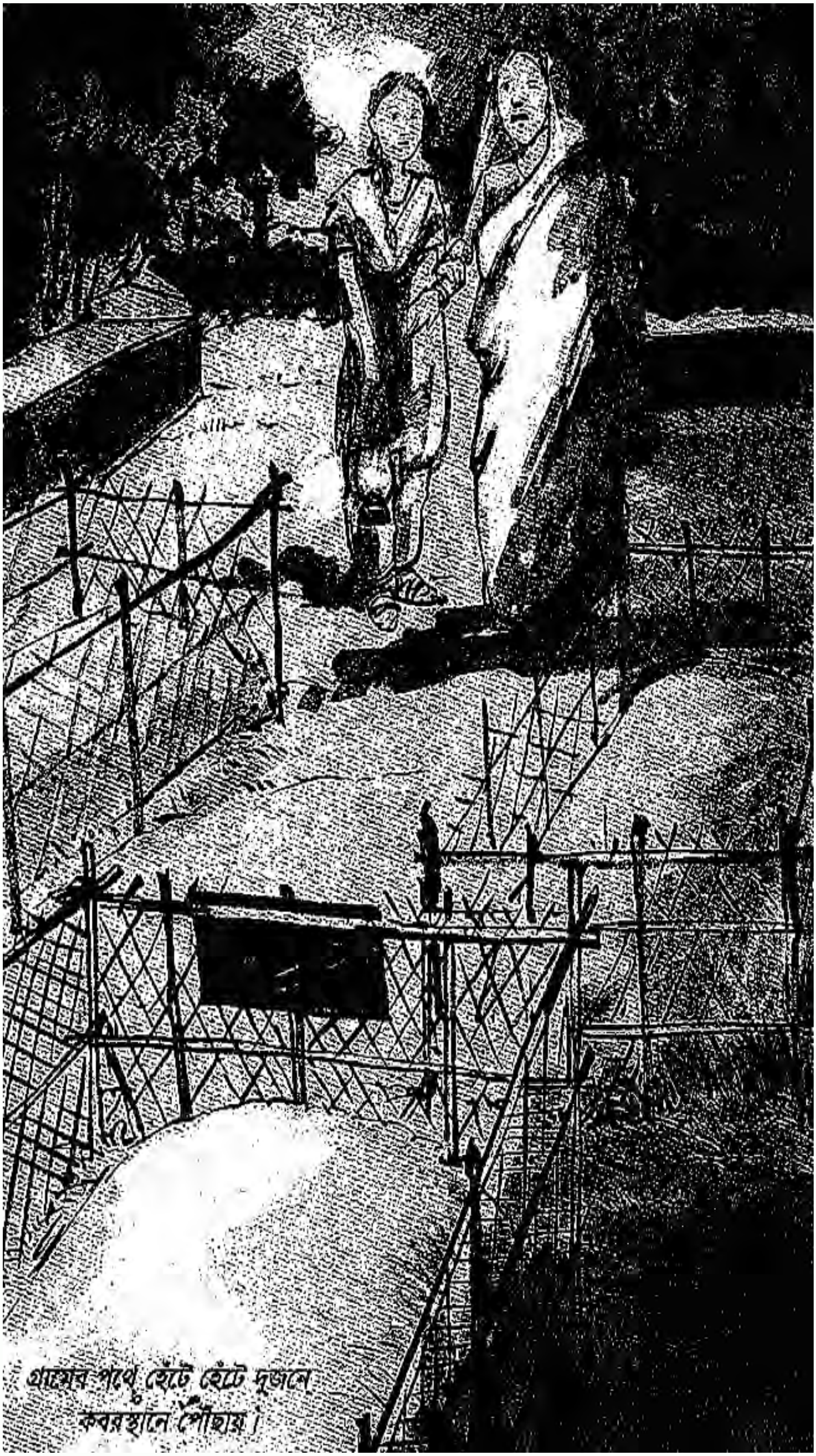
গ্রামের পথে হেঁটে হেঁটে দুজনে
কবরস্থানে পৌঁছায়।

নানি কিছু বললেন না, রাশা বলল, "আম্মু যদি একা থাকতেন আমি চলে যেতাম। কিন্তু আম্মুর সাথে থাকবে একটা মানুষ তাকে আমি চিনি না জানি না। আম্মু নাকি অনেক চেষ্টা করে সেই মানুষটাকে রাজি করিয়েছেন যেন আমি যেতে পারি! আমাকে নাকি অন্য টিনএজারদের মতো হলে হবে না, আদব-লেহাজ থাকতে হবে–"

নানি বললেন, "ভালোই হয়েছে তুই যাসনি! তুই চলে গেলে মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যে আমি মরে যাব।"

রাশা নানির হাত ধরে বলল, "না, নানি! তুমি মারা যাবে কেন? এখন তুমি মারা যেতে পারবে না। তুমি মারা গেলে আমার কী অবস্থা হবে চিন্তা করেছ?"

নানি একটা ছোট নিশ্বাস ফেললেন, বললেন, "এই দুনিয়ায় কারো জন্যে কিছু আটকে থাকে না রে সোনা! পৃথিবী চলতে থাকে। আমি মারা গেলেও তোর পৃথিবী চলবে!"

গ্রামের পথে হেঁটে হেঁটে দুজনে কবরস্থানে পৌঁছায়। লোহার গেটটা খুলে নানির হাত ধরে রাশা কবরস্থানে এসে ঢুকল। ভেতরে ফুলের তীব্র একটা গন্ধ। কোথায় যেন একটা বুনো ফুল ফুটেছে। নানি হ্যারিকেনটা কবরের মাথায় রেখে কবরের পাশে পা ছড়িয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর গভীর মমতায় কবরের মাটির উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রাশা হ্যারিকেনের ম্লান আলোতে দেখতে পেল নানির চোখ থেকে সরু দুটো পানির ধারা নিচে নেমে আসছে। কত যুগ আগে এই মানুষটি তার একজন আপনজনকে হারিয়েছে, এত দিন পরেও মনে হয় দুঃখ এতটুকু কমেনি।

রাশা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার সামনে একজন মানুষ। একজন মানুষের দুঃখ।

এই দেশে এরকম তিরিশ লক্ষ মানুষ আছে। তাদের তিরিশ লক্ষ দুঃখ। এত দুঃখ এই দেশের মাটি কেমন করে সইতে পারল?

জন্ম: ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

পাঠকনন্দিত এই লেখক ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।